পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের

শ্রীশ্রীহরিকথামৃত

(প্রথম ভাগ)

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের

শ্রীশ্রীহরিকথামৃত

(প্রথম ভাগ)

সংগ্রাহক ও প্রকাশক
শ্রীহরিগোপাল দাস,
সম্পাদক
শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামি-স্মৃতিসঙ্ঘ
শ্রীগোস্বামী প্রেস, কটক-২

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস
১০৮শ্রী শ্রীলপুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের
২য় বার্ষিক তিরোভাবতিথি
৪ বিষ্ণু বৃহস্পতিবার, ৪৭৪ শ্রীগৌরাব্দ
১৭ মার্চ, ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ।

মুদ্রাকর—শ্রীরামচন্দ্র দে
ইউনাইটেড আর্ট প্রেস
২৫বি, হিদারাম ব্যানার্জী লেন, বহুবাজার
কলিকাতা-১২

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্ ।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের

শ্রীশ্রীহরিকথামৃত

(প্রথম ভাগ)

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্ ।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

"কৃষ্ণোৎকীর্তন-গান-নর্তনপরৌ প্রেমামৃতাম্ভোনিধী
ধীরাধীরজন-প্রিয়ৌ প্রিয়করৌ নির্মৎসরৌ পূজিতৌ ।
শ্রীচৈতন্য-কৃপাভরৌ ভুবি ভুবো ভারাবহন্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘু-যুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥"

শ্রীশ্রীনিতাইগৌরসীতানাথাঃ জয়ন্ত

নিবেদন

পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীশ্রীহরিকথামৃত কতিপয় শ্রদ্ধালু ব্যক্তির নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান সময়ে প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করা হইল। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা হইলে পরে এই শ্রীগ্রন্থখানি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবেন।

শ্রীহরিগোপাল দাস

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের

শ্রীশ্রীহরিকথামৃত

মঙ্গলাচরণ

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, বেঙ্কট-গৃহ কৈলা ধন্য,
রহি' সেথা চাতুর্মাস্য-কালে।
শ্রীবেঙ্কট-সনে তথা, সদা শোনে কৃষ্ণকথা,
বাল্যকালে শ্রীভট্টগোপালে ॥

শ্রীপ্রয়াগক্ষেত্র-নামে, যজ্ঞ-পূত দিব্যধামে,
দশ অশ্বমেধ ঘাটোপরি।
নিজরূপ—শ্রীল রূপে, শিক্ষা দিলা কতরূপে,
ভক্তিধর্ম, শ্রীগৌরাঙ্গহরি ॥

কাশীধামে গৌরশশী, 'দশাশ্বমেধেতে' বসি,—
অতিপ্রিয় শ্রীল সনাতনে।
নিজ গীতা-ভাগবত, শ্রীগ্রন্থের মর্ম যত,
শিখাইলা পরম যতনে ॥

সেই সব উপদেশ, প্রীতি-বশে সবিশেষ,
দুই প্রভু—রূপ-সনাতন।
শ্রীগোপাল ভট্টবরে, প্রদানিলা তারপরে,
ভট্ট তাহা করিলা ধারণ ॥

শ্রীগোপাল মহাশয়, পরানন্দে অতিশয়,
(সেই) সুসিদ্ধান্ত-অমৃত-লহরী।
কভু ক্রমবদ্ধভাবে, কভু অসংবদ্ধভাবে,
'কারিকা'-রূপেতে রাখে ধরি' ॥

শ্রীরূপের প্রিয়তম, শিষ্যবর ভক্তোত্তম,
জীব-দুঃখী শ্রীজীবচরণ।
সেই সার-লিপিগুলি, ক্রমবদ্ধরূপে তুলি'
'ষট্-সন্দর্ভ' কৈলা বিরচন ॥

এলোমেলো ছিল যাহা, সুবিন্যাসক্রমে তাহা,
করিলেন অপূর্ব শৃঙ্গার।
বসিয়া বরজধামে, 'ভাগবত-সন্দর্ভ' নামে,
ছয় গ্রন্থ কৈলা পরচার ॥

সে' ছয় সন্দর্ভ মাঝে, **'ভকতি-সন্দর্ভ'**-রাজে,
ভাগবত-ধরমের সার।
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব, কৈলা তা'য় সুবেকত,
জীব-প্রতি দয়ায় অপার ॥

'ভক্তিসন্দর্ভ'-আলোচনে, লভে জীব ভক্তিধনে,
পলায় কুসিদ্ধান্ত-তিমির।
অপধর্ম, উপধর্ম, নাশি' সব, মহাশর্ম
দান করে,—সিদ্ধান্ত-মিহির ॥

শ্রীজীবের সেবাপর, (শ্রী) পুরীদাস প্রভুবর,
দুঃখী জীবে কৃপায় পরম।
শ্রীজীবের বাণী-ধন, করিলেন বিতরণ,
অনর্গল গঙ্গাধারা-সম ॥

অভিন্ন মথুরাধাম, 'মায়াপুর' যাঁ'র নাম,
সেই স্থানে, আরো নানা দেশে।
'ষট্-সন্দর্ভ'-বাণী যত, গাহিলেন অবিরত,
অপ্রাকৃত ভাবের আবেশে ॥

কত কত ভাগ্যবান্, ভরিয়া তৃষিত কাণ,
কথামৃত করেছেন পান।
সে' অমিয় গাথাগুলি, স্মারক-লিপিতে তুলি'—
করেছেন অন্যজনে দান ॥

(শ্রীল) পুরীদাস ঠাকুর, করুণায় সুপ্রচুর,
কতিপয় অমূল্য ভাষণ।
সেবন' করার তরে, আজ্ঞা দিয়া এ' পামরে,
'খাতা'-রূপে দিলা মহাধন ॥

সে সকল কথামৃত,— যাহাতে জীবের হিত,
গ্রন্থাকারে হ'লে প্রকাশিত।
লভিয়া সিদ্ধান্ত-সার, পাবে সবে উপকার,
দূরে যাবে সকল দুরিত ॥

আমি হেন আশা ক'রে, গুরু-কৃপা শিরে ধ'রে,
'হরি-কথা' করিনু প্রকাশ।
শ্রীগুরু-ভকতগণ! বরি' এ' অমূল্য ধন,
পূর্ণ করো মম অভিলাষ॥

অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ, ভক্তিহীন অতি মন্দ,
আমি মহা অধম দুর্জন।
সবে মোরে করো দয়া, পেয়ে গুরু-পদ-ছায়া,
ধন্য যেন হয় এ' জীবন॥

শ্রীল পুরীদাস প্রভু, গোলোক হ'তে কি কভু,
করি' স্নেহ-কৃপা-দৃষ্টিপাত।
অমায়ায় আকর্ষণে, স্থান দিয়া শ্রীচরণে,
করিবেন মোরে আত্মসাৎ?

জয় হে জয় হে জয়, (শ্রীল) পুরীদাস মহোদয়,
(শ্রী) গৌর-নিত্যানন্দ প্রিয়তম!
তব গুণগাথা গাই, বিন্দুমাত্র শক্তি নাই,
আমি অতি অযোগ্য অধম॥

(আজি) ভূলোকে গোলোকে জয়, গগনে পবনে জয়,
গাহে সবে তব জয়-গান।
হরিকথা-সুধা-দানে, বাঁচায়েছ বহু প্রাণে,
জয় জয় ওহে মহাপ্রাণ!

তুমি মহাসত্যব্রত, সদা জীবহিতে রত,
প্রচার ক'রেছ সত্য-ধন।
শ্রীগোস্বামি-গণ-প্রিয়, প্রেম-ভক্তি-রসময়,
(তুমি) গৌরনিত্যানন্দৈকজীবন ॥

তব কথামৃত-গানে, সাধ্ দিলে ক্ষুদ্র প্রাণে,
দোষ-ত্রুটি ঘটিল যে কত।
ক্ষমিয়া সে' সব নাথ ! করি' স্নেহ-দিঠিপাত,
সেবা-কাযে রেখো মোরে রত ॥

শ্রীপদ-রেণুর আশে কাঁদিছে পরাণ।
কৃপা ক'রে লহ প্রভো ! অসংখ্য প্রণাম ॥
শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-চরণরেণু-প্রার্থী
জনৈক পতিতাধম দাসাভাস।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত (গৌর) গুণধাম

(লীলা-সূচক গৌরনাম-কীর্ত্তন)

শ্রীল সার্বভৌমের গাওয়া না

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত (গৌর) গুণধাম

গাও গাও অবিরাম

জপ জপ অবিরাম।

শ্রীল পুরীদাস ঠাকুরের গাওয়া নাম

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গৌর-গুণধাম

গাও গাও অবিরাম

জপ জপ অবিরাম।

১। সীতানাথের প্রকটিত — গৌর-গুণধাম

২। শ্রীঅদ্বৈত-হুঙ্কারে অবতীর্ণ — ,, ,,

৩। মিশ্র জগন্নাথসুত — ,, ,,

৪। শচীমাতার দুলালিয়া — ,, ,,

৫। সীতাঠাকুরাণীর স্নেহ-বাৎসল্যাসিক্ত — ,, ,,

৬। মালিনী দেবীর গৌরব-বাৎসল্যপাত্র — ,, ,,

৭। পরমেশ্বরী মোদকের স্নেহবাৎসল্যপাত্র — ,, ,,

৮। শচীর অঙ্গনে দুলালিয়া — ,, ,,

৯। নিত্যানন্দের প্রাণের ভাইয়া — ,, ,,

১০। হরিবাসরে হিরণ্য-জগদীশের বিষ্ণু- — ,, ,,
নৈবেদ্য ভোজনকারী — ,, ,,

১১।	তৈর্থিক বিপ্রের অনুগ্রাহী	গৌর-গুণধাম	
১২।	শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্তন নাটুয়া	”	”
১৩।	রাঘবভবন বিহারিয়া	”	”
১৪।	নিত্যানন্দের নর্তন-দর্শক	”	”
১৫।	গদাধরের প্রাণবংধুয়া	”	”
১৬।	কুঁতুলে জগাইর প্রাণপতি	”	”
১৭।	মুরারি গুপ্তের ইষ্টদেব	”	”
১৮।	পণ্ডিত গঙ্গাদাসের প্রিয়শিষ্য	”	”
১৯।	কাশীনাথ পণ্ডিত ও বনমালী আচার্যের নিত্য প্রভু	”	”
২০।	লক্ষ্মীপ্রিয়া-প্রাণনাথ	”	”
২১।	বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণেশ্বর	”	”
২২।	দিগ্বিজয়ীর দর্পহারী	”	”
২৩।	নদীয়া-বিহারী শচীসুত	”	”
২৪।	বাসুদেব দত্তের ব্রহ্মাণ্ড-উদ্ধার-বাসনা-পূর্ণকারী	”	”
২৫।	বাসুদেব দত্তের প্রাণবল্লভ	”	”
২৬।	ঈশানের নিত্যপ্রভু	”	”
২৭।	গোবিন্দ দত্ত যাঁ'র আদি কীর্তনীয়া, সেই	”	”
২৮।	গোবিন্দানন্দ যাঁ'র প্রিয়পাত্র, সেই	”	”
২৯।	মুকুন্দের কীর্তনে দ্রবীভূত হৃদয়	”	”
৩০।	মুকুন্দের গানে নাচে	”	”
৩১।	গোবিন্দ, মাধব, বাসুঘোষের কীর্তনে	”	”
	নৃত্যকারী	”	”

৩২। গোবিন্দ ঘোষের গানে নাচে গৌর-গুণধাম
৩৩। মাধব ঘোষের গানে নাচে ” ”
৩৪। বাসুঘোষের গানে নাচে ” ”
৩৫। বক্রেশ্বরের নৃত্যে স্বয়ং গায়ক ” ”
৩৬। চন্দ্রশেখর ভবনে দেবীভাবে নৃত্যকারী ” ”
৩৭। চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের প্রাণপ্রিয় প্রভু ” ”
৩৮। আচার্যরত্ন-গৃহে (আদ্যাশক্তি জগজ্জননী-রূপে) ” ”
ভক্তগণে স্তন্যদাতা ” ”
৩৯। খোলাবেচা শ্রীধরের পণ্যগ্রাহী ” ”
৪০। পুরুষোত্তম সঞ্জয়েরে (নিজ) কোলে গ্রহণকারী ” ”
৪১। বুদ্ধিমন্ত খানের প্রাণপ্রিয় প্রভু ” ”
৪২। নন্দনাচার্যের গৃহে পলায়নকারী ” ”
৪৩। শুক্লাম্বরের তণ্ডুলগ্রাহী ” ”
৪৪। নারায়ণীকে নিজ-উচ্ছিষ্টদাতা ” ”
৪৫। শ্রীবাস-গোষ্ঠীর প্রাণধন ” ”
৪৬। দুঃখীকে ‘সুখী’-নাম-প্রদাতা ” ”
৪৭। বাসুদেব দত্তের জীবে দয়ায় প্রহৃষ্ট ” ”
৪৮। ঠাকুর হরিদাসের অন্তরে বাহিরে স্ফূর্তিমান্ ” ”
৪৯। জগাই-মাধাই-উদ্ধারকারী ” ”
৫০। চাপাল গোপালের বৈষ্ণবাপরাধ
(শ্রীবাসের দ্বারা)-খণ্ডনকারী ” ”
৫১। রাঘব-ভবনে ভোগাস্বাদ-গ্রহণকারী ” ”
৫২। দময়ন্তীর প্রাণকান্ত ” ”

৫৩। দেবানন্দ পণ্ডিতের বৈষ্ণবাপরাধ-খণ্ডনকারী গৌর-গুণধাম

৫৪। দেবানন্দে বাক্যদণ্ডদাতা ,, ,,

৫৫। শ্রীমান্ পণ্ডিতের নিত্যপ্রভু ,, ,,

৫৬। আঁখরিয়া বিজয় দাসের প্রাণপ্রভু ,, ,,

৫৭। শ্রীমান্, শ্রীকান্ত, বল্লভসেনের নিত্যপ্রভু ,, ,,

৫৮। শ্রীনাথ পণ্ডিত, নারায়ণ পণ্ডিতের প্রাণপ্রভু ,, ,,

৫৯। ভগবান্ পণ্ডিত, গরুড় পণ্ডিতের প্রাণপ্রভু ,, ,,

৬০। সাত প্রহরিয়া-ভাবাবেশে ভক্তগণে
ইষ্টবর-প্রদানকারী ,, ,,

৬১। সদাশিব পণ্ডিতের প্রাণপ্রিয় প্রভু ,, ,,

৬২। শ্রীরাম, শ্রীপতি, শ্রীনিধির নিত্য প্রভু ,, ,,

৬৩। শ্রীঈশ্বর পুরী, পরমানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ
ভারতীর স্নেহ-বাৎসল্যসিক্ত ,, ,,

৬৪। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, পুরন্দর আচার্য্য
যাঁ'র নিত্য পিতা, সেই ,, ,,

৬৫। কমলানন্দ যাঁ'র নিত্যভৃত্য, সেই ,, ,,

৬৬। গৌরীদাসের মন্দিরে বিরাজমান ,, ,,

৬৭। গৌরীদাস পণ্ডিতের কুলদেবতা ,, ,,

৬৮। খণ্ডবাসী নরহরি-প্রাণশ্রেষ্ঠ ,, ,,

৬৯। সেন শিবানন্দের প্রাণাধিপ ,, ,,

৭০। চৈতন্যদাস, রামদাস, কবি কর্ণপূরের
প্রাণপ্রিয় প্রভু ,, ,,

৭১। মুকুন্দ, রঘুনন্দনের প্রাণবল্লভ ,, ,,

৭২।	চিরঞ্জীব সেন, সুলোচনের প্রাণপ্রভু	গৌর-গুণধাম	
৭৩।	অচ্যুতানন্দের প্রাণপ্রভু	,,	,,
৭৪।	কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল মিশ্রের নিত্যপ্রভু	,,	,,
৭৫।	খোলাবেচা শ্রীধরের সছিদ্র লৌহপাত্রে জল-পানকারী	,,	,,
৭৬।	পড়ুয়া পাষণ্ডিগণের পরিত্রাতা	,,	,,
৭৭।	দেবানন্দকে ভাগবতার্থ-জ্ঞাপনকারী	,,	,,
৭৮।	কপট সন্ন্যাসিবেশধারী	,,	,,
৭৯।	সার্বভৌমের শোধনকারী	,,	,,
৮০।	ষাঠীর মাতার পাচিত অন্নভোজনকারী	,,	,,
৮১।	অমোঘের জীবনদাতা	,,	,,
৮২।	গোপীনাথাচার্য্যের প্রাণপ্রিয় প্রভু	,,	,,
৮৩।	গজপতি প্রতাপরুদ্র-পরিত্রাতা	,,	,,
৮৪।	গজপতি পুত্রে কোলদাতা	,,	,,
৮৫।	দূর দর্শনেই গজপতির মহিষীবৃন্দে কৃষ্ণপ্রেম-সঞ্চারকারী	,,	,,
৮৬।	পরমানন্দ মহাপাত্র, ওড়্র কৃষ্ণানন্দের প্রাণপ্রভু	,,	,,
৮৭।	শিখি মাহিতি ও মাধবী দেবীর প্রাণপতি	,,	,,
৮৮।	জগন্নাথ মাহাতি, কানাঞি খুঁটিয়ার প্রাণধন	,,	,,
৮৯।	বিদ্যানিধি, পুরীদেবের বাৎসল্যাসিক্ত	,,	,,
৯০।	কাশীমিশ্রের গৃহাঙ্গীকারী	,,	,,
৯১।	ঝারিখণ্ডের বন্য পশুকে গোপী-প্রেমদাতা	,,	,,

৯২। ঝারিখণ্ড-বনপথে স্থাবর-জঙ্গম-
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্তকারী গৌর-গুণধাম
৯৩। গলদ-কুষ্ঠীর মোচনকারী ,, ,,
৯৪। কূর্মবিপ্রে শক্তিসঞ্চারকারী ,, ,,
৯৫। রামজপী বিপ্রমুখে কৃষ্ণনামদাতা ,, ,,
৯৬। কুলিয়ায় দর্শন ও উপদেশদানে পাপী তাপী
অপরাধিগণের নিস্তারকারী ,, ,,
৯৭। বেঙ্কটভট্টে মাধুর্য্য-সেবাদাতা ,, ,,
৯৮। বেঙ্কটালয়ে চাতুর্মাস্য-যাপনকারী ,, ,,
৯৯। বালক গোপালভট্টের সেবাগ্রাহী ,, ,,
১০০। গীতাপাঠী বিপ্রে পরমপ্রীত ,, ,,
১০১। শ্রীশৈলে হরপার্বতীর আতিথ্যগ্রাহী ,, ,,
১০২। বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সেবায় পরমতুষ্ট ,, ,,
১০৩। তপনমিশ্রের সেবাগ্রাহী ,, ,,
১০৪। চন্দ্রশেখর-বৈদ্যগৃহে দুই মাস অবস্থানকারী ,, ,,
১০৫। পরমানন্দ কীর্তনীয়ার প্রাণপ্রভু ,, ,,
১০৬। মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের নিত্যপ্রভু ,, ,,
১০৭। মায়াবাদী প্রকাশানন্দের উদ্ধারকারী ,, ,,
১০৮। কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের উদ্ধারকারী ,, ,,
১০৯। শ্রীবিন্দুমাধব-দর্শনানন্দী ,, ,,
১১০। রাঘব দময়ন্তীর ঝালির দ্রব্যভোজনকারী ,, ,,
১১১। স্বরূপ-দামোদরের প্রাণকোটি নীরাজিত মুখ ,, ,,
১১২। স্বরূপের গানে শান্ত ,, ,,

১১৩। রায় রামানন্দের অভিন্ন হৃদয় গৌর-গুণধাম
১১৪। রামানন্দের কণ্ঠধারী " "
১১৫। রায় ভবানন্দকে আলিঙ্গনদাতা " "
১১৬। ভবানন্দগোষ্ঠীকে আত্মসাৎকারী " "
১১৭। গোপীনাথ, বাণীনাথ, কলানিধি ও সুধানিধি
চারি ভাইএর নিত্যপ্রভু " "
১১৮। রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যকে প্রেমালিঙ্গনদাতা " "
১১৯। রঘুনাথ পণ্ডিতের ভাগবত পাঠ-শ্রবণে
প্রেমানন্দে নৃত্যকারী " "
১২০। দাস গদাধরের প্রাণপতি " "
১২১। অভিরাম দাসের প্রাণধন " "
১২২। নকুল ব্রহ্মচারীতে আবেশ-মূর্তি " "
১২৩। নৃসিংহানন্দে আবির্ভূত " "
১২৪। রামদাস বিপ্রের দুঃখহারী " "
১২৫। রসরাজ-মহাভাব দুই একরূপ " "
১২৬। ষড়ৈশ্বর্যাপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ " "
১২৭। কেবল আনন্দকন্দ " "
১২৮। কালিদাসে নিজ-পাদোদকদাতা " "
১২৯। শঙ্করপণ্ডিত যাঁ'র পাদোপধান—সেই " "
১৩০। দামোদর পণ্ডিতের বাক্যদণ্ডে তুষ্ট " "
১৩১। গোবিন্দ কাশীশ্বরের পরিচর্য্যাগ্রহণকারী " "
১৩২। রামাই নন্দাইএর সেবাগ্রাহী " "
১৩৩। লোকনাথের প্রাণনাথ " "

১৩৪। ভূগর্ভের প্রাণধন গৌর-গুণধাম
১৩৫। অষ্টগোস্বামীর প্রাণবল্লভ ,, ,,
১৩৬। ছোট হরিদাসের বর্জনে নিজ-জনগণে শিক্ষাদাতা ,, ,,
১৩৭। শ্রীসনাতন-পালন ,, ,,
১৩৮। শ্রীরূপানন্দবর্ধন ,, ,,
১৩৯। শ্রীহরিদাস-মোদন ,, ,,
১৪০। শ্রীগদাধর-মাদন ,, ,,
১৪১। কুলীন গ্রামীর উপদেষ্টা ,, ,,
১৪২। সত্যরাজ রামানন্দ বসুর প্রাণধন ,, ,,
১৪৩। রায় রামানন্দ-দ্বারা প্রদ্যুম্নমিশ্রে শিক্ষাদাতা ,, ,,
১৪৪। রথাগ্রে উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্তনকারী ,, ,,
১৪৫। গুণ্ডিচাগৃহ-মার্জনকারী ,, ,,
১৪৬। হেরা পঞ্চমী-দর্শনানন্দী ,, ,,
১৪৭। হোরিকা লীলার অভিনয়কারী ,, ,,
১৪৮। বেড়া-সংকীর্তনে নর্তনানন্দী ,, ,,
১৪৯। নরেন্দ্র-সরোবরে জলকেলিকারী ,, ,,
১৫০। আইটোটায় বনভোজনকারী ,, ,,
১৫১। সর্ব অবতার-সার-শিরোমণি ,, ,,
১৫২। যতিরাজ শিখামণি ,, ,,
১৫৩। শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড পুনঃ-প্রকাশকারী ,, ,,
১৫৪। বৃন্দাবনে প্রেমোন্মাদে বিচরণকারী ,, ,,
১৫৫। শ্রীঅক্রূরতীর্থে ভিক্ষানির্বাহকারী ,, ,,

১৫৬। ইমলীতলায় সংখ্যানাম-গ্রহণকারী গৌর-গুণধাম
১৫৭। রাজপুত কৃষ্ণদাসের নিত্যপ্রভু " "
১৫৮। ম্লেচ্ছগণে ভক্তিদাতা " "
১৫৯। শ্রীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাবে পরমাবিষ্ট " "
১৬০। মহাবদান্য-শিরোমণি " "
১৬১। হেমবরণী শ্রীরাধিকার ভাবকান্তিধারী " "
১৬২। দ্বাপরের যশোদাসুত নবঘন-শ্যাম কলিতে
হৈলা, শচীসুত " "
১৬৩। শ্যামবিরহিণী শ্যামার ভাবধারী 'শ্যামাভাবী' " "
১৬৪। শ্যামসোহাগিনী শ্যামার
প্রতপ্তকাঞ্চনকান্তিধারণকারী " "
১৬৫। শ্রীজগন্নাথদর্শনে প্রেমাবিষ্ট " "
১৬৬। গম্ভীরা-ভিত্তিতে মুখঘর্ষণকারী " "
১৬৭। প্রেমোন্মাদে কূর্মাকৃতি-ধারণকারী " "
১৬৮। তৈলঙ্গী গাভীদের মাঝে নিপতিত " "
১৬৯। যমুনাজ্ঞানে সমুদ্রে ঝম্প-প্রদানকারী " "
১৭০। স্বরূপরায়ের সঙ্গে কৃষ্ণকথা-আলোচনাকারী " "
১৭১। শ্রীসনাতনের প্রাণকোটিধন " "
১৭২। শ্রীরূপের প্রাণকোটিনিধি " "
১৭৩। শ্রীরঘুনাথ ভট্টের প্রাণধন " "
১৭৪। শ্রীজীবের জীবিতেশ্বর " "
১৭৫। দাস রঘুনাথের প্রাণনাথ " "
১৭৬। শ্রীগোপালভট্টের প্রাণধন " "

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের

শ্রীশ্রীহরিকথা

২২শে ফাল্গুন,
বাংলা ১৩৫০ সন।

"বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতাশ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ।।"

পৃথিবীতে সদ্ধর্ম-সম্প্রদায়ের ইতিহাসে গৌড়ীয়গণের বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথম বৈশিষ্ট্য হইতেছে—প্রমাণ। প্রমাণ কেন দরকার হয় ?—দুইটি বিবদমান পক্ষ হইলে প্রমাণের প্রয়োজন হয়।

সনাতনধর্মাবলম্বিমাত্রেই বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। বেদসমূহ কালের মধ্যে জাত কোন ঋষিপ্রণীত নহে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিকের অনুমান কল্পনামাত্র। উহা একদেশদর্শীর গবেষণা বলিয়া, উহাতে কুসংস্কারযুক্ত দুরভিসন্ধি আছে বলিয়া, উহাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে। ওয়েবার, উইলসন, ম্যাক্সমূলর, হপ্‌কিন্স, ম্যাক্‌ডনেল প্রভৃতি ও তাহাদের উচ্ছিষ্টভোজী এ-দেশীয় ডাঃ স্যর ভাণ্ডারকর প্রভৃতি

পণ্ডিতগণের পরমার্থতত্ত্ব বা অতীন্দ্রিয় বিষয়ে গবেষণার মূল্য এক কাণাকড়িও নহে।

মানুষের অসম্পূর্ণতা আছে বলিয়া, সকলেরই—পরতত্ত্বদ্রষ্টৃ মহাজনগণেরও দোষ আছে, সকলেই আমাদের বিচারাধীন—এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রমযুক্ত। দৃষ্টান্ত যথা—পূর্ণ, সচ্চিদানন্দলক্ষণ, সনাতন বস্তু, যিনি "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন"—এই শ্রুতিবচনের উদ্দিষ্ট বিষয়, তাঁহাকে কখনও পাশ্চাত্য শিলালিপিকারগণের গবেষণায় পাওয়া যাইবে না। আমাদের শ্রীগুরুদেব পুরুষ-সিংহরূপে প্রত্নতাত্ত্বিকগণের বিচারের প্রতি, হিরণ্যকশিপুর প্রতি শ্রীনৃসিংহদেবের ন্যায়, রাবণের প্রতি শ্রীবজ্রাঙ্গজীর ন্যায় নির্মমভাবে আঘাত দিয়াছেন।

বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সকলেই স্বীকার করে, তার মধ্যে আবার শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব। তিনি রসময়ী শ্রুতি। সেই শ্রীমদ্ভাগবত পরতত্ত্বসম্বন্ধে তিনটি লক্ষণ বলিয়াছেন,—পূর্ণ, সনাতন ও পরমানন্দ। পূর্ণ—অখণ্ড, অব্যাহত শক্তি; সনাতন—পরিপূর্ণ চেতন, কর্তৃত্বশক্তি পরিচালন করিতে পারেন; পরমানন্দ—নিরানন্দ বা মায়া নাই। তটস্থ লক্ষণ বা কার্যদ্বারা প্রকাশ্য অসাধারণ লক্ষণ—সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। স্বরূপ লক্ষণ—স্বভাব, আকৃতি ও প্রকৃতি। পৃথিবীর ইতিহাসে পরতত্ত্বের সৎ, চিৎ ও আনন্দ—এরূপ তিনটি নির্দোষ ও সম্পূর্ণ লক্ষণ কেহ বলিতে পারেন নাই। যাহারা বিশেষজ্ঞ নয়, তাহারা এটি জানে না। কিন্তু বিশেষজ্ঞ মাত্রেই জানেন,—তাঁহার এই তিনটি লক্ষণ আছে। "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি

পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥”—এই শ্লোকে পরতত্ত্বের সম্পূর্ণ লক্ষণ আছে। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবতে আছে। তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত যাঁহারা, তত্ত্বসাক্ষাৎকারীরা বলেন,—“একমেবাদ্বিতীয়ম্” —অদ্বিতীয় বস্তুই তত্ত্ব। সেই এক বস্তুরই তিনটি প্রতীতি বা আবির্ভাবের মধ্যে একটি—অস্পষ্ট বিশেষ ও তুইটি স্পষ্ট বিশেষ। বিশেষ ধর্ম যেখানে দেখা যায় না, বিশেষ যেখানে গুপ্ত, সুপ্ত, যেখানে শক্তির পরিচয় নাই, সেখানে নির্বিশেষব্রহ্ম। দর্শকের দর্শনশক্তি অনুসারে নির্ধর্মকরূপে প্রতীয়মান পরতত্ত্ববস্তুকে ব্রহ্ম বলা যায়। সধর্মক হইলে আর এক প্রকার দর্শনে স্পষ্টবিশেষযুক্ত আংশিক শক্তির প্রকাশবিশিষ্টতত্ত্ব পরমাত্মরূপে প্রতীত হন। পূর্ণ দর্শনে সম্পূর্ণ স্বরূপশক্তির প্রকাশশীল বস্তুকে ভগবান বলে। সমগ্র জগতে কোন দর্শনশাস্ত্রে বা ধর্মশাস্ত্রেই পরতত্ত্ববস্তুর এরূপ নির্দোষ সংজ্ঞা নাই। পরতত্ত্ববস্তুকে **“সম্বন্ধী”** বলে। এই পরতত্ত্ব বস্তুর উদ্দেশ না থাকিলে, সৎ, চিৎ ও আনন্দের পরিচয় না থাকিলে ধর্মই হয় না। পরতত্ত্ববস্তুই ধর্মের মূল বস্তু। অধিকতর মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তি তদপেক্ষা অল্পমনীষাবিশিষ্ট ব্যক্তিকে পরাস্ত করিয়া দেয়। সুতরাং এটি যুক্তির কথা নয়, প্রত্যক্ষ সত্যকথা। ভগবানের ছয়টি লক্ষণ—সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র বৈরাগ্য, সমগ্র শ্রী ও সমগ্র জ্ঞান। পরমাত্মা ও ভগবানে স্বরূপতঃ অসংখ্য ধর্ম আছে। নিরুপাধিক প্রীতির পাত্রত্বই (অর্থাৎ স্বাভাবিক ভালবাসার জিনিষ হওয়াই) ভগবানের অসাধারণ লক্ষণ। নিরুপাধি অর্থে—সহজ, স্বাভাবিক, অব্যবহিত বা বাস্তব।

ভগবান ভালবাসেন ও ভালবাসা দ্বারা বশীভূত হইয়া যান। অবাঙ্‌মনসো-গোচর, অনাম, অরূপ, নির্গুণ, নির্লেপ, নিরঞ্জনবস্তুকে আপনার করিয়া লওয়া যায়। এইটি ভগবত্তার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। এই ভগবানের যত কিছু রূপ, তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-রূপটিই শ্রেষ্ঠ। শ্রীর কৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে,—শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে। শ্রী—সৌন্দর্য-মাধুর্যাদি, শোভা, সম্পত্তি। এই শ্রী বা মাধুর্য, ঐশ্বর্যকে বশীভূত করে।

তিন প্রকার শক্তি—স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। স্বরূপশক্তি—হ্লাদিনী, সম্বিৎ ও সন্ধিনী—এই তিনটি প্রভাবময়ী। পরমাত্মার মধ্যে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ থাকিলেও তিনি তাহা লইয়া বেশী কার্য করেন না। জীব ও মায়াশক্তি লইয়াই কার্য করেন। এই আংশিক প্রকাশ যোগীদের নিকট প্রকাশিত হয়। ভগবত্তার মধ্যে নিরুপাধি প্রীতির পাত্রত্ব গুণটি যত প্রকাশ পায়, ততই শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণে নিরুপাধি প্রীতির পাত্রত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী; সুতরাং অংশী শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবতই অংশ প্রতিপাদক শাস্ত্রগণের চক্রবর্তি-চূড়ামণি।

শ্রীকৃষ্ণ-লোকে তিন তালা—দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল। দ্বারকানাথ অপেক্ষা মথুরানাথে, তদপেক্ষা গোকুলনাথে নিরুপাধি প্রীতির পাত্রত্ব বেশী আছে। প্রীতির পরিমাণগত স্তরের মধ্যে অধিরূঢ় মহাভাবই শ্রেষ্ঠ। সেই অধিরূঢ় মহাভাবের নিকট প্রতিফলিত শ্রীকৃষ্ণরূপ,—গান্ধর্বা-দয়িত যে শ্রীকৃষ্ণ রূপ,—সম্বন্ধী বিচারে তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং তাহাকে প্রতিপাদন করেন যে শাস্ত্র, তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত সত্য। ধর্মপ্রচারকদের

নিকট আবির্ভূত যত কিছু শাস্ত্র, সমস্তই শ্রীমদ্ভাগবতের অংশ, সোপান বা বিকৃতি। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণ ও প্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবত পূর্ণতম, আর সবই তাঁর অংশ। পরতত্ত্ব বস্তুর প্রতিপাদক যত কিছু শাস্ত্র, সমস্তই শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

এখন **উপাস্যের** কথা বলা যাক্। পূর্বে বলা হইয়াছে, নিরুপাধি প্রীতির পাত্রত্বই ভগবত্তার সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ। আবার সেই নিরুপাধি প্রীতির পাত্রটির প্রতি প্রীতি যাঁর যত বেশী, তাঁর নিকট তত অধিক পরিমাণে প্রীতির পাত্রত্ব গুণটি বা মাধুর্যটি প্রকাশিত হয়। গোকুলনাথ শ্রীকৃষ্ণে নিরুপাধি প্রীতির পাত্রত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। তার মধ্যে আবার যাঁহারা শ্রীগান্ধর্বার আনুগত্যে—মধুর রসে উপাসনা করেন, তাঁদের নিকট নিয়ত বিদ্যমান যে শ্রীগোকুলনাথ, তাঁরই মাধুর্য সর্বাপেক্ষা অধিক। মধুর রসের মধ্যেও আবার বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত, শ্রীকবিকর্ণপুর, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর—ইঁহারাও মধুর রসের উপাসক; কিন্তু ইঁহারা শ্রীরূপানুগ নহেন। ইঁহাদের শ্রীগান্ধর্বার সহিত সমভূমিকা; আর শ্রীরূপমঞ্জরী, শ্রীরতি-মঞ্জরী প্রভৃতি—ইঁাহারা দাসী, সেবিকা। সেই শ্রীরূপমঞ্জরী প্রমুখ দাসীগণের প্রাণ-কোটি-সর্বস্ব যে শ্রীগান্ধর্বা,—অসংখ্য সেবিকা-যূথ-পরিবেষ্টিতা সেই শ্রীগান্ধর্বার প্রাণবন্ধু যে গোপীজনবল্লভ, অর্থাৎ শ্রীরূপ প্রমুখ দাসী বা সেবিকাগণের দ্বারা সেব্যমান যে শ্রীকৃষ্ণরূপ, তাঁহাদের শুদ্ধসত্ত্ব-স্বচ্ছহৃদয়ে প্রতিফলিত শ্রীবার্ষভানবীদয়িতের যে রূপটি, শ্রীরূপানুগের প্রিয়, আরাধ্য,

সেবিত যে শ্রীগান্ধর্বা-প্রাণনাথের রূপটি, উপাস্যবিচারে তাহাই পরাকাষ্ঠা স্বরূপ।

এখন **মন্ত্রের** কথা। ঋষি অর্থাৎ দ্রষ্টা,—অপ্রাকৃতদর্শন যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহাদের শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে মন্ত্র প্রতিভাত হয়। নিরুপাধিপ্রীতির লক্ষণযুক্ত যে পরতত্ত্ববস্তু, তাঁহার প্রতি নিরুপাধি আনুকূল্যময়ী প্রীতি যাঁহার যত বেশী, তাঁহার রুচিকর, আনন্দজনক যাঁহার হৃদয়, তাঁহার নিকট মন্ত্রও তত বেশী প্রতিভাত হয়।

ব্রজগোপীগণ—তাঁহাদের মধ্যে আবার শ্রীগান্ধর্বার নিকট হইতে যে মন্ত্র প্রপঞ্চে গুরু-শিষ্য বা সেবক-পরম্পরাক্রমে আসিয়াছেন, সেই কামবীজ, কামগায়ত্রী মন্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ। পূর্ণবস্তুর কোন প্রতিপক্ষ নাই এবং তাঁহার প্রতিপাদক শাস্ত্রের বা তাঁহার বাচক মন্ত্রের কোন প্রতিপক্ষ নাই। অন্য সমস্ত মন্ত্রই এই মন্ত্ররাজের মধ্যে অনুস্যূত আছে। প্রীতির আবির্ভাব যত বেশী, ততই হৃদয় স্বচ্ছ হয়। শ্রীগান্ধর্বার হৃদয়টি সর্বাপেক্ষা অধিক স্বচ্ছ, কেননা প্রীতির আবির্ভাব তাঁহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী। সুতরাং সেই গান্ধর্বা-দয়িতের যে মন্ত্র, তাহা মন্ত্র-বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ।

আধার—শ্রীরাধাকুণ্ড। "বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো" ইত্যাদি শ্লোকের আশয়ানুসারে শ্রীগান্ধর্বা যেখানে অন্তরে বাহিরে পরমতত্ত্ববস্তুকে সাক্ষাৎ করেন ও করান, সেই কুণ্ডই স্থান বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ। কেননা পূর্ণতমবস্তু সেখানে পরিপূর্ণতম, সর্বোত্তমভাবে আবির্ভূত হন।

উপকরণ—ঐশ্বর্যযুক্ত ও ঐশ্বর্যহীন। পরমেশ্বরের উপাসনা পরমৈশ্বর্যযুক্ত ও পরমৈশ্বর্যহীন—দুইভাবে হয়। পরমৈশ্বর্যহীন

উপাসনা কি? দেশ, কাল, পাত্রের অপেক্ষা রহিত অব্যাহত উপাসনা যাহা দ্বারা হয়, সেটিই সাধনভক্তি বা গান্ধর্বা-বল্লভের আনুকূল্যময় অনুশীলন। এটি সকলের মধ্যে অন্তর্লীন আছে। এটি স্বাভাবিকী গাঢ়তৃষ্ণা, ইহাকে পাইবার জন্য লাঠি মারিতে হয় না। জীব বিকৃতমস্তিষ্ক, বিকলাঙ্গ, ইন্দ্রিয়হীন হইতে পারে, কিন্তু হৃদয়শূন্য হইতে পারে না। নিরবচ্ছিন্ন অমৃতধারাবৎ সুখানুসন্ধানস্মৃতিই, হৃদয়ের আনুকূল্যময় অভিনিবেশ বা আবেশই সাধনভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। ইহা জগতের কোন জিনিষের অপেক্ষা করে না। এই অনুকূলা গাঢ়তৃষ্ণা দ্বারাই তাঁহাকে সহজে পাওয়া যায়। সেই জাতীয় মহতের কৃপাফলে অথবা নিরুপাধি প্রীতির পাত্রের কৃপাফলে সেই হৃদয়টি পাওয়া যায়। সেই মহৎ নিরুপাধি প্রীতির পাত্রকে যেভাবে ভালবাসেন তাঁহার সঙ্গকৃপাক্রমে সেই ভাবটি পাওয়া যাইবে।

প্রয়োজন—মুক্তি বা বিমুক্তি অর্থাৎ প্রীতি। পরতত্ত্বের 'বিজ্ঞান' বা 'অনুভব' শব্দের অর্থ সাক্ষাৎকার, অর্থাৎ ভালবাসা। ভালবাসায় রকমভেদ আছে। কান্ত, পুত্র, বন্ধু, প্রভু ও নিরপেক্ষভাবে তাঁহাকে ভালবাসা যায়। কান্তভাবে ভালবাসাই সর্বশ্রেষ্ঠ। তারমধ্যে আবার যে প্রীতির আধারের নিকট শ্রীগান্ধর্বা-দয়িত স্বাধীনভাবে প্রকটিত হন, সেই প্রীতিই প্রীতি-বিচারে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। পরতত্ত্বের স্বরূপানন্দ ও স্বরূপশক্তির সাহচর্যে প্রকাশিত আনন্দভেদে আনন্দ দুই প্রকার। স্বরূপানন্দ—ব্রহ্ম প্রভৃতি। স্বরূপ শক্ত্যানন্দ—প্রীতির

আধার যিনি, তাঁহার নিকট হইতে প্রীতির পাত্র যে আনন্দ লাভ করেন।

ভগবান সর্বব্যাপক হইয়াও নিজের ধামে আবির্ভূত হন, আবার ভক্ত-হৃদয়েও আবির্ভূত হন। স্বরূপানন্দ হইতে স্বরূপশক্ত্যানন্দেরই শ্রেষ্ঠতা। তার মধ্যে হ্লাদিনীশক্তির প্রকাশেই আনন্দ বেশী। এই শক্তিটি উপাসক ও উপাস্য—দুই জনকেই আনন্দ দেন। হ্লাদিনীশক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ—শ্রীগান্ধর্বা। সেই শ্রীগান্ধর্বা ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ-সেবিত পরতত্ত্বের প্রতি, সেই সঙ্গিনীগণের আনুকূল্যময়ী যে প্রীতি, তাহাই প্রয়োজনবিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ।

জীব—মায়াধীশ-মায়াবশ-বিচারে পরতত্ত্বের সহিত ভেদ-বিশিষ্ট; আবার শক্তি-শক্তিমদ্ বিচারে অভিন্ন। ইহাদের মধ্যে আবার পরিমাণগত ভেদ আছে। এই যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বিচার, ইহা বাদ নহে, পরন্তু পরম সত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ নির্দোষ সিদ্ধান্ত।

দেখা গেল যে, শাস্ত্র, মন্ত্র, উপাস্যবস্তুনির্ণয়, মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি, ধাম, উপকরণ, অভিধেয় (প্রাপ্তির উপায়), প্রয়োজন, জীব ও মায়া সম্বন্ধে যে বিচার, ইহা দ্বারা গৌড়ীয়ের বৈশিষ্ট্য জানা যায়। পূর্ণতমবস্তুর মধ্যে সব আছেন; সুতরাং তাঁহার উপাসক গৌড়ীয়-গণই পূর্ণ সম্প্রদায়। অন্য সমস্ত সম্প্রদায়ই তাঁহাদের অন্তর্গত আংশিক সম্প্রদায়। শ্রীকৃষ্ণ যদি দেবতাবিশেষ হন,—তাহা হইলে গৌড়ীয়গণও একটি সম্প্রদায় বিশেষ। আর যদি শ্রীকৃষ্ণ আংশিক দেবতা বিশেষ না হইয়া, সর্বশক্তিমান্ স্বয়ংরূপ শ্রীভগবান হন, তাহা হইলে গৌড়ীয়গণকেও পূর্ণ সম্প্রদায় বলিতে হইবে।

মাধ্ব মতে—শ্রীমহাভারতই সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। শ্রীকৃষ্ণ পরশুরামের ন্যায়ই পূজ্য। এই মতে রস-বিচারে এত 'চুলচেরা' বিচারও নাই। রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ পরম কারুণিক, একথা তাঁহারা বলেন না। তাঁহাদের মতে বায়ু ও ব্রহ্মাই শ্রেষ্ঠ উপাসক। ব্রজবধূগণকে স্বর্বেশ্যার সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন, এটি সমগ্র পরমার্থী গৌড়ীয়গণের নিকট অত্যন্ত অপমানজনক। মধ্ব-প্রণীত ভাগবত-তাৎপর্যে 'আসামহো' শ্লোকের তাৎপর্য নাই। এই মতে **সাধন**—বিষ্ণুর আজ্ঞা পালন করিয়া বিষ্ণুতে কর্মার্পণ; **প্রয়োজন**—বায়ু ও ব্রহ্মার মধ্য দিয়া মুক্তি লাভ। বায়ু ও ব্রহ্মা অভিন্ন। তাহাদের উপর লক্ষ্মী, তিনি বিষ্ণুর অধীনা,—অক্ষর বস্তু। তাঁহার উপর পুরুষোত্তম। লক্ষ্মীর বশীভূত পুরুষোত্তমের বিচার নাই। এইজন্য শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু মধ্বাচার্যকে স্বীয় অভীষ্টযুগলের সুখানুসন্ধানরত গুরুদেবরূপে স্বীকার করেন নাই। শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণপাদ তাৎকালিক প্রয়োজনানুসারে, পাছে গৌড়ীয়গণকে অবৈদিক, অবৈষ্ণব বলে, এইজন্য গৌড়ীয়গণকে মাধ্ব-মতান্তর্গত বলিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদিগকে খর্ব করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীজীব-প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা অবলম্বন করিয়া ষট্সন্দর্ভ লিখিয়াছেন।

সন্দর্ভ শব্দের সজ্ঞা—"গূঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা। নানার্থবত্ত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥" Disquisitive Exegesis. মুক্তি—স্ব-সুখতাৎপর্যময়ী ও প্রেম সেবাময়ী, দুই প্রকার। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পরমাত্মসাক্ষাৎকার ও ভগবদ্-সাক্ষাৎকারের নাম মুক্তি। স্ব-সুখতাৎপর্যময়ী মুক্তি অপেক্ষা

প্রেম-সেবা শ্রেষ্ঠ। নারায়ণ বা পুরুষাবতার অপেক্ষা কৃষ্ণে নিরুপাধি প্রীতির পাত্রত্ব বেশী। তার মধ্যে আবার শ্রীগান্ধর্বা-দয়িতে প্রীতির পাত্রত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। সেই প্রীতির পাত্রটির প্রেমসেবা যাঁহারা করেন, তাঁহারা আরও বড়।

প্রেমসেবার কথা শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ-জীবের একচেটিয়া। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি যদি পরতত্ত্বের কথা বলেন, সত্যবস্তু যদি নিজের কথা নিজে বলেন, তাহা হইলে তাহার মধ্যে কোন সন্দেহ আসিতে পারে না। "যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা" (ভাঃ ১১।২।৩৪) ইত্যাদি শ্লোকে যে ভাগবতধর্মের কথা বলা হইয়াছে, সেই ভাগবতধর্মের কথা সৃষ্টির আদিতে ভগবান ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন। ভগবানের স্বরূপশক্তি যদি তাঁহার কথা বলেন, তখন তার মধ্যে কোন বিচার বা সন্দেহ আসে না।

এই শ্রীধাম মায়াপুরে স্বয়ং পরতত্ত্ববস্তু তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সেবিকার ভাব ও কান্তিটি চুরি করিয়া আসিয়া, নিজের কথা নিজেই বলিয়া গিয়াছেন।

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরো দ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥"

—সুতরাং ইহার মধ্যে কোন বিবাদ নাই। ধার্মিকসম্প্রদায় কল্পনা বা মেধার আশ্রয়ে যাহা বলেন, তাহা অধিকতর মেধার দ্বারা খণ্ডিত হয়; কিন্তু সত্য, স্বতঃ প্রকাশবস্তু যখন নিজের কথা বলেন, তখন তিনি শুদ্ধ জীবকে আকর্ষণ করেন, তখন তাহার

মধ্যে দ্বন্দ্ব করিবার কিছু থাকে না। সুতরাং এটি অবিসংবাদিত সত্য। আকর বস্তুকে আংশিক বলা যায় না। গৌড়ীয়গণ শাস্ত্র, মন্ত্র, উপাস্য, সাধন, ধাম, প্রয়োজন বিচারে সকল সম্প্রদায়েরই আকর বা অংশী।

শ্রীমদ্ভাগবত—আকর শাস্ত্র। অন্য সমস্ত শাস্ত্রই তাঁহার অংশ, সোপান বা বিকৃত প্রতিফলন অথবা তাঁহার সহিত অভিন্ন হইয়াও অল্পশক্তির আকর বস্তুকে প্রকাশ করিয়াছেন। গৌড়ীয়গণের শাস্ত্র, মন্ত্র, ঋষি, উপাস্য, সাধন, ধাম, প্রয়োজন—সমস্তই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন। গৌড়ীয়গণের মন্ত্রের মধ্যে সমস্ত মন্ত্র, উপাস্যের মধ্যে ব্রহ্ম, পরমাত্মাবির্ভাবাদি, ঋষি শ্রীগান্ধর্বার মধ্যে সমস্ত উপাসক, সাধনের মধ্যে সমস্ত সাধন ও প্রয়োজনের মধ্যে সমস্ত প্রয়োজন অন্তর্ভুক্ত আছে। এখানে জড়ীয় ভেদবাদ উপস্থিত করিতে হইবে না। ভেদ যেখানে, সেখানেই বাদ উপস্থিত হইয়াছে। মুক্তিকে তখনই 'কৈতব' বলা হইয়াছে,—যখন অদ্বৈতবাদিগণ মুক্তিকে প্রেমভক্তি হইতে পৃথক করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ভক্তি হইতে জ্ঞানকে পৃথক্ করিবার চেষ্টা হইয়াছে বলিয়াই নির্বিশেষ জ্ঞানকে গর্হণ করা হইয়াছে।

ভক্তি—আনুকূল্যময়ী গাঢ় তৃষ্ণা, তার দ্বারা কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্ম-পরমাত্মার আশ্রয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিও জ্ঞান, কর্ম ও যোগের আশ্রয়। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পৃথক্ যে শাস্ত্র, সেটি আংশিক। বিপরীত দৃষ্টি লইয়া পরতত্ত্ববস্তুর আলোচনা করিয়াছে বলিয়া সেই নির্বিশেষ মায়াবাদকে গর্হণ করা হইয়াছে। প্রকৃত যোগীত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব ভক্তের মধ্যেই আছে।

তাহা না হইলে সর্বশ্রেষ্ঠভক্ত অম্বরীষের প্রতি দ্রোহাচরণকারী দুর্বাসাকে শ্রীভগবান উপদেশ দিতেন না। দুর্বাসা ব্রহ্মানুভবকারী মুক্ত-পুরুষ। তিনি সাময়িকভাবে একটা লীলা মাত্র দেখাইয়াছেন। তিনি যে ব্রহ্মের উপাসক, সেই ব্রহ্ম অম্বরীষের উপাস্য দেবতা হইতে পৃথক্ নহেন। কোন ভগবদ্ভক্তই নির্বিশেষ ব্রহ্ম বা ব্রহ্ম-জ্ঞানের নিন্দা করেন না। যখন নির্বিশেষবাদিগণ ভগবান বা ভক্তি হইতে ব্রহ্মকে বা ব্রহ্মজ্ঞানকে পৃথক্ বিচার করে, তখনই তাহাদের নিন্দা।

অর্থ দুই প্রকারে হৃদ্গত হয়; (১) অজ্ঞরূঢ়ি—ইহা বদ্ধ-জীবের কল্পিত। (২) বিদ্বদ্‌রূঢ়ি—ইহা মুক্তপুরুষের নিকট আবির্ভূত। বিদ্বদ্‌রূঢ়ির সাহায্যেই শাস্ত্র-তাৎপর্য জানিতে হইবে।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মূল মহাজন শ্রীস্বরূপদামোদরগোস্বামি-প্রভু। তাঁহার অভিন্ন-হৃদয়-বান্ধব শ্রীরূপ-সনাতন, তাঁহাদের অনুগত চারি বা ছয় গোস্বামী। (শ্রীল লোকনাথ ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সহ)। ইঁহাদের ধারায় জন্ম হইলে, শুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে, ঐ আকর পরমেশ্বর, শাস্ত্র, মন্ত্র, উপাস্য প্রভৃতির কথা উপলব্ধি হইবে। গৌড়ীয়গণকে মাধ্ব বলিলে তত্ত্ববিচারে খুব ভুল হয় না; পূর্ণকে অংশ বলিলে তত্ত্বগতবিচারে দোষ না হইলেও রসবিচারে দোষ হয়। ভগবানের আবির্ভাব সময়ে ব্রহ্মার নিকট প্রকাশিত শ্রীক্ষীরোদশায়ীর বাণী দৃষ্ট-শ্রুতার্থভাবে বিষ্ণুর কথা হইলেও উহা স্বয়ংরূপের কথা বলিয়াই বিদ্বদ্গণ জানেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীযশোদা ও শ্রীদেবকীতে যুগপৎ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দন্তবক্র-বধের পর শ্রীনন্দনন্দন

শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ব্রজবাসীদিগকে স্ববিগ্রহসহ অপ্রকটপ্রকাশে লইয়া গেলেন। অবশিষ্ট লীলা প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার অভিন্ন মুখ্যপ্রকাশ আদি চতুর্ব্যূহান্তর্গত বাসুদেবকে প্রপঞ্চে প্রকট রাখিয়া গেলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের এই সকল নিগূঢ়তম সিদ্ধান্ত গৌড়ীয়-গণেরই একচেটিয়া বৈশিষ্ট্য। তাঁহাদের কৃপাতেই ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর স্পর্শন, তাহাতে অবতরণ, নিমজ্জন, অবগাহন, সন্তরণ ও তাহা হইতে রত্ন আহরণ সম্ভব; অন্য কোন উপায়ে সম্ভব নহে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্

২৩শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার,
বাংলা ১৩৫০ সন।

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতাশ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

অদ্বিতীয় জ্ঞানময় পরতত্ত্ব বস্তু, যাঁহার সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ, যাঁহাকে পাইলে সব পাওয়া হয়, যাঁহার অভাবে সমস্তেরই অভাব, তাঁহার কথা পরমাত্ম, ভগবৎ ও কৃষ্ণসন্দর্ভে বর্ণন করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার উপায় ও তাঁহাকে পাইয়া লাভ কি; এই চরম প্রয়োজনের কথা ভক্তি ও প্রীতিসন্দর্ভে বর্ণন করা

হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্বে, সৃষ্টির মধ্যে, অর্থাৎ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের মধ্যে এবং সৃষ্টি-ধ্বংসের পরও গৌড়ীয়ের উৎকর্ষের কথা প্রসঙ্গ-ক্রমে আলোচিত হইয়াছে। তত্ত্বসন্দর্ভে প্রমাণ-চক্রবর্তী-চূড়ামণিরূপে শ্রীমদ্ভাগবতকে, ভগবৎসন্দর্ভে ব্রহ্মের ও পরমাত্মসন্দর্ভে পরমাত্মার স্বরূপ বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা স্থাপন করা হইয়াছে। পরমাত্মা শক্তিমান্ হইলেও জীবকে ও প্রকৃতিকে লইয়াই তাঁহার কার্য। জীব—পরমাত্ম-বৈভব ; ভগবদ্‌বৈভব নহে। ভগবদ্‌বৈভব স্বরূপশক্তির বিলাস, উহাকে অন্তরঙ্গবৈভব বলা যায়। তটস্থ বৈভবকে 'জীব' বলে। সেই জীব চিদেকরস অর্থাৎ চিৎ বা জ্ঞানই তাহার স্বরূপ বা স্বভাব। প্রীত্যাস্পদ সেই জীব জ্ঞানময় হইলেও অনাদিকাল হইতে ভগবদ্‌বহির্মুখ বলিয়া, মায়া তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। জীবের এই যে অনাদি ভগবজ্-জ্ঞানাভাব, ইহাকেই দার্শনিক ভাষায় (প্রাক্ + অভাব) প্রাগভাব জাতীয় বলা যায়। শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার গুরুমুখে শ্রুত-বাণী সমস্ত বাদবিসম্বাদকে নিরসন করিয়া স্থাপন করিয়াছেন।

যেখানে দুই পক্ষই নিজের মতকে সত্যসিদ্ধান্ত বলিয়া স্থাপন করে, তাহাকে 'বাদ' বলে। প্রাচীনকালে পরস্পর বাদকারীর মধ্যে একজন যখন পরাস্ত হইত, তখন সে বিজয়ীর শিষ্য হইয়া যাইত। এখন এই বর্তমান ঘোরতর কলিযুগে এরূপ সত্যানুসন্ধিৎসা নাই, কেবল জল্প, ছলনা, নিগ্রহ ও বিতণ্ডা আছে। 'আমি ভুল করিয়াছি' ইহা জানিয়াও সেই ভুলকেই সত্য বলিয়া স্থাপন করিবার জন্য কুতর্কই বিতণ্ডা ও ছল, ইহা পূর্বে ছিল না।

জীবের এই যে অনাদি পরতত্ত্বজ্ঞান-সংসর্গাভাব, এটি অনাদি হইলেও বিনাশী। যে কারণ বশতঃ হইয়াছে, পরে সেই কারণটি থাকে না। পরতত্ত্বজ্ঞানের প্রাগভাব দূর হইলে অজ্ঞান বা দুঃখ নিবৃত্তিরও ধ্বংসাভাব হইবে। পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ দেখা পাওয়া বা মাধুর্যানুভব না হওয়া পর্যন্ত বা ভালবাসা না হওয়া পর্যন্ত জীবের আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার হয় না। এখানকার সব জিনিষই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের মধ্যে থাকে। জীব স্বরূপতঃ দেহ নহে, তথাপি এই বিমুখতার ফলে তাহার দেহে আপন বুদ্ধি আসিয়াছে। এখন যাহাতে এই অজ্ঞান দূর হয়, দুঃখনিবৃত্তি হইয়া সুখ পাওয়া যায়, তাহার উপায় কি? অজ্ঞান-দুঃখের নিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির উপায় বর্ণন করিয়াছেন, পরমকারুণিক শাস্ত্র। পরব্রহ্মই অক্ষরাকার ধারণ করিয়া ভগবদবতার জগদ্‌গুরু আচার্য শ্রীব্যাসদেব, যিনি বাস্তবতত্ত্বের সন্ধান দিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে শাস্ত্ররূপে প্রকটিত হইয়াছেন।

শ্রুতি—অপৌরুষেয়। শ্রীবেদব্যাস প্রণীত শাস্ত্র পৌরুষেয় হইলেও অসনাতন নহেন, যেমন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কৃত সত্যকে তাৎকালিক বলিয়া অবজ্ঞা করিলে মূর্খতাই হয়। অতএব সময়ের ভেদ অনুসারে সত্যের পরিমাপ হইবে না। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ক্লেশ, অবিদ্যা, পাপবাসনা, পাপ (বিধির অকরণ ও নিষিদ্ধকার্য করাকে পাপ বলে)—এই সমস্তের প্রতিকারের এবং এ-ছাড়া নিত্য ধন প্রাপ্তির বা সুখ প্রাপ্তির কথাও শাস্ত্র বলিয়াছেন।

শাস্ত্র শ্রবণের অধিকারী—সৌভাগ্যবান্‌ জীব।

সৌভাগ্যবান্ দুই প্রকার—(১) যাঁহাদের পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকার বিষয়ে প্রাক্তন সংস্কার আছে। (২) যাঁহারা মহতের অত্যন্ত কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। পরতত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম-পরমাত্ম ভগবদালোচনা কাণে যাওয়া মাত্র ইঁহাদের উপাসনা আরম্ভ হইয়া যায়, সুপ্তোত্থিতের মত মুখটা ফিরাইয়া লয়, আর বিলম্ব করে না। কাহারও কাহারও পরতত্ত্বানুভব হইয়াও যায়। তাহাদের পক্ষে অন্য উপদেশ শ্রবণ করার প্রয়োজন নাই। তাহাদের কাণে যে উপদেশ আসে, সেটি তাহাদের অনুভব ঝাড়াইয়া দেয়। দুর্ভাগা জীবের হৃদয় অস্বচ্ছ, মনটি 'সাফ' নয়, দূষিত বলিয়া তাহারা যাহা শোনে তাহা আকাশেই বিলীন হইয়া যায়; কেননা, তাহাদের এখনও মুক্তি লাভের সময় হয় নাই, আরও অনেককাল কষ্ট পাইতে হইবে। অথবা তাহাদের বহু ইতর বাসনা আছে। মাটি ও উদরবাদিগণ শ্রেয়ের কথা জানে না, প্রেয়ঃই ভালবাসে; শাস্ত্রের কথা শুনিয়াও শুনে না। অস্বচ্ছ-হৃদয় ব্যক্তি হয় পাপী, না হয় অপরাধী।

পাপী—(১) **ইন্দ্রিয় দ্বারা জগদ্‌ভোগে ব্যস্ত বিষয়ী; যথা—সাধারণ দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতি।** (২) **অবজ্ঞাকারী—যাহারা মঙ্গলানুসন্ধান বিষয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে; যথা—ইন্দ্র।**

অপরাধী—(১) **অরুচিবিশিষ্ট, যথা—কালযবন।** (২) **বিদ্বেষী অর্থাৎ বস্তুর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা পোষণকারী; যথা—শিশুপাল।** উদাহরণ যথা—বাত-পিত্ত-কফ-দূষিত জিহ্বা-কর্তৃক মিছরীর আস্বাদনভেদ।

আবরণ—ধূলা, কাদা, কাঠ, লোহা, পাথর ও বজ্র।

ময়ূরের পাখা ও চাদর দ্বারা ধূলা ঝাড়া যায়। আরও বেশী হইলে বুরুশ ব্যবহার করিতে হয়। কাদা—জলের দ্বারা, কাঠ—লোহার অস্ত্র-দ্বারা, পাথর—শাবল দ্বারা, লোহা—Acetyline gas দিয়া, পাহাড় ডিনামাইট দিয়া ফাটাইতে হয়। যাহাদের চিরস্থায়ী মঙ্গলের প্রতি আদর বা শ্রদ্ধা নাই, তাহাদের আবরণ চারি প্রকার, চিকিৎসাও চারি প্রকার। শাস্ত্র যে একমাত্র হিতৈষী, আর গুরুদেব যে অপ্রাকৃত নিত্যবান্ধব, একথা জানা যায় না, যদি ঐ প্রকার পাপ বা অপরাধ থাকে। অনেক জন্ম যদি নিষ্পাপধর্ম আচরণ করা যায়, তাহা হইলে প্রয়োজন বা সাক্ষাৎকার লাভ হয়, দুঃখনিবৃত্তি হইয়া সুখপ্রাপ্তি ঘটে। এই সৎসঙ্গ, ইষ্টাপূর্তি ইত্যাদির দ্বারা লভ্য সৎসঙ্গ, এটি সাধন ভক্তির পূর্বাঙ্গ; ইহার পরে শাস্ত্র শ্রবণ। পরতত্ত্ববস্তুকে জানা দরকার, না জানিলে মঙ্গল নাই, এইটিই মূল কথা হইলেও এই সন্ধান পাওয়াটিই শেষ কথা নহে। তাঁহার সঙ্গে আমাদের কি কৃত্য? এই কর্তব্য নির্ণয়ের নামই অভিধেয়। তাঁহাকে কি করিয়া পাওয়া যায়, পাইয়াই বা লাভ কি?—এই দুইটি প্রশ্ন সঙ্গে সঙ্গেই আসে। তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইলেই অর্থাৎ উপাসনার দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় বা জানা যায় বা অনুভব করা যায় অর্থাৎ ভিতরে বাহিরে দেখা পাওয়া যায় অর্থাৎ ভালবাসা যায়। ভালবাসিতে পারিলে অজ্ঞান বা দুঃখ দূর হইয়া যাইবে; পুনরায় আর হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত শুদ্ধ হইবে এবং সুখপ্রাপ্তিও তখনই হইবে। পরতত্ত্বের সহিতই জীবের কৃত্য, অথচ তাঁহার

প্রতি বহির্মুখ হইয়া মুখ ফিরাইয়া আছে জীব, এইজন্যই তাহার এত কষ্ট। এই কষ্টের নিদানচিকিৎসা করিতে হইবে। যে কারণে দুঃখ, কষ্ট বা অজ্ঞান, তাহার বিপরীত দিকে চিকিৎসা করিতে হইবে। বিপরীত দিকে মুখ ফিরানোর জন্যই যখন সংসার-কষ্ট, তখন সাম্‌নের দিকে মুখ ফিরানোই দরকার। "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ"—শ্লোকে পরতত্ত্বকে পাইবার উপায় এমনভাবে, সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন আর নাই। "বদন্তি তৎ" শ্লোকেও ঠিক এইরূপভাবে পরতত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে,—যাহা আর কোথায়ও দৃষ্ট বা শ্রুত হয় না।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

২৭শে ফাল্গুন,
শনিবার, বাংলা ১৩৫০ সন।

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতাশ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

পরত্বকে জানিলে জীবের অজ্ঞান-দুঃখ দূর হয়। জানা অর্থ—অনুভব অর্থাৎ অন্তরে বাহিরে দেখা-পাওয়া। দেখা-পাওয়া অর্থ—

তাঁহাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা নয়, নিজকে তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা অর্থাৎ তাঁহাকে দ্রষ্টা ও নিজকে দৃশ্য জানিয়া, দ্রষ্টার ইন্দ্রিয়ের সুখবিধান করা, অর্থাৎ—দ্রষ্টাকে সুখী দেখা। ইহাই জীবের নিত্যপ্রয়োজন, ইহাই নিত্যস্থায়ী অবাধ সুখ। কেবল দুঃখনিবৃত্তিই পুরুষার্থ নয়, পরমানন্দ প্রাপ্তিই পুরুষার্থ বা মুক্তি। 'মুক্তি' শব্দে মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তিতে পরমানন্দ-প্রাপ্তিই বুঝায়। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিনটি আবির্ভাবই পরমানন্দ। ইহাদের প্রাপ্তিই মুক্তি। এই মুক্তি বা পরমানন্দ প্রাপ্তি—পূর্ণ, কেননা পরতত্ত্বের সমস্ত আবির্ভাবই পূর্ণ। ব্রহ্মে শক্তি বা ধর্মের প্রকাশ নাই বলিয়া তিনি নির্বিশেষ। পরমাত্মায় শক্তির বা ধর্মের আংশিক প্রকাশ আছে। **পরমাত্মা হইতেও** ভগবানে প্রিয়ত্ব ধর্ম গুণটি অতিরিক্ত আছে বলিয়া, তিনিই গুণবিচারে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন। প্রিয়ত্বধর্ম অর্থাৎ উপাসকের ভালবাসা নিতে জানেন—এইজন্য ভগবানের সবিশেষত্বের মধ্যে চমৎকারিতা বা আনন্দ-বৈচিত্র্য আছে।

"আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ"—এখানে "ময়ট্" প্রত্যয় দ্বারা প্রাচুর্য বা বৈচিত্র্য বুঝা যায়। তিনি সর্বগুণসম্পন্ন হইয়াও নিরপেক্ষ নহেন। তিনি উপাসকের প্রীতি চান এবং নিজেও প্রীতি লাভ করেন। ভগবানকে সুখী করাই মূল কথা বটে, তবে ইহার মধ্যে রকমারি এই যে, অবিরোধে অর্থাৎ ভগবান যেভাবে সুখী হইতে চান, সেইভাবে তাঁহাকে সুখী করিতে চেষ্টা করাই 'প্রীতি'। **যেভাবে তাঁহাকে পাইলে তিনি সুখী হন, (তাঁহার সুখের অবিরোধে অর্থাৎ প্রতিকূলে নয় বা নিজের**

সুখবাঞ্ছা মূলে নয়) সেইভাবে তাঁহাকে পাইবার ইচ্ছা প্রীতিকে বিস্তার করে। ইহাকে স্বার্থশূন্য ভালবাসা বলা যায়। আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তি ইহার মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়। আর একটি লক্ষণ হইতেছে—সম্ভোগে ও বিয়োগে তিনি সুখী আছেন, ইহা জানিয়া উল্লাসবোধ। উপাসক ও উপাস্য পরস্পর পরস্পরকে সুখী দেখিতে চান—এইটিকে **প্রিয়ত্বধর্ম** বলে।

শ্রীজীর কৃষ্ণকে—শ্রীজীর অনুগত বা অনুকূলকৃষ্ণকে সুখী দেখিবার ইচ্ছার মধ্যেই প্রীতির পর্যবসান।

এই যে ভগবানের সুখে উল্লাসবোধ, এটি প্রীতিতে থাকিবেই। **এই উল্লাস সাধ্যভক্তি**। সাধন ও সাধ্যভক্তি পৃথক্ বস্তু নয়। সাধনে ও সাধ্যে থাকিবে নিরবচ্ছিন্ন সুখানুসন্ধানময় আবেশ, অভিনিবেশ, ধ্যান বা স্মৃতি। যে সাধনে এই স্মৃতিটি নিরবচ্ছিন্না থাকে, সেটি সর্বোত্তম সাধন, সেটিই রাগানুগা ভক্তি। রাগানুগা ভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়, আর বৈধী ভক্তিতে শ্রীনারায়ণকে পাওয়া যায়—ইহাই বৈশিষ্ট্য।

ভগবদাবির্ভাবগণের মধ্যে নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও স্বভাবের চমৎকারিতার তারতম্য আছে। শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত কল্যাণগুণের পরাকাষ্ঠা। তাঁহার রূপের সমান বা অধিক নাই। **শ্রীবিগ্রহ-রূপ-মাধুর্য**—এই অসমোর্দ্ধরূপ-শোভার দ্বারা তিনি স্থাবর-জঙ্গমকে চমৎকৃত করেন। **বংশীমাধুর্য**—বংশীর মনোহর ধ্বনির দ্বারা তিনি স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে আকর্ষণ করেন। সেই ধ্বনি ধর্ম, লজ্জা, ভয়—সমস্ত মুছিয়া ফেলিয়া দিয়া বলপূর্বক,

ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইষ্টদেবকে সুখী করিবার জন্য পাগল করায়। শব্দের ধ্বনি গোপীগণের নিকট লীলাবিশেষের ভাব পৌঁছাইয়া দেয়। বংশীর প্রতি কখনও সাপত্ন্যভাব, আবার কখনও বংশীর নিকট একান্ত আনুগত্যের ভাব আনিয়া দেয়।

লীলামাধুর্য—এক একটি লীলা প্রতিক্ষণে অদ্ভুত মাধুর্য প্রকাশ করে।

ভক্তমাধুর্য—তাঁহার ভক্তগণের প্রেমের তুলনা নাই। তাঁহাদের দ্বারা তিনি বেষ্টিত বা শোভিত। এই চারিটি গুণের তুলনা সমস্ত ভগবদবতারগণের মধ্যে নাই। প্রীতিরসের তারতম্য-ভেদে প্রীতিরসাশ্রিত-ভক্তগণ শ্রীভগবানের কঠিন-কোমল স্বভাব বা রূপকে দেখিতে ও পাইতে পছন্দ করে। যাহার যত কঠিন বৃত্তি প্রবল, সে তাহার সেই কঠিন বৃত্তিকে দমন করিতে পারেন যিনি, তাঁহাকেই পছন্দ করে। যাঁহার কঠিন বৃত্তি কম, তিনি সহজ-কোমল রূপটিকে দেখিতে চান। "নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ"—শান্তা—নিরপেক্ষাঃ, স্নিগ্ধাঃ। যে যতটা বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত, সে উপাস্যবস্তুকে সেইভাবে দেখিতে চায়। এইজন্য কৃষ্ণ, হরি ও রাম এই তিনটি নাম পূর্ণবস্তুকে প্রকাশ করে। সর্বশক্তিমানের নামও সর্বশক্তিমান্। নির্বিশেষ, নির্ধর্মক পরতত্ত্বে নাম-রূপ-গুণ-লীলার পরিচয় নাই। হৃদয় যতই নির্মল বা শুদ্ধসত্ত্ব হয়, ততই সধর্মক, শক্তিমান্, সবিশেষের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার আবির্ভাব হয়। কৃষ্ণ, হরি ও রাম—(প্রিয়-রমণ, কেবল আত্মারাম নহে),—এই নাম সমস্ত রূপ-গুণ-লীলা-বৈশিষ্ট্যের থাকে। **প্রীতির তারতম্যানুসারে ভগবদাবির্ভাবের,**

অবার ভগবদাবির্ভাবের তারতম্যানুসারে প্রীতির তারতম্য হয়।

প্রীতি—হ্লাদিনী শক্তি। ব্রহ্মবিচারে শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদরূপে, আর সবিশেষ পরতত্ত্ববিচারে শক্তি ও শক্তিমান্ ভেদবৎ প্রতীয়মান। প্রিয়ত্বধর্মের অনুভবের তারতম্য অনুসারে সাক্ষাৎকারের তারতম্য হয়। দৃষ্টান্ত যেমন,—রাজাকে প্রজা দেখিতে গেল, কিন্তু তিনি সেই প্রজাকে ডাকিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা বলিলেন না ; ইহাতে সুখ হয় না। **সাক্ষাৎকারে যদি পরস্পরকে আপন বলিয়া জানা যায়, তাহা হইলে সেটিই প্রকৃতপক্ষে সাক্ষাৎকার।**

ভক্তি ও ভালবাসা—সাধন ও সাধ্য। সাধ্যে **ভালবাসা** ও সাধনে নিরবচ্ছিন্ন **আবেশ** থাকিবে। এই অভিনিবেশময় সাধনদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়। প্রাপ্তসিদ্ধদেহ পার্ষদ, নির্ধূত কষায় ও মূর্চ্ছিত কষায় সাধু ভগবানকে যেভাবে সুখী দেখেন, সেইভাবে তাঁহাকে সুখী দেখিবার জন্য আবেশ, তৃষ্ণা বা উৎকট পিপাসা ও **নিজপ্রিয় সাধুর সেবাপরিপাটীর অনুসরণের নামই রাগানুগা ভক্তি। যে ভাবাশ্রিত সাধুর সঙ্গ লাভ হইবে, সেই সাধুর নিকট ভগবান যেভাবে দেখা দেন, ঐ সাধুর অনুগত সাধকের নিকটও সেই ভাবে দেখা দিবেন।** এই যে প্রেমিকভক্ত যেভাবে ইষ্টদেবকে সুখী দেখেন,—সেইভাবে দেখিবার জন্য যে গাঢ় তৃষ্ণা, তাহা বিধিবাধ্য নয় ; তাহা স্বাভাবিকী অপ্রতিহতা 'তৃষ্ণা', ইহার নামই 'রাগ'। সাধ্যভক্তিতে আবেশ নিত্যস্থায়ী হয়, সাধনে

ততটা হয় না। তবু সাধনে ও সাধ্যে তফাৎ নাই। রাগানুগার গতি খুব বেশী বেগবতী,—সবলা ; বৈধীভক্তির ন্যায় দুর্বলা নয়। বৈধী রাগে পর্যবসিত না হইলে শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে পারে না। রাগভক্তিতে সাধ্য ও সাধন, উভয়দশাতেই পরমাবেশ থাকে। তবে সাধ্য নিত্যস্থায়ী আবেশের, উল্লাসের বা পরমানন্দের প্রাচুর্যও চমৎকার থাকে। রাগমার্গীয় ভক্তের আর একটি অসাধারণ লক্ষণ—যাহার আবেশ নাই, ইচ্ছা করিলে তাহাকে সঙ্গ বা শক্তি সঞ্চার দ্বারা অনর্থরাশি দূর করিয়া পরতত্ত্বে আবিষ্ট করিতে পারেন অর্থাৎ ভক্তিধনের অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে ভক্তি-ধন-যুক্ত করিতে পারেন। **যদি প্রকৃত ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহাকে নিজের ভূমিকায় উঠাইয়া লইতে পারেন।**

ভক্তির আর একটি অসাধারণ লক্ষণ—যদিও মুক্তি পরমানন্দময়, তথাপি পঞ্চবিধ মুক্তিকে ধিক্কার দেয়। মুক্তিতেও জীবের সম্পূর্ণ পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় না ; অর্থাৎ ব্রহ্ম-পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারে পরিপূর্ণতম আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ হয় না। এক তটস্থ জীব অন্য তটস্থ জীবকে তো পরমানন্দ কখনই দিতে পারে না। অণুচৈতন্য অণুচৈতন্যকে পাইয়া কখনই তৃপ্ত হয় না। অণু-সচ্চিদানন্দের যে অণু-আনন্দ, সেটি অণু-আনন্দকে আত্মসাৎ করিতে পারে না, বিভু-আনন্দই তাহা পারেন। এইজন্য অণু-চৈতন্যের আনন্দটি গৌণ অর্থাৎ পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকাররূপ বিভু-আনন্দের অধীন। হ্লাদিনী-শক্তিমান্ বিভুসচ্চিদানন্দই সকলের আশা পূর্ণ করিতে পারেন। "তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো

ন কালেন সর্বত্র গভীর রংহসা ॥” শুদ্ধসত্ত্ব-হৃদয় না হইলে প্রীতি হয় না। মহতের কৃপা-ফলে যখন হ্লাদিনীশক্তির আবির্ভাব, প্রভাব-বিস্তার বা স্পর্শ হয়, তখন নিরপরাধ ভজন-ফলে চিত্ত শুদ্ধসত্ত্ব বা স্বচ্ছ হয়। তখন বিক্ষেপ ও লয় অর্থাৎ রজোস্তমোগুণ-জনিত চাঞ্চল্য দূর হয়, মিশ্রসত্ত্ব দূর হয়, ইষ্টদেবের স্মৃতি প্রবল হইতে থাকে, প্রীতি ছাড়া অন্য কোন প্রকার চিত্তবৃত্তিকে তখন আর পছন্দ হয় না। ভক্তি ছাড়া অন্যবস্তুতে তখন বিতৃষ্ণা আসে, সঙ্গে সঙ্গে পরতত্ত্ববস্তুতে ও তাঁহার সম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়াতে তৃষ্ণা হইতে থাকে। অন্যবস্তুর প্রতি তখন কঠিন নিরপেক্ষভাব থাকে, উন্মুখতা থাকে না। এই তৃষ্ণা ও বিতৃষ্ণা যুগপৎ একসঙ্গে হইতে থাকে। পূর্ণবস্তুর সাক্ষাৎকারের জন্য তৃষ্ণা জাগিলে আর নশ্বর বিষয়ে অভিনিবেশ থাকে না। সাধ্যে যে উল্লাস, সেটি ‘সর্বথা ধ্বংসরহিতঃ সত্যপি ধ্বংসকারণে’—পরমানন্দবস্তুর আবির্ভাব হইতেছে বলিয়া সেটি ধ্বংস হয় না।

প্রীতির অসীম ক্ষমতা, কেননা সর্বশক্তিমান্ ভগবান সেখানে বশীভূত থাকেন। সর্বশক্তিমান্ পরাজিত যেখানে, সেই প্রীতির মাহাত্ম্য কে বর্ণন করিতে পারে? স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন, “আমি ভক্তের ঋণ শোধ করিতে পারি না।” ভক্তও ভগবানের ঋণ শোধ করিতে পারেন না। দু’জনের এই প্রেমের খেলার শেষ নাই। এটিই পরম চমৎকারিতা। সেই প্রেম-সমুদ্র অনন্ত বিচিত্র তরঙ্গ-মণ্ডিত, সে পরম চমৎকারের ইয়ত্তা নাই, তার কূল-কিনারা নাই, গভীরতার মাপ নাই। তরঙ্গের মধ্যে যে

আবার চমৎকারিতার বিচিত্রতা, তাহারও ইয়ত্তা করিতে কেহই পারেন না।

একাগ্রতা ও আবেশ ছাড়া প্রীতি হয় না। রজোগুণে কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশা বা ধর্মার্থকাম-রূপ বিষয়াভিসন্ধি থাকে, বিক্ষেপ হয়; আর তমোগুণে হিংসা, পরচর্চা, পরনিন্দা, নিদ্রা এইগুলি দেখা যায়। চিত্ত যতই স্বচ্ছ হইবে, ততই অবিদ্যা বা বাসনা, বিক্ষেপ, লয়—এইগুলি দূর হইতে থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে পরতত্ত্বের স্পষ্ট বা ছায়া আবির্ভাব হইতে থাকিবে, সুখানুসন্ধান-ধ্যান আসিতে থাকিবে। ক্রমশঃ যে উল্লাস প্রীতির পর্যবসান, সেই উল্লাস, ভগবৎসুখে সুখবোধ ও যেভাবে পাইলে তাঁহার সুখ হয়, সেইভাবে তাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা হয়। যাহার চিত্তে সেই রতির যত আবির্ভাব, ভগবৎ কৃপার আবির্ভাব, উল্লাস অর্থাৎ পরতত্ত্বের আবির্ভাবের সম্ভাবনা হইতেছে, ততই চিত্ত শুদ্ধ হইতেছে। সেখানে অসদুদ্দেশ্যের বা অপকামের বশে পরের আলোচনা থাকে না, তখন গুণগ্রাহিতা, মানদধর্ম প্রকাশিত হয়। সমস্ত বস্তুকে ইষ্টদেবের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত জানিয়া, ভগবদ্‌বৈভব জানিয়া, প্রণাম করে। "সেই সে বৈষ্ণবধর্ম সবারে প্রণতি।" রতিতে বিষয় অর্থাৎ প্রিয়জন ও আশ্রয়—এই দুই তত্ত্ব আছে। কখনও ভগবানই বিষয় ও ভক্ত আশ্রয়, আবার কখনও ভক্তই বিষয় ও ভগবান আশ্রয় হন। যেমন—যে সময়ে গুর্জরীরাগিনীতে গান শুনিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ছুটিয়া গিয়াছিলেন, সেখানে সেই সময় সেই মহিলাটি—বিষয় ও শ্রীগৌরসুন্দর—আশ্রয়। এই রতি মমতাবোধ করায়,

বিগলিত করায়, বিশ্বাসযুক্ত করায়, আসক্ত করায়, নব নব রূপে বোধ করায়, পাগল ও দিব্যোন্মাদ করায়। এই দিব্যোন্মাদে ভক্তের ও ভগবানের মধ্যে পৃথক্ অস্তিত্ববোধ, রমণ-রমণী বোধ লোপ করায়—পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য পর্যন্ত লোপ করায়।

প্রেমানন্দের পরম চমৎকারি-বৈচিত্র্যবশে ভক্ত নিজকে ভগবান ও ভগবান নিজকে ভক্ত মনে করিলেও নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দী জ্ঞানীর ধ্যানের বা আবেশের ন্যায় আনন্দবিলাস-বৈচিত্র্যরহিত অবস্থা নহে। এই অবস্থাটি সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব রূপে বাহিরে প্রকাশ পায়। এই অবস্থাকে "দিব্যোন্মাদ" বলে। যাঁহার উদ্দেশ্যে প্রীতি করা যায়, তিনিই 'বিষয়', যিনি প্রীতি করেন, তিনিই 'আশ্রয়'। বিষয় ও আশ্রয়কে যাহা আকৃষ্ট করায়, প্রীতিকে যাহা উদ্দীপিত করে, তাহা 'উদ্দীপন'। বুদ্ধিপূর্বক ইন্দ্রিয়সমূহে প্রকাশিত বাহ্যলক্ষণ চেষ্টাময় —'অনুভাব'। অবুদ্ধিপূর্বক চিত্তে প্রকাশিত দুর্বার লক্ষণ— সাত্ত্বিকভাব। সমুদ্রে বাতাস উঠিলে যেমন ক্ষুদ্র বীচির উচ্ছ্বাস দেখা যায়, সেই প্রকার নির্বেদ, দৈন্য প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। সেগুলি স্থায়ী নহে, উহাকে 'সঞ্চারী' ভাব বলে। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রকটিত যে শাস্ত্রে এই চমৎকার প্রেমের সুসূক্ষ্ম বর্ণন আছে, সেই শাস্ত্রের নামই 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' বা শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যানুভবসিন্ধু।

প্রীতির আর একটি লক্ষণ—ভগবানের অভিমান জাগাইয়া দেয়। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়টি যত বেশী আর্দ্র বা 'পালিশ' হয়,

ততই ভক্তে ও ভগবানে পরস্পরের প্রতি অভিমানস্বরূপ স্বভাবটির উদয় করায়।

ভগবান নিজকে প্রভু ভাবিলে ভক্ত নিজকে অনুগ্রাহ্য দাস, আবার ভক্ত নিজকে অনুগ্রাহক, লালক, পালক বা পোষক অভিমান করিলে ভগবান নিজকে অনুগ্রাহ্য, লাল্য-পাল্য জ্ঞান করেন। এইভাবে পরস্পর মিত্র অভিমান হয়। মৈত্রীতে পরস্পর হিত বাসনা ও অসঙ্কোচ থাকে। অনুগ্রাহ্যেও হিত বাসনা আছে। আবার ভগবান নিজকে কান্ত, দয়িত মনে করেন, ভক্ত নিজকে কান্তা, দয়িতা মনে করেন। প্রীতি **"দেহলী-প্রদীপ"** ন্যায়ানুসারে ভক্ত ও ভগবান, উভয়কে অভিমান যুক্ত করায়। অনুগ্রাহ্যাভিমান দুই প্রকার—মমতা-যুক্ত ও মমতাহীন। মমতাযুক্ত ভক্তই 'দাস' আর মমতাহীন 'শান্ত'। 'শান্তে' সুখ আছে কিন্তু মমতা বা আঠা বা সেবা নাই ; দৃষ্টান্ত যথা—সাধারণ মূর্খ লোকের চন্দ্র দর্শন আর কবির বা সমঝদারের চন্দ্র দর্শন। শান্তব্যক্তির দর্শনে বিষয় ও আশ্রয় পরস্পর সুখ পান, কিন্তু আকৃষ্ট হন না। প্রীতি দুইভাবে হয়, সুখ ও প্রিয়তা। সুখ—স্বনিষ্ঠ, আর প্রিয়তা—উভয়নিষ্ঠ ; প্রিয়তায় সুখবিধানের চেষ্টা আছে। সুখে আর একজনের দ্বারা নিজ সুখানুভব হয়, কিন্তু তাহার সুখবিধানের চেষ্টা থাকে না। প্রিয়তার মধ্যে স্বার্থ বিসর্জন আছে, স্বার্থপরতা নাই। প্রিয়তায় সুখ আছে, কিন্তু সুখে প্রিয়তা বা ভালবাসা থাকিবেই,—এমন কথা নাই। সুখ—গৌণ, প্রিয়তা—মুখ্য। সুখে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কবোধ না থাকিতে পারে, কিন্তু

প্রিয়তাতে দু'জন চাই, ইহাতে প্রিয়জনের সুখানুসন্ধানচেষ্টা আছে। এই ভালবাসার সাধনের কথাই শ্রীমদ্ভাগবত এক শ্লোকে বলিয়াছেন—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥"

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্‌-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্‌।

২৮শে ফাল্গুন,
রবিবার, ১৩৫০ সন।

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্‌ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্‌।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্‌ সহগণললিতাশ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥"

বদ্ধ জীবের রোগের মূল কারণ ও নিদান চিকিৎসার কথা বলিয়াছেন—"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ" এই শ্লোকে। 'একয়া'—'কেবলয়া'—অর্থাৎ যে ভক্তির অনুষ্ঠানে স্বার্থজনিত সংঘর্ষ নাই। উপাস্য ও উপাসকের সুখ সেখানে এক হইয়া যায়; সেখানে অসম্পূর্ণ, ভোগ্য বা ভেদযুক্ত দর্শন নাই। গুরুদেবতাত্মা হইতে হইবে, কল্পনার মধ্যে যাইতে নাই। শ্রৌত প্রণালীকে আদর করিলে গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া যাইবে। তার্কিকের কল্পিত

মত আশ্রয় করিলে পাওয়া যাইবে না। পরতমবস্তুর পূর্ণতমাবির্ভাবকেই 'পরমার্থ' বলে। সেখানে কেবল মিলন। সেই ভগবান নিজকে পাইবার উপায় অখণ্ডভাবে, অটুট্ভাবে যে ধারায় রাখিয়াছেন, সেই ধারাকে আশ্রয় করিলেই সত্যবস্তু পাওয়া যাইবে।

"সর্ববেদান্তসারং যদ্ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্ ॥"

'ব্রহ্মাত্মৈকত্ব লক্ষণম'—এইটি সম্বন্ধী; তিনিই তন্নিষ্ঠং—ভগবন্নিষ্ঠাই পরম চরম উপায়রূপে যাঁহাতে বর্তমান, তিনি। এই ভগবন্নিষ্ঠা যে শাস্ত্রের বর্ণনীয় অভিধেয়, তাহাই অদ্বিতীয় প্রমাণ সম্রাট—শ্রীমদ্ভাগবত। সম্বন্ধী বস্তুর প্রতি কৃত্য বা কর্তব্য কি? —ইহাই অভিধেয় শব্দের অর্থ অর্থাৎ ঐকান্তিকী ভক্তির অনুশীলনই সর্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয়। ঐকান্তিক হওয়া, অদ্বিতীয় পরমানন্দ বস্তুতে তন্নিষ্ঠ হওয়া, এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয় বা কর্তব্য। কৈবল্য শব্দে—কেবল প্রেম। এটি উল্লাসময়, আবার ইহাতে মমতাবোধও থাকিবে। প্রিয়জনের সঙ্গে এক হইয়া 'খাপে খাপে' মিলিয়া যাও, দ্বৈত যেন না থাকে, নিজের পৃথক্ কিছু না থাকে, তিনি যেন আত্মসাৎ করিয়া ফেলেন তোমাকে। ইহা নির্বিশেষ ব্রহ্মে অভেদ ভাবনা নয়। তবে পরতত্ত্ববস্তুর বিরোধী তোমার পৃথক্ স্বার্থাভিসন্ধি বা পক্ষপাতিত্ব যেন না থাকে—ইহাই মনে রাখিতে হইবে। তাঁহার সুখে তোমার নিজসুখ বিলীন হইয়া যাক্—তোমার নিজ সুখ-সাধন-বিচার নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হউক। এখানে ব্রহ্মে লীন হইবার কথা অবশ্য বলেন নাই।

বেদান্তের সার নির্যাস শ্রীমদ্ভাগবতই সর্বশ্রেষ্ঠ শব্দ-প্রমাণ। প্রমেয়—ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণসম্বন্ধী। এক অদ্বয় বস্তুরই তিনটি অবস্থান অনুসারে তিনটি আবির্ভাব বা প্রতীতি। সেই অদ্বয় জ্ঞানকে পাইবার উপায়—ব্রহ্মনিষ্ঠা, পরমাত্মনিষ্ঠা ও ভগবন্নিষ্ঠা। শেষটিই (ভগবন্নিষ্ঠাই) চরম। এই নিরবচ্ছিন্ন স্মৃতি বা পরা শান্তি বা ধ্রুবানুস্মৃতি বা নৈষ্ঠিকী ভক্তিই অদ্বিতীয় অভিধেয়। বৈধী ভক্তিতে ধ্রুবানুস্মৃতি হয়, রাগে পরমাবেশ হয়। এই পরমাবিষ্টতাই উত্তম। এই অভিধেয় যাজনের ফলে লাভ কি? তদুত্তর—'কেবল' অর্থাৎ শুদ্ধ, নির্মল অবস্থা লাভ। এই অবস্থা ছাড়া আর সমস্ত অবস্থাই সদোষ। এই কেবল অবস্থাই নির্মলতম ও শান্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবত্তার কথা বলিয়া, নবম পদার্থ মুক্তির আশ্রয়স্বরূপ দশম পদার্থ শ্রীকৃষ্ণেই ভগবত্তার পর্যবসান বলিয়াছেন। উপক্রম—উপসংহার (ইহারা দুইটি নহে—একসঙ্গে একটি চিহ্নরূপেই পাঠ্য) প্রভৃতি লক্ষণে শ্রীকৃষ্ণকেই স্থাপন করিয়াছেন। অর্থবাদ—(প্রশংসা), উপপত্তি—(যুক্তির দ্বারা সিদ্ধান্ত স্থাপন) চারিটি অসমোর্দ্ধগুণের দ্বারা দেখাইয়াছেন। সমস্ত সাত্বত শাস্ত্রই ন্যূনাধিক ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্রূপের কথা বলিয়াছেন। ব্রহ্ম ও পরমাত্মরূপ বা প্রকাশ-দ্বয়—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভুক্ত। সেই শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিয়াছেন বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতই সর্বশ্রেষ্ঠ। অভিধেয় বর্ণনে 'ধীমহি' শব্দে রাগময় আবেশের কথাই বলা হইয়াছে। কীর্তনাখ্যা ভক্তির মাহাত্ম্য শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বত্র কীর্তন করিয়াছেন। এমন

কি যদি প্রতিকূল ভাবেও আবেশ হয়, তাহা হইলে প্রতিকূল ভাবরূপ হেয়তা দূরীভূত হইয়া পার্ষদত্ব পর্যন্ত লাভ হয়, ইহাও বলিয়াছেন। শ্রীউদ্ধবজীরও উচ্চতম আকাঙ্ক্ষণীয় আদর্শ স্বরূপা শ্রীগোপীগণের প্রেমের তুলনা নাই। ব্রহ্মার আয়ুষ্কালেও তাঁহাদের প্রেমের ঋণ শোধ হয় না। এই প্রীতির গভীরতার ইয়ত্তা স্বয়ং ইষ্টদেবও করিতে পারেন নাই। স্বয়ং ভগবানেরও মহা চমৎকারপ্রদ সেই প্রেমের বর্ণনকারী শ্রীমদ্ভাগবতই সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। **অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের দেবতা—গোপীজনবল্লব, ঋষি—শ্রীবার্ষভানবী বা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সর্বসাধক-গুরু শ্রীব্রহ্মা** (বর্ষানীশ্বর)। **শ্রীবার্ষভানবীর অনুগত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে এই মন্ত্র আছে।**

ধাম—গোকুল, বৃন্দাবন। উপকরণ—পরমাবিষ্ট হৃদয়। সম্বন্ধী, অভিধেয়, প্রয়োজন (কৈবল্য), গুরু, মন্ত্র, ধাম ও উপকরণের আকর বা অংশীর সন্ধান দিয়াছেন—শ্রীমদ্ভাগবত। এই আকরের উপাসক যাঁহারা, পূর্ণতম আবির্ভাবের পরাকাষ্ঠা যাঁহাদের আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাঁহারা অংশের পূজক বা অংশ-পূজক সম্প্রদায় বিশেষের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন না। মধ্বাচার্য শ্রীব্রজবাসিনীগণকে স্বর্বেশ্যা বলিয়াছেন ; কেননা তাঁহারা জার-বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া ছিলেন। এই জারবুদ্ধির মধ্যে কি মাধুর্য, তাহা মধ্বাচার্য নিজের ভূমিকায় থাকিয়া বুঝিতে পারেন নাই। এই অপবাদ সমস্ত গৌড়ীয়গণকে অত্যন্ত আঘাত দিবে। মধ্বাচার্যের উপাস্য শ্রীলক্ষ্মী, তদুপরি তাঁহার উপাস্য শ্রীনারায়ণ, এমন কি, তদুপরি তাঁহার অংশী আদি চতুর্ব্যূহ বাসুদেবের পর্যন্ত

এই শ্রীরাধানাথ-মাধুর্য বুঝিবার ক্ষমতা নাই। এই শ্রীরাধানাথ-মাধুর্য সেই বাসুদেবেও জোর করিয়া স্ত্রী বা প্রকৃতিভাব ধারণ করিবার স্পৃহা জাগাইয়া ছিল। এই শ্রীরাধানাথই—শ্রীরাধা-মদন-মোহন, শ্রীরাধা-গোবিন্দ ও শ্রীরাধা-গোপীনাথ যথাক্রমে শ্রীচরণ-কমল-মধু, শ্রীবদন-কমল-মধু ও শ্রীউরোজ-কমল-মধু নিরবচ্ছিন্নরূপে পান করাইয়া প্রিয়াগণকে প্রমত্তা করান। সেই তিনঠাকুর মিলিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দররূপে আসিয়াছেন। সেই রাধা-ভাব-দ্যূতি সুবলিতের কথা কে বুঝিবে? সেই তিন ঠাকুর যাঁহাদের আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাঁহারাই 'গৌড়ীয়'। কেবল মন্ত্রগ্রহণের অভিনয় নয়, আবেশ ধর্মই যাঁহাতে নাই, তিনি গৌড়ীয়ই নহেন। গীতাতে শরণাগতিই শেষ কথা। শ্রীমদ্ভাগবত শরণাগতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গীতাতে ভক্তির পরাঙ্গ সাধুসঙ্গের কথা নাই; কীর্তনাদির কথা থাকিলেও নিরন্তর আবেশময়ী স্মৃতির কথা বেশী স্পষ্ট নাই। গীতার যেটি সর্বগুহ্য-তম-রাজগুহ্যযোগ, সেটি সর্বগুহ্যতম হইলে এই আবেশময়ী রাগানুগা ভক্তিকে সর্বগুহ্যাতিগুহ্যতম রাজগুহ্যবিদ্যা বলা যায়।

সাধুসঙ্গের মহিমা বর্ণনই শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য। কেবল-ভাব—যাহা দ্বারা শ্রীগোপীজনবল্লভকে পাওয়া যায়, সেই কেবল ভাব মহৎ সঙ্গ দ্বারাই পাওয়া যায়। আবেশধর্ম ব্যতীত বৈধী ভক্তিতে শ্রীকাশী-মিশ্র-ঈশ্বর শ্রীগৌরনারায়ণকে পাওয়া যাইবে কিন্তু শ্রীগদাধর-মাদন, শ্রীরূপানন্দবর্দ্ধন, শ্রীসনাতন-পালন বা শ্রীরঘুনাথ-সর্বস্বকে পাওয়া যাইবে না। সেই গোপীজনবল্লভকে পাইবার আশা যিনি পাইয়াছেন, তিনিই গৌড়ীয়। বৈধী ভক্তিতে

শ্রীনারায়ণকে পাওয়া যাইবে, কিন্তু শ্রীমথুরাবাসী বা ব্রজবাসিগণের দয়িতকে পাওয়া যাইবে না। রাগানুগাভক্তি তাঁহাদের মধ্যেই আছে। তাঁহাদের মধ্যে আবার শ্রীবার্ষভানবী ও তাঁহার কায়ব্যূহ, তদপেক্ষা আবার যাঁহারা তাঁহার দাস্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই একচেটিয়া, অন্য কোথায়ও ইহা নাই। রাগানুগা ভক্তি গৌড়ীয়েরই একচেটিয়া সম্পত্তি।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

২৯শে ফাল্গুন,
সোমবার, ১৩৫০ সন।

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

প্রীতির অসম্পূর্ণ আবির্ভাব অর্থাৎ যেখানে সম্পূর্ণভাবে বিষয়ের (প্রিয়জনের) আনুকূল্য চেষ্টা নাই, অন্যতাৎপর্য (অন্য জিনিষের প্রতি রুচি) আছে, সম্পূর্ণ প্রীতি-তাৎপর্য নাই, এরূপ অসম্পূর্ণ আবির্ভাব দুই প্রকার—আভাষ ও ঈষদ্ উদ্গম।

ঈষদ্ উদ্গমকে মুকুলিতাবস্থা বলা যায়, ইহা প্রীতির পূর্ণোদয়াবস্থা নয়। ঈষদ্ উদ্গম দুই প্রকার—(১) প্রীতির ছবির সাময়িক উদ্ভব, (২) প্রীতির উদয়াবস্থা। যেখানে প্রীতি-তাৎপর্যও আছে, অন্য তাৎপর্যও আছে ; সেই অবস্থাকে 'আভাস' বলা যায়। যেখানে প্রীতি-তাৎপর্যও নাই, অন্য তাৎপর্যও নাই, তাহাকে প্রীতির ছবির সাময়িক উদ্ভব বলা যায়। এই ছবি যদি বিম্ব হয়, তাহা হইলে ভাল, আর যদি প্রতিবিম্ব (বিকৃত প্রতিফলন) হয়, তাহা হইলে বিদ্বেষ বা অপরাধ হইবার আশঙ্কাই বেশী। যেখানে প্রীতিই মুখ্য তাৎপর্য, অন্যাসক্তি গৌণভাবে হঠাৎ আসিয়া যায়, সেখানে প্রীতির উদয়াবস্থা। প্রীতির ঈষদ্ উদ্গমে প্রিয়জনের রুচির অনুকূল অনুষ্ঠান আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যআসক্তি-তাৎপর্য-রাহিত্য নাই। এই অন্যাসক্তিকেই 'আভাস' বলে। অন্যাসক্তি দুই প্রকার—(১) নষ্টপ্রায় ; এই অবস্থায় অন্যাসক্তির লেশ বা ক্লেশ থাকিতে পারে, তবে তাহাও বিনষ্টপ্রায় অবস্থা। (২) অন্যাসক্তির আভাস বা ছল ; প্রথমটির তুলনায় ইহা শ্রেষ্ঠতর। ইহাতে অন্যাসক্তির অভিনয়মাত্র আছে, বস্তুতঃ নাই অর্থাৎ পরতত্ত্ব ব্যতীত অন্যবিষয়ে আসক্তির মত দেখা যায় বটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে অন্যাশক্তি ঐ অবস্থায় থাকে না। প্রথমটি প্রীতির প্রথম উদয়াবস্থা, আর দ্বিতীয়টি—প্রকটোদয়াবস্থা। ইহাতে প্রিয়জনের সুখে উল্লাস অনুভব আছে, অন্যাসক্তি আছে বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ নাই, তবে মমতাও নাই। সবিশেষ পরতত্ত্ববস্তু শ্রীভগবানের প্রতি মমতাবোধই—প্রেম। প্রেম ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত

প্রিয়ত্ব অনুভবের দ্বারা বিশ্বাস উদয় করায়। তাহার পর বিষয় ও আশ্রয় উভয়কে বিগলিত করে, তারপর মমতাতিশয্যের দ্বারা, কৌটিল্য প্রকাশ দ্বারা মান উদয় করে, আসক্তি বর্দ্ধন করে, নবনবায়মানভাবে প্রতিভাত করায়, তারপর উন্মত্ত করায়।

অনুভাব বা উদ্ভাস্বর, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারী ভাব দ্বারা এগুলি বাহিরে প্রকাশিত হয়। 'অনুভাব' বুদ্ধিপূর্বক ইন্দ্রিয়দ্বারে বহিশ্চেষ্টাত্মক; আর 'সাত্ত্বিকভাব' শুদ্ধচিত্তে অবুদ্ধিপূর্বক ও দুর্বার।

শ্রীকৃষ্ণ-সম্পর্কে অভিভূত চিত্তকে 'সত্ত্ব' বলে। তাহাকে আশ্রয় করিয়াই এই সকল ভাবের উদয় হয়। 'সঞ্চারী'—বায়ু-ক্ষোভিত সমুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরীবৎ অসংখ্যভাব।

প্রীতির ঈষদ্ উদগমে প্রীতিই মুখ্য, অন্য তাৎপর্য গৌণ। ইহা প্রীতিকে আবরণ বা ভগবৎ সুখানুসন্ধান-তাৎপর্যকে বিপর্যস্ত করে না। যেখানে প্রীতির মধ্যে অন্য উদ্দেশ্যও দেখা যায়, সেখানে উহা হয় 'আভাস' অবস্থা, অথবা ছল মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তের ও ভক্তের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম অসমোর্দ্ধ। অন্যান্য ভগবদ্ আবির্ভাবের ভক্ত-অপেক্ষা কৃষ্ণভক্তের উপাস্য-নিষ্ঠা বা প্রেম বেশী। অন্যান্য ভগবদাবির্ভাব অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য বেশী। ঐকান্তিকী ভক্তি, কেবলা ভক্তি বা রাগভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত আদিতে, অন্তে ও মধ্যে এই পরতত্ত্বনিষ্ঠাময়ী উপাসনার কথা বলিয়াছেন, তার মধ্যে আবার কেবলাভক্তিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ

বলিয়াছেন। ভক্তসঙ্গজনিতা, অপ্রতিহতা, অহৈতুকী, নৈষ্ঠিকী বা আবেশময়ী ভক্তিই উপাসনা বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠা। এই কথা গীতাতেও নাই। ঐকান্তিকী, কেবলা বা শুদ্ধা ভক্তি আবেশময়ী হইলেই তাহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়। রাগভক্তিকে যতটা ঐকান্তিকী বলিয়াছেন, বিধিকে ততটা বলেন নাই। রাগভক্তির বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা উপাস্যের মাহাত্ম্যজ্ঞানের অপেক্ষা করে না। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথিত 'সম্বন্ধ জ্ঞান' বলিতে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ মতে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাকে বুঝায়। রাগভক্তিতে রুচি, সুখানুসন্ধান বা আবেশের এত প্রভাব যে, শ্রীভগবান্ যে পরমেশ্বর, গুণাতীত, দেশকালাতীত,—এই তত্ত্বটি জানিয়াই হউক বা না জানিয়াই হউক, সর্বদা ভগবানের সুখানুসন্ধানের দ্বারাই শুধু উপাসনা হইয়া থাকে। **মুক্ত পার্ষদ অথবা সাধনসিদ্ধ প্রিয়জন ইষ্টদেবকে যেভাবে সুখী দেখেন, সেই সেবা-পরিপাটির কথা শুনিয়া, কোনও বিরল সাধকের সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী দেখিবার জন্য যে উৎকট পিপাসা হয়, সেইটিই 'রাগানুগা ভক্তি'।**

এই লোভ, তৃষ্ণা বা আবেশই বা মমতাযুক্ত স্মরণই রাগের মূল। "সর্ববেদান্তসারং" শ্লোকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা শ্রীভগবান্ই অদ্বিতীয় বস্তু, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমেয় সম্বন্ধী বস্তু (সম্বন্ধ নহে)।

'তন্নিষ্ঠং'—নিয়ত বর্তমানা যে ভগবন্নিষ্ঠা, তাহা যে পরতত্ত্বে বর্তমান, সেই পরতত্ত্ব বস্তুই 'তন্নিষ্ঠং' এবং ঐ ভগবন্নিষ্ঠা বা ভগবদনুবৃত্তি যে শাস্ত্রের অভিধেয় অর্থাৎ যে শাস্ত্রে অভিহিত

হইয়াছে, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত। অপ্রতিহতা বা অব্যবহিতা নিষ্ঠা বা ঐকান্তিকতা,—যাহা প্রীতিকে টানিয়া আনিয়া উদয় করায়, সেই নিষ্ঠা বা রুচি বা আবেশ বা তন্ময়তা—বড়ই দুর্লভা বা বিরলা। 'একয়া ভক্ত্যা'—অর্থাৎ নৈরন্তর্যময়ী, অব্যভিচারিণী ভক্তি, নিরন্তর প্রবহমানা ভক্তির দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে। 'গুরুদেবতাত্মা' হইয়া অর্থাৎ গুরুদেবকে আত্মতুল্য প্রিয় ও ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া, অথবা গুরুকে ও দেবতাকে (ইষ্টদেবকে) আত্মতুল্য প্রিয় জ্ঞান করিয়া ভক্তির অনুশীলন করিতে হইবে। 'গুরু' শব্দে গুরু-পরম্পরা বুঝায়। যে পথের কথা শ্রীকৃষ্ণ নিজে ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন, অথবা শ্রীবার্ষভানবী স্বয়ং—শ্রীগোবিন্দ যাঁহার একান্ত বশীভূত, সেই দেবী যে শ্রৌত-প্রণালী দেখাইয়াছেন, তাঁহারই বংশে—বাণী-বীর্যে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।

লয়যুক্ত বা বিক্ষিপ্ত চিত্তে আবেশ বা অভিনিবেশ হয় না। মনটা নিরুদ্ধ হইলেই অভিনিবেশ হয়। ভগবানে মন নিরন্তর আবিষ্ট হইলে নৈষ্ঠিকী ধ্রুবানুস্মৃতি বা ঐকান্তিকী আবেশময়ী রুচিপ্রাধানা রাগানুগা ভক্তি হইবে। তখন ইষ্টদেবের সুখবিধান করিবার জন্য শুদ্ধজীবের যে উৎকট তৃষ্ণা, আত্মার অনুগত দেহ ও মন সেই তৃষ্ণার অনুকূলভাবে সাহায্য করে, হাতের মুঠায় আসে। ইষ্টদেবের সুখবিধানের জন্য আত্মার নিরন্তর গতি বা সুখানুসন্ধানময় নিরন্তর আবেশকেই "নৈষ্ঠিকী বা ঐকান্তিকী ভক্তি" বলে। এই নৈষ্ঠিকী ভক্তিই শ্রদ্ধামূলা বা শাস্ত্রশাসনানুগ হইলে 'বৈধী' ও রুচিমূলা বা স্মরণাবেশময়ী

হইলে ‘রাগানুগা’ হয়। মন যতই ‘সাফ্’ (যোগীর মনের মত নহে) হইবে, ততই শুদ্ধসত্ত্ব প্রকাশিত হইবে, ততই রুচির, রাগের বা আবেশের উদয় হইতে থাকিবে। শুদ্ধসত্ত্বে লয় ও বিক্ষেপ বা কোন প্রকার তৃষ্ণাও থাকে না। ভোক্তৃ-দ্রষ্টৃ-জ্ঞাতৃ-পুরুষাভিমান যত প্রবল থাকে, ততই অপরের ছিদ্রানুসন্ধান-মূলে সমালোচনা বৃত্তি আসে। এটি দ্বৈত-অভিমান। এই দ্বৈত-অভিমানে একের অপরের উপর প্রভুত্ব-চেষ্টা আছে। নৈষ্ঠিকী ভক্তিতে দ্বৈত-অভিমান থাকে না, ইষ্টদেবের সম্বন্ধে গুরু বুদ্ধিতে সমস্ত পদার্থের দর্শন হয়। “তৃণাদপি সুনীচ” শ্লোকে রাগানুগা ভক্তির কথা বলা হইয়াছে।

ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলী-কল-কূজিত শ্রীহরির কথা কে কীর্তন করিবে? আবেশের সঙ্গে না করিলে হইবে না। “অবশে, অনিচ্ছায় উচ্চারণ করিলেও যে নাম সমস্ত পাপ ক্ষয় করে, সেই নাম আবেশের সঙ্গে উচ্চারিত হইলে না জানি কি অতুলত্তম ফল দান করে?” অবশে—অনিচ্ছায়। আবেশের সঙ্গে নাম উচ্চারণ করিলে নৈষ্ঠিকী ভক্তি হইবেই অর্থাৎ ধ্রুবানুস্মৃতি তাহার মধ্যেই আছে।

‘বিশ্’ ও ‘রুধ্’—এই দুইটি ধাতু শ্রীমদ্ভাগবতের বড় প্রিয়। ‘বিশ্’ ধাতু দ্বারা আবেশ অর্থাৎ অভিধেয় ভক্তি (সাধন) ও ‘রুধ্’ ধাতু দ্বারা অবরোধ অর্থাৎ সাধ্যপ্রেমভক্তির (প্রয়োজন) ইঙ্গিত দিয়াছেন। ‘তৃণাদপি’ শ্লোকে এই আবেশময়ী নৈষ্ঠিকী ভক্তির কথা আছে। তৃণ—সর্বাপেক্ষা লঘু, সকলেই তাহার পূজ্য। সকলে সেই আচ্ছাদিতচেতনের উপর পদচালনা কারবার,

প্রভুত্ব করিবার যোগ্যতা রাখে। তাহা হইলে সর্বত্র প্রভুদর্শনই তৃণাদপি সুনীচভাব। এই দর্শন কখন হয়? ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম সর্বত্র যেস্থলে ইষ্টদেবের সম্বন্ধযুক্ত দর্শন, সেই সেই স্থলে ইষ্টদেবেরই আকার দর্শন; জড়ের আকারদর্শন বা প্রকৃতিদর্শন সেস্থলে নাই। 'তৃণাদপি সুনীচ' কথাটি শ্রীমদ্ভাগবত হইতে আসিয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন, আর শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবত—ব্রজেন্দ্রনন্দন হইতে অভিন্ন। সুতরাং প্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবত ও প্রতিপাদ্য শ্রীগৌর-কৃষ্ণ, পরস্পর অভিন্ন। সদা অর্থাৎ আবেশযুক্ত নৈরন্তর্যই সুনীচেন, সহিষ্ণুনা, অমানিনা ও মানদেন—এই পদচতুষ্টয় অভেদে বা বিশেষণে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা উপলক্ষণ নহে। তৃণাদপি সুনীচভাব অর্থাৎ সর্বত্র ভগবদ্‌বৈভবস্ফূর্তি রাগানুগা ভক্তিতেই বেশী উদিত হয়—যেস্থলে ভোগাভিলাষ বা ত্যাগাভিলাষরূপ পুরুষাভিমান নাই,—সুতরাং যোষিদ্দর্শনও নাই। সশ্রদ্ধ অর্থাৎ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট সাধকও সর্বত্র ভগবদ্‌বৈভব দর্শনের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

মানদ—ইষ্টদেবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত দর্শন করিয়া যথাধিকারে সকলকে মান দেওয়া বা প্রণাম করা। রাগানুগাভক্তিতে দৈন্যই সর্বপ্রধান। 'অমানিত্ব' ও 'তৃণাদপি সুনীচতা' পদের অর্থ লজ্জা ও দৈন্য। অমানিত্ব—লজ্জাত্মক ও তৃণাদপি সুনীচতা, দৈন্যাত্মক। যেস্থলে আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনায় নিন্দা ও ঘৃণা আসে, সে-স্থলেই অমানিত্ব। আত্মপ্রতিষ্ঠাকামনারূপ অকর্মে ঘৃণাই লজ্জা।

'জুগুপ্সাত্ত্বীরকর্মস্থ'—ইহাই অমানিত্ব আর তৃণাদপি স্থনীচতাই দৈন্য। আবেশের সঙ্গে শ্রীহরি-কীর্তন করাই মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তিতে অভিধেয়ের বা পরতত্ত্ব দর্শনার্থীর কর্তব্যের পরাকাষ্ঠা। শ্রীহরিকে আবেশের সঙ্গে ডাকিলে সেই সর্বানর্থহর সর্বচিত্তহর 'ডাকাত' আর অন্যত্র যাইতে পারেন না, কেবল ডাকাতিই করিতে থাকেন, ভক্তের হৃদয়-বৃন্দাবনে অবরুদ্ধ হইয়া যান।

"তত্র অহিংসোপরমঃ (উপশমঃ) স্বধর্মঃ"—তখন কাটিয়া ফেলিলেও বৃক্ষের মতই তিনি আর প্রতিবাদ বা প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না। প্রিয়তমের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হইয়াছে যে, সে প্রিয়তমের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অপর ব্যক্তির দ্বারা হিংসিত হইলেও নিজের ব্যথায় কাতর হয় না, বরং মনে করে—আমাকে আঘাত দিতে যাইয়া উহার কষ্ট হয় নাই তো ? ইহাকেই বলে—উপরম বা উপশম বা বিরাগ। এখানে আর দ্বৈত দর্শন নাই, বাধা বা সংঘর্ষও নাই। এটি ব্রহ্মলয়ের মত অভেদ অবস্থা নয়, ইষ্টদেবের স্থখবাঞ্ছার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগযুক্ত অবস্থা। ইষ্টদেবের স্থখের সঙ্গে নিজের স্থখ এখানে মিশিয়া যাইয়াও ঐকাত্ম্য নাই—তাদাত্ম্য নিত্য বর্তমান।

এখন নিষ্ঠা হয় কিরূপে ? সাবহিত, লয়-বিক্ষেপ-শূন্য, একাগ্রচিত্ত হওয়ার নামই অর্থাৎ ধ্রুবানুস্মৃতির বা চিত্তবৃত্তি পরতত্ত্ব শ্রীভগবানে নিরন্তর ধ্যানের দ্বারা যোগযুক্ত হওয়ার নামই নৈষ্ঠিকী ভক্তি। লয়-বিক্ষেপ-শূন্যতার বা রজস্তমোমিশ্রসত্ত্ব (অর্থাৎ ত্রিগুণান্তর্গত সত্ত্বগুণাত্মক বৈরাগ্য, শম, দম, তিতিক্ষাদি)

রাহিত্যের নামই শুদ্ধসত্ত্ব। সমস্ত ভালগুণ যে গুণটির দ্বারা সাধকভক্তের অন্তরে বাঁচিয়া থাকে, সেটির নামই 'নিষ্ঠা'। দ্বৈতবুদ্ধি, পুরুষাভিমান যাইবে কিসে? চিত্ত যোগযুক্ত কিসে হইবে? উত্তর—ভক্তিদ্বারাই হইবে। মন নিরুদ্ধ হইয়া নিরন্তর ধ্যান দ্বারা যোগযুক্ত হইলেই সকল সুবিধা হইয়া যাইবে। অকিঞ্চনা ভক্তি কিরূপে পাওয়া যায়? বিষয়ের (ইষ্টদেবের) সুখানুসন্ধানময় আবেশ যাঁহার আছে, সেই সাধুর সঙ্গ যদি হয়, তিনি যদি কৃপাশক্তি সঞ্চার করেন, তবেই হইবে। তবে এরূপ সৌভাগ্য অতি বিরল।

ভক্তির মাহাত্ম্য শ্রীমদ্ভাগবতের আদিতে, অন্তে ও মধ্যে, প্রত্যেক গুরু-শিষ্য সংবাদে, সর্বাবস্থায়, সর্বদেশে, সর্বকালে, সর্বপাত্রে, উপক্রম-উপসংহারাদি ছয়প্রকার শাস্ত্রতাৎপর্যনির্ণয়লিঙ্গ দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন।

ভক্তির সাহায্যে কর্ম-জ্ঞান ফল দিতে পারে; কিন্তু ভক্তি কাহারও মুখাপেক্ষা করেন না। ভক্তি নিরপেক্ষা অর্থাৎ মুখ্য বা স্বাধীন; আর অন্যান্য সাধন তৎসাপেক্ষ অর্থাৎ গৌণ। ব্রহ্মসাম্মুখ্য বা পরমাত্মসাম্মুখ্যরূপ উপাসনা হইতে ভক্তিরূপ উপাসনাই সর্বশ্রেষ্ঠ। ভগবানের নিজ জন সৎ-এর বা মহতের কৃপাসঙ্গফলে এই দুর্বোধ্য, দুর্লভ অথচ সুলভ উপাসনা লাভ হয়। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয়ের পর গুরুপাদাশ্রয় ও শিক্ষালাভ পর্যন্ত ("আদৌ গুরুপাদাশ্রয়···শিক্ষণম্")—ভক্তির পূর্বাঙ্গ, আর বিশ্রম্ভেণ গুরুসেবা ও শ্রেষ্ঠ পঞ্চাঙ্গ ভজন পর্যন্ত পরাঙ্গ। গুরুপাদাশ্রয় লাভ কিরূপে হয়? পরমার্থ লাভের পথে অত্যন্ত

অজ্ঞানাবস্থা হইতে সর্বোত্তম অবস্থার unit হইতেছে—হরিকথায় শ্রদ্ধা বা রুচি।

কিরূপে হরিকথায় শ্রদ্ধা বা রুচি লাভ হয়? বর্ণাশ্রমে বা উহার বহির্ভূত সমাজে থাকিয়া যদি হরিকথায় কথঞ্চিৎ রুচি বা শ্রদ্ধা হয়, তাহা হইলে সেইটাই ভাগ্য। বর্ণাশ্রমে নিষ্ঠা বা তাহার ব্যভিচার, কোনটাই ভাগ্য নয়। কোনক্রমে যদি ভগবানের বা ভাগবতের সম্পর্কযুক্ত লীলাস্থানে গিয়া (যেস্থানে সাধু ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানস্মৃতিতে যোগযুক্ত হইয়া বিচরণ করেন) সাধুর কীর্তিত হরিকথায় মনোযোগ না থাকিলেও সাময়িক.কথঞ্চিৎ রুচি বা শ্রদ্ধা হয়, তাহা হইলে তাহাই 'ভাগ্য'। তবেই যাওয়ার কষ্ট স্বীকার, পয়সা খরচ করা—সবই সার্থক হয়। বিষ্ণু বা বিষ্ণুভক্ত-সম্পর্কযুক্তস্থানে বা পুণ্যনদীতীরে সাধুগণ থাকেন। কোন কার্য ব্যপদেশে যদি কোন বিষয়ী সেখানে উপস্থিত হইয়া, সেই সাধুর দর্শন, পাদস্পর্শ, সম্ভাষণ বা কোন দ্রব্য উপঢৌকন দান করে, তাহা হইলে তাহার সত্ত্বগুন প্রবল হইয়া, হরিকথায় রুচিরূপ ভক্তির প্রাগবস্থা বা উদয়ারম্ভ হয়। বর্ণাশ্রমযাজীর পক্ষে এইটিই পরমধর্ম। কেননা, তাহা দ্বারা অধোক্ষজে ভক্তি হয়, সেইটিই পরমধর্ম। ইহা দ্বারা অহৈতুকী অর্থাৎ ফলান্তরকামনারহিতা ও অপ্রতিহতা অর্থাৎ অন্যবস্তু (সাধন বা উদশ্যে) দ্বারা বাধা পাইবার অযোগ্যা, অন্যনিরপেক্ষা ভক্তির লাভ ঘটে। সেই ভক্তির দ্বারা আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম, পরমাত্ম্য-সাক্ষাৎকার নহে, পরন্তু পরমপ্রেষ্ঠ ভগবান্ বা প্রিয় ইষ্টদেব সুপ্রসন্ন অর্থাৎ বশীভূত হন। শ্রীমদ্ভাগবত জ্ঞানমার্গের

শাস্ত্র হইলে 'যয়া ব্রহ্ম প্রসীদতি'—এই কথা বলিতেন ; কিন্তু ব্রহ্মের প্রসন্নতা বা অপ্রসন্নতা নাই। তিনি নির্ধর্মক, অদ্বৈত, তিনি প্রসন্ন বলিয়া কল্পিত হইলে দ্বৈত আসিয়া যায়। "আত্মা"—শব্দে ভগবান্ ব্যঞ্জিত হইলেও আর একটু বেশী অর্থাৎ 'প্রিয়ত্ব-ধর্ম' ব্যঞ্জনা করিবার জন্যই ঐ শ্লোকে 'আত্মা'—কথাটি বলিয়াছেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করিলে তিনি প্রসন্ন হন, মোক্ষ বা মুক্তি পাওয়া যায়, কিন্তু তিনি 'সুপ্রসন্ন' হন না অর্থাৎ তাঁহার সাক্ষাৎকার হয় না, তাঁহার দেখা মিলে না, তাঁহাকে সুখী দেখা যায় না। সুপ্রসন্ন হইলেই বিমুক্তি—বিশেষ মুক্তি—ভগবদানন্দ—পরমানন্দবৈচিত্রী লাভ ঘটে। "স বৈ পুংসাং পরোধর্মো"—ইত্যাদি শ্লোকে অধোক্ষজ-শব্দে শ্রীযশোদানন্দনই উদ্দিষ্ট হইয়াছেন, কেবলমাত্র পুরুষাবতার নারায়ণ নহেন। সেই অধোক্ষজই ভারবাহিত্বরূপ শকটভঞ্জনকারী, সারগ্রাহীর পরাকাষ্ঠা সিদ্ধমহাত্মা বা পরমহংসগণের বা সাধকভক্তগণের অনুরাগ-মার্গে উপাস্য। হরিকথায় রুচি থাকিলেই ক্রমশঃ তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা লাভ হইবে। এটি না থাকিলে শুদ্ধ বা কেবলভক্তিমার্গে অধিকার হইবে না। 'অহৈতুকী'—অর্থাৎ যে ভক্তিতে শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ের সুখানুসন্ধানব্যতীত অন্য কামনা নাই। 'অপ্রতিহতা'—অর্থাৎ যে ভক্তিতে তাহা অপেক্ষা বড় বা প্রবল—যাহা তাহাকে বাধা দিতে পারে,—এমন কিছুই নাই।

ভক্তি না করিলে যে দুঃখ, তদপেক্ষা অধিক দুঃখ যদি আর কিছুতে পাওয়া যায়, তবে তাহার নিকট ভক্তি না করার দুঃখটা ছোট হইয়া যায় ; কিন্তু ভক্তি না করার মত দুঃখ নাই।

সেইরূপ—ভক্তি করার মত সুখও নাই। "আত্মা"—শব্দে প্রিয়তম, শ্রেষ্ঠ।

ভগবানেই পরমানন্দের পরাকাষ্ঠা, সেটি শুদ্ধাভক্তিতে লাভ করা যায়। শ্রীজীর কৃষ্ণেই প্রিয়ত্বধর্মের পরাকাষ্ঠা; সেই শ্রীকৃষ্ণকে ঐকান্তিকী রাগানুগাভক্তিতেই সুখী দেখা যায়। তাঁহার সুখের অনুকূলে তাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা হয়। তাঁহার সুখানুভবে উল্লাস বোধ হয়, ক্রমশঃ মমতা প্রভৃতির উদয় হইতে থাকে।

মনটি নিরুদ্ধ না হইলে অব্যভিচারিণী ভক্তি হইবে না। ইষ্টদেবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সেবক আমি—এই অভিমান ব্যতীত যে কোনও রকমের পুরুষাভিমান থাকিলে রাগানুগা ভক্তি হইবে না। "সংসারে আসিয়া, প্রকৃতি ভজিয়া, পুরুষাভিমানে মরি"—আর "সংসারে আসিয়া, লীলা-পুরুষোত্তমে ভজিয়া, তাঁহার প্রকৃতি-অভিমানে বাঁচি।" প্রভু ও দাস অভিমান খাপে খাপে মিলিয়া যায়। সুখানুসন্ধানে দ্বৈত-রাহিত্য হয়। বদ্ধাবস্থাই দ্বৈতাবস্থা। ইষ্টদেবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেখানে নাই, কেবলদর্শন যেস্থলে, শুদ্ধ অভিমান যেস্থলে, নৈরন্তর্যময় আবেশ যেস্থলে, সেস্থলেই রাগানুগাভক্তি। সেস্থলে চিত্ত সর্বদা নিরুদ্ধ অর্থাৎ ইষ্টদেবের সঙ্গে যোগযুক্ত থাকে। এই সাধনভক্তি শীঘ্রই দ্রুতগতিতে সাধ্যভক্তিতে পর্যবসিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবই এই যে, তিনি কেবলই আপন হইতে চান। পুরুষাবতার নারায়ণ ততটা নিজজন হইতে চান না বা পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ-তত্ত্বকে আত্মসাৎ করিয়া, গোপন করিয়া বা

শিথিল করিয়া, উপাসকের সঙ্গে মাখামাখি করিতে চান, কেননা তিনি প্রীতিরই বাধ্য।

"সতাং প্রসঙ্গাৎ"—এখানে এই সৎসঙ্গটি ভজনের পূর্বাঙ্গ। কর্ণরসায়ন—রুচি; হৃদ্‌রসায়ন—বিশ্বাসরূপা শ্রদ্ধা। হরিকথায় শ্রোতার বা বক্তার আদর, শ্রদ্ধা বা রুচি বাড়ায় বলিয়াই হরিকথাটি রসায়ন; ইহা টনিক (Tonic) জাতীয়। "প্রসঙ্গাৎ"—অর্থাৎ সাধুর হাওয়া গায় লাগা। ইহা অপেক্ষা কর্মী বর্ণাশ্রমীর পক্ষে শ্রেষ্ঠতর পরমধর্ম আর নাই। হ্লাদিনীর কার্য, অর্থাৎ অবিদ্যা-দুঃখ দূর করিয়া সুখ দিবার কার্যটি প্রাথমিক অবস্থায় ভক্তির পূর্বাঙ্গ সৎসঙ্গজনিত হরিকথায় রুচি হইতেই আরম্ভ হইল। রুচি কিসে? বাসুদেব ভগবানের কথায় অর্থাৎ নাম-গুণাদির বর্ণন-শ্রবণে রুচি। বিমুখতা দূর করিয়া উপাসনা বা সাম্মুখ্যলাভের ইহাই হইল আরম্ভ। পথ দুই প্রকার—বিচারপ্রধান ও রুচিপ্রধান। বিচারপ্রধানের ধারণা—আমরা বিচারশীল হইব, অন্ধবিশ্বাসী হইব না। তাহারা স্বাভাবিকী রুচিকে 'অন্ধবিশ্বাস' বলে। ইহাদেরই অতন্নিরসন (Inductive method) পন্থা। এই পথের শেষগতি ব্রহ্মসাযুজ্য। ইহাকেই আরোহ-পথ বলা যায়। অবরোহ-পথটি ভগবান্‌কে সুখী দেখিতে চায়। প্রথম পথটি—ভীষণ বিপদ্‌সঙ্কুল; প্রতিপদে বিপদের আশঙ্কা আছে। রুচিপ্রধান পথে কিন্তু কখনও প্রমাদ বা অনবধান হয় না, কখনও পদ-স্খলন বা পতনও হয় না, পরিণামে—শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

——

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

১লা চৈত্র,
মঙ্গলবার, ১৩৫০ সন।

"বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ।।"

'তৃণাদপি' শ্লোকের ব্যাখ্যায় রাগানুগা ভক্তির প্রধান উপকরণ অর্থাৎ আবেশধর্মের কথাই বলা হইয়াছে। 'তৃণাদপি সুনীচ' পদে দৈন্য, 'তরোরপি সহিষ্ণু' পদে নিরপেক্ষতা এবং অহিংসা ও পরোপকারবৃত্তি, 'অমানী' পদে লজ্জা, অর্থাৎ স্বপ্রতিষ্ঠাভিলাষ ত্যাগ ও 'মানদ' পদে নিজ ইষ্টদেবের স্বরূপ-বৈভব-দর্শনে সমস্ত চেতনাচেতন পদার্থের প্রতি নমস্কার বিধান বুঝিতে হইবে। রাগভক্তির প্রচারই শ্রীগৌরসুন্দরের বৈশিষ্ট্য। প্রাণকোটিপ্রিয় অভীষ্টদেবের প্রতি অনুক্ষণ নিরন্তর আবেশের সহিত কীর্তনই রাগের স্বরূপ লক্ষণ এবং এই চারটি তাহার তটস্থ লক্ষণ। এই চারিটি কপট (দম্ভ) শূন্যতা বা আবেশ হেতু পাপ হরণকারী অথবা "ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলী-কল-কূজিত" শ্রীহরি, গুরুরূপী-রাগাত্মিক ভক্তদ্বারা সমস্ত জীবকুলকে আত্মসাৎ করাইয়া, তাহাদের সর্বস্ব হরণ করেন। তখন সংকীর্তনাগ্নি সপ্তজিহ্বা বিস্তার করিয়া প্রকটিত হইয়া, অনুরাগভক্তকে পুর্নপ্রেমরস আস্বাদন করান। শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু তিনটি (মতান্তরে

চারিটি) প্রস্থানের ভাষ্য করেন নাই ; কেননা ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত বর্তমান থাকায় তিনি উপাসকগণের সর্বশ্রেষ্ঠতম গৌড়ীয়দিগকে বা নিজেকে সাম্প্রদায়িক আচার্য বিবেচনা বা কোন সম্প্রদায়-বিশেষের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। যদিও এই প্রস্থান-চতুষ্টয়ের ভাষ্যরচনা সাম্প্রদায়িক আচার্যগণের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। (১) দ্বাদশটি উপনিষদ্‌কে শ্রুতিপ্রস্থান বলে। (২) স্মৃতি-প্রস্থান—শ্রীভগবদ্গীতা। (৩) ন্যায় প্রস্থান—শ্রীব্রহ্মসূত্র। (৪) প্রকরণ প্রস্থান—শ্রীবিষ্ণুসহস্র নাম।

যিনি সাধনে যত উন্নত, তিনি ভজনের কথা ততই গোপন করেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ইহাকে সাধকের প্রধান গুণ বলিয়াছেন। সমস্ত ভাগবতধর্মের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শুদ্ধভক্তিতত্ত্বের মহাদুর্বোধত্ব ও মহাদুর্লভত্বকে সুবোধ ও সুলভ করিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা মূলে, অত্যন্ত গম্ভীর বিষয়টি হাটে, বাটে, মাঠে, ঘাটে) (যেখানে লোকসমাগম হয়) প্রকাশ করিলে 'সরাগবক্তা' হইয়া ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধ করা হয়।

সহস্র সম্প্রদায়াধিদৈবত শ্রীগৌরসুন্দর যাঁহাদের আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাঁহারাই গৌড়ীয়। 'জয়তাং সুরতৌ' শ্লোকে সুরত শব্দে মিথ আসক্ত অথবা সুরত শব্দে দয়ালু (আত্মসাৎ যাঁহারা করেন), সেই শ্রীরাধামদনমোহন-গোপীনাথের উপাসক গৌড়ীয় কোন অংশ-শক্তি প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহেন। বিষ্ণু ব্যতীত অন্যবস্তুতে 'ভক্তি' শব্দের প্রয়োগ হয় না, শ্রদ্ধা বা আদর শব্দ প্রযোজ্য হইতে পারে। ভক্তি শব্দে এখানে মমতা বোধ বা আনুকূল্যই বুঝাইবে। বিষ্ণুর দাসের প্রতি আদর, শ্রদ্ধা

প্রভৃতি দেখান যাইতে পারে—বিষ্ণুর প্রতি অনন্যভক্তির অনুসরণে; কিন্তু শাশ্বত সুখ পাইতে ইচ্ছা থাকিলে বিষ্ণুকেই সুখী দেখিতে চাওয়া উচিত। তাহা হইলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ভোগ্যজ্ঞানে কিছু ভোগ বা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইবে না। ইহার নামই যুক্তবৈরাগ্য। এখন ভক্তির মাহাত্ম্যের কথা বলা হইতেছে।

প্রথমে অন্বয়-ব্যতিরেক ভাবে ভক্তির মাহাত্ম্য দেখান হইতেছে। ভক্তি থাকিলে অন্যান্য সাধনাদি নিজ নিজ ফল দিতে পারে, ভক্তি না থাকিলে কিছুই ফল দিতে পারে না। ভক্তির স্বভাব এই যে, নীচ জাতিকেও ব্রাহ্মণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বভাবযুক্ত করিয়া দিতে পারে, কিন্তু অন্যান্য সাধন তাহা পারে না। যাহাতে পাপ প্রবল হইয়া জগৎকে বাসের অনুপযোগী করিয়া না তুলে, সেজন্য বেদ বর্ণাশ্রম নিয়ম করিয়াছেন, পাপ নিষেধ করিয়া পুণ্যকর্মের আদেশ দিয়াছেন; কিন্তু নৈষ্কর্ম্যই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিধি-লঙ্ঘনে পাপপ্রবণ জীবের স্বাভাবিকী চেষ্টা। তাহাদের বিধির মধ্যে আনিবার জন্য, পশুবৃত্তি দমনের জন্য, নানা লোভ দেখাইয়াছেন। বেদের সর্বপ্রধান স্থাপ্যবিষয় নৈষ্কর্ম্য বা সন্ন্যাস বা কর্মত্যাগও সগুণ; ছোট কথা।

বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে কৃত চতুর্বর্গ-কামনাহীন কর্মই নির্গুণ। যে ভক্তি না করে, সে নিন্দার্হ, সমস্ত দোষের আকর, আর ভক্তই সর্বগুণে গুণী। এমনকি জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও যদি ভক্তি না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে সংসারে আসিতে হইবে। জ্ঞান-কর্ম মার্গে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও ভক্তি না করিলে পতিত হইবে। আর

ভক্তি করিলে তাহারা যে যতটুকু পাইয়াছে, তাহা থাকিবে। উপক্রম-উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ (স্তুতি কীর্তন) ও উপপত্তি দ্বারা (শাস্ত্র-যুক্তিদ্বারা) সিদ্ধান্ত—এই ছয় প্রকার তাৎপর্যনির্ণায়কলিঙ্গ দ্বারা সর্বত্রই ভক্তির অসমোর্দ্ধ মহিমা বলিয়াছেন। সময়ের দিক্ হইতে সত্যযুগ হইতে, সৃষ্টির পূর্বে, মধ্যে ও অন্তেও ভক্তি হয়। সৃষ্টির পূর্বে ভগবান্ ব্রহ্মাকে 'চতুঃশ্লোকী-ভাগবত' বলিয়া তাঁহাকে যোগ্যতা দিলেন।

ব্রহ্মা মহাপুরুষের সেবক। তিনি তিনবার বিচার করিয়া ভক্তিকেই শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন। ভক্তি কাঁহার প্রতি? প্রিয়ত্বধর্মরূপ বিশেষ লক্ষণ দ্বারা অন্বিত পরমপ্রিয়তম শ্রীহরির সুখেই নিজসুখ বা উল্লাস-অনুভবরূপা রতিই সর্ববিধ সাধকের প্রয়োজন। মনীষা অর্থাৎ সমাধিদ্বারা ব্রহ্মা এই সত্য অনুভব করিলেন।

ভক্তি সর্বত্র হইতে পারে। সর্বত্র বলিতে কর্তা, দেশ, করণ, ক্রিয়া, কার্য, ফল ও দ্রব্য বুঝায়।

কর্তা—সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণীও হরিভজন না করিলে অস্পৃশ্য হন, আবার অন্ত্যজও হরিভজন করিলে ব্রাহ্মণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়। বর্ণাশ্রম ত্যাগ করিয়া, হরিভজনে প্রবৃত্ত হইয়া, ফললাভের পূর্বেই দেহত্যাগ করিলে কর্মত্যাগ জন্য নীচ বর্ণ হইলেও ক্ষতি নাই, ভক্তি-বাসনা তাহাতে নষ্ট হইবে না। শ্রীমদ্ভাগবত অনাদিবহির্মুখের নিকট বিপ্লবী হইলেও এই বিপ্লব অনন্ত মঙ্গলের সন্ধান দেয়। শ্রীমদ্ভাগবত বর্তমান আকারে মদ্রদেশে (যেখানে জাতিভেদবিচার অত্যন্ত প্রবল) আবির্ভূত হইলেও

বলিয়াছেন—"তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি" ইত্যাদি। "অতিতরন্তি চ দেবমায়াং" ও 'বিদন্তি' এই দুই শব্দদ্বারা বিরজা অতিক্রম ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কথাই বলিয়াছেন, প্রেমভক্তি লাভের কথা প্রথমেই বলেন নাই। **স্ত্রী-শূদ্রকেও অধিকার দিয়াছেন। নারায়ণকে লাভ করুক্ আর নাই করুক্, শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার তাহাদের বড় সুবিধা।** কর্তা বহুপ্রকার; উপকরণ দুই প্রকার—বাহ্য ও মানস।

যাঁহারা মহৎসঙ্গ লাভ করিয়া ভজন করিতে করিতে সিদ্ধি-লাভের পূর্বে দেহত্যাগ করেন, তাঁহারা পুনরায় জন্মগ্রহণকালে গর্ভে সপ্তমমাসে ভগবানের দেখা পান ও দৈন্যভরে স্তুতি করেন। তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়া, সাধুসঙ্গ পাইয়া পুনরায় ভজন করিতে থাকেন। যাঁহারা শরণাগত হইবেন না, তাঁহারা গর্ভবাসে ভগবানের দেখা পান না। ভক্তির মাহাত্ম্যকে যাহারা অতিস্তুতি মনে করে, তাহারা ভক্তিকে সম্প্রদায়গত কুসংস্কার বা গোঁড়ামি বলিয়া মনে করে। সেই পাষণ্ডিগণ মনে করে, সত্য ও অসত্য এই দুইটি সম্প্রদায় আছে; এই দুই-এর বিবাদ সে-ই মিটাইতে পারে,—যে এ দুইটির কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহাকে বলে—Democracy. ভগবৎসম্বন্ধী বস্তুর মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি জ্ঞান করাই অপরাধ। আবার অতিস্তুতি জ্ঞান না করিলেও অন্যান্য অপরাধ থাকিতে পারে,—যাহার জন্য ভজনে উন্নতি হয় না। পরতত্ত্ববস্তুর সহিত কিছু যোগ করিয়া, পরতত্ত্ববস্তুকে আংশিক, হেয়, জঘন্য, মায়িক-বিচিত্রতা মনে করিয়া, সত্য, পূর্ণতত্ত্ব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পক্ষ আছে, সুতরাং সত্য হইতে পৃথক্

থাকা যায়, এই কথা মনে করিয়া পূর্ণবস্তুকে খণ্ডিত করিবার চেষ্টার নামই 'মায়া'। পূর্ণের অতিরিক্ত যাহা কিছু, তাহাই 'মায়া'। সত্যবস্তুকে অসত্যের অন্তর্গত সাম্প্রদায়িক বলিয়া মনে করাই সত্যের বিপর্যয়; এটি প্রকাণ্ড পাষণ্ড।

আলো-অন্ধকারের নিরপেক্ষ তটস্থদর্শন—সন্ধ্যাদর্শন,—এটিও রাক্ষসদর্শন। যাহারা Democracyর দোহাই দিয়া ভগবান ও তৎসম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়াকে সাম্প্রদায়িক মনে করিয়া বিচার নিষ্পত্তি করিতে চাহে, তাহাদের দর্শন—রাক্ষস-দর্শন। যে ইন্দ্রিয়দ্বারা সত্যবস্তু দর্শন হয়, সেই ইন্দ্রিয় তাহাদের নাই। তাহাদের হয় অরুচি অথবা বিদ্বেষ আছে। তাহাদের বিচারকে স্বৈরীকুতর্ক বলা যাইবে, শাস্ত্রানুকূলা যুক্তি বলা যাইবে না। এই সমালোচকের বিচারকেই শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু 'জ্ঞান-লব-দুর্বিদগ্ধতা' অথবা 'কুপাণ্ডিত্য' বলিয়াছেন। ইহাদের সদসৎ বা নিত্যানিত্য বিচার-বিবেক পুড়িয়া গিয়াছে। অপরাধ নানাপ্রকারে হইতে পারে। এই অপরাধ কিরূপে যাইবে?

'—আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ।' সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত বারবার আবৃত্তি করিতে হইবে। সিদ্ধগণ সাধকলীলা প্রকাশ করিয়া বারংবার কীর্তন করেন, দেখা যায়; যথা—শ্রীঠাকুর হরিদাস। গুরুবর্গ সাধকলীলা পরিত্যাগ করেন নাই; তবে সিদ্ধগণ বিধিবাধ্য নহেন। তাঁহাদের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক।

——

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্

২রা চৈত্র, বুধবার
বাংলা ১৩৫০ সন।

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

কলিযুগে সমস্ত ভক্ত্যঙ্গই শ্রীনামপ্রভুর শ্রবণ-কীর্তনের অন্তর্গত; সুতরাং অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গের মাহাত্ম্যে অর্থবাদ অত্যন্ত অপরাধের ফল। অন্যান্য অনুষ্ঠান সুষ্ঠু থাকিলেও যে স্থলে ফল দেখা যায় না, অর্থাৎ যে স্থলে দেখা যায় যে, সাধক লোক ভাল, অথচ অনুষ্ঠানের ফল দেখা যাইতেছে না; সে স্থলে নিশ্চয়ই কোন অপরাধ—অর্থাৎ নামাপরাধ অথবা বৈষ্ণবাপরাধ আছে। সেবার অনুষ্ঠান করিতে করিতে, যাঁহার উদ্দেশ্যে সেবা, সেই নামপ্রভুর অনুশীলনে যদি শৈথিল্য হয়, তাহা হইলে কর্মকাণ্ড হইয়া যাইবে। আবার নামপ্রভুর কীর্তনের বা জপের দ্বারা গোবিন্দের অর্চন করিয়া যদি তদীয়কে (তৎসম্বন্ধী কোন বস্তুর) অনাদর করা হয়, তাহা হইলে তাহাও দাম্ভিকতা বা কাপট্য-নাট্য।

কৃষ্ণকে বাদ দিয়া গুরুকে দেখা হইলে চেতন দর্শন হয় না, মায়া-দর্শন হয়; আবার গুরুকে বাদ দিয়া কৃষ্ণকে দেখিতে যাওয়াও দাম্ভিকতা। সমস্ত অপরাধের মূল হইতেছে—অপ্রাকৃতবস্তুতে অবিশ্বাস বা অনাদর বা অশ্রদ্ধা। নৃগ মহারাজ

হরিনামের ও নবধাভক্তির মাহাত্ম্য জানিয়াও অম্বরীষের মত ভক্তিকে আশ্রয় না করিয়া, কর্মকাণ্ডকে (যথা—ব্রাহ্মণকে গোদান) আদর করিয়া আশ্রয় করায়, তাঁহার দোষ বা ভক্তিস্তম্ভ হইয়াছিল। তিনি বর্ণাশ্রম সুষ্ঠুভাবে আচরণ করিয়াছেন কিন্তু ভগবদ্ ভক্তির মাহাত্ম্য শুনিয়াও নামপ্রভুর প্রতি বা ভগবদ্ ভজনের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা হয় নাই। ফলে সেই বর্ণাশ্রমানুষ্ঠান-হেতু বিষ্ণুর সন্তোষাভাস হইলেও তাঁহার ভক্তি হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া চিত্ত নির্মল হওয়ায় তবে তাঁহার ভক্তির উদয় হইল। তাহার পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার মুক্তিতে অধিকার ছিল। তিনি নামে অর্থবাদ না করিলেও ভক্তিদেবীর নিকট তাঁহার কম বেশী,—কিছু না কিছু অপরাধ ছিল। এই কর্মকাণ্ডে শ্রদ্ধা বা রুচি—উপশাখা বিশেষ। ভক্তির জমি যে শ্রদ্ধা বা রুচি, সেই জমির রসকে ঐ উপশাখা আকর্ষণ করিয়া শুকাইয়া ফেলে। দেহ, দ্রবিণ (লোকজন, টাকাপয়সা), লোভ (অসন্তোষ), জনতা, ভোগ্যবহির্মুখজনে আসক্তি ও প্রতিষ্ঠাশা—এইগুলি দশবিধ নামাপরাধরূপ পাষণ্ডের উদ্ভব করে। এইগুলি ব্যবধান স্বরূপে থাকিয়া ভগবৎ সাক্ষাৎকারে বা ভজনে উন্নতি লাভ হইতে দেয় না; বিষয়ে রুচিবিশিষ্ট করাইয়া ভগবৎ-প্রীতিযুক্ত হইতে দেয় না। শ্রীনামপ্রভুর শুদ্ধ বা অশুদ্ধ উচ্চারণ হউক, অথবা একবার মাত্র অর্থাৎ কেবলমাত্র আভাসই হউক, যদি বর্ণ ও তত্ত্ব-ব্যবধান বা সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ব্যবধান, বিশেষতঃ অপরাধের ব্যবধান না থাকে, তাহা হইলে ফল হইবেই। সুবুদ্ধিরায়কে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"এক কৃষ্ণ নামে করে সর্বপাপক্ষয়"

ইত্যাদি। এখানে 'এক' শব্দে আভাস বুঝায়। নামের আভাসে পাপ নষ্ট হইবে ; আর কৃষ্ণসুখানুসন্ধান-মূলে কৃষ্ণনাম করিলে কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হইবেই। দ্বিতীয়বার নামটিই আভাসের পর শুদ্ধনাম। নিরন্তর নাম উচ্চারণ করিলে ক্রমশঃ অপরাধ দূরীভূত হইয়া শুদ্ধনাম হইবে। যেস্থলে দৃঢ়-বদ্ধমূল রিপুর অত্যাচার (আগন্তুক নয়), বুঝিতে হইবে—সেস্থলে অপরাধ আছে। অপ্রাকৃত বস্তুতে অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস বা অনাদরমূলক অপরাধকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। অপরাধকে আশ্রয় করিয়াই রিপুর উৎকট অত্যাচার বা বিষয়ভোগ প্রবৃত্তি বর্তমান থাকে। মিথ্যা কথা বলাও অপরাধের লক্ষণ।

সিদ্ধগণের আবৃত্তিতে প্রতি অক্ষরের উচ্চারণে নামপ্রভুকে সুখী দেখিয়া নিজের সুখানুভব হয়। অসিদ্ধগণ অপরাধ-নিবৃত্তির জন্য সিদ্ধিলাভ পর্যন্ত জিহ্বায় পুনঃ পুনঃ বা নিরন্তর অনবরত শ্রীনামের আবৃত্তি করিতে থাকিবেন।

নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কুলীনগ্রামে আবেশের সঙ্গে শ্রীহরিকীর্তন করিয়া ও সকল প্রাণীকে কীর্তন করাইয়া সুখী হইয়াছিলেন বলিয়া, কুলীনগ্রামবাসী সকলেই কৃষ্ণপ্রেমাবেশ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীসত্যরাজ খাঁ (লক্ষ্মীনাথ বসু), তৎপুত্র শ্রীরামানন্দ বসু প্রভৃতি শ্রীবার্ষভানবীর দৃষ্টিতে মুরলীবদন শ্রীজগন্নাথের নীবি-বন্ধন-ডোরী সরবরাহ করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। সিদ্ধিতে বিধি-নিয়ম নাই। সহজ তৃষ্ণা বশতঃ আবেশের সঙ্গে নিরন্তর নামগ্রহণ স্বাভাবিক-ভাবেই হইতে থাকে।

যেস্থলে নাম-গ্রহণ-ফলে ভগবৎ সুখানুভবে নিজের উল্লাস হয় না, সেস্থানে অপরাধ আছে অনুমান করিতে হইবে। অপরাধ কিসে জানা যায়? অপরাধ থাকিলে অশ্রদ্ধা, কুটিলতা, ভগবন্নিষ্ঠাচ্যুতিকারক অরুচি, জড়াভিনিবেশ, ভক্তির (ভজনের) প্রতি শিথিলতা, নিজে সেবা করিয়াছি মনে করিয়া জড়াভিমান বা অহঙ্কার—এইগুলিই দেখা যায়। মহতের সঙ্গপ্রাপ্তির লক্ষণ আপাততঃ দেখা গেলেও যদি এইগুলি দূর না হয়, তাহা হইলে পূর্বে কোন মহাপুরুষের নিকট তীব্র অপরাধ হইয়াছে জানিতে হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই সাধু মহাপুরুষ ক্ষমা না করেন, ততক্ষণ সেই অপরাধ যাইবেও না, সুতরাং ভজনের ফলও পাওয়া যাইবে না। কৌটিল্য—ভগবান, গুরুদেব ও তাঁহাদের ভক্তের প্রতি অন্তরে অনাদর থাকিলেও বাহিরে তাঁহাদের পূজার ঘটা-প্রদর্শনই কৌটিল্য। কৌটিল্য না থাকিলে ভক্ত্যাভাসের দ্বারাও মঙ্গল লাভ হয়। কুটিলতার মত ভক্তির এত বড় বাধা আর নাই। কুটিলের ভক্তি অনুশীলনের পথে সহস্র সহস্র, অসংখ্য বাধা। ভগবদ্‌ভক্তগণ মূর্খ অথচ অকুটিলকে দয়া করেন, কিন্তু কুটিলস্বভাব অথচ পণ্ডিতম্মণ্যকে দয়া করেন না। সেই পণ্ডিতম্মণ্যগণের কেহ কেহ নিরুপাধি প্রীতির পাত্র বিষ্ণুকে আদর না করিয়া, কেবলমাত্র ব্রহ্ম বা ভগবানের দর্শন লাভকেই চরম প্রয়োজন মনে করেন।

জড়াভিনিবেশ—দ্বিতীয় বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ অর্থাৎ কর্মকাণ্ড প্রভৃতিতে রুচি, বা ভক্তিব্যতীত ইতর কামনা-বাসনা-জনিত আসক্তি। এগুলি ভক্তিকে ধ্বংস করে না, তবে তাহার

ব্যাঘাত করে। সিদ্ধিলাভের অব্যবহিত পূর্বেও যদি কোন দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হয়, তাহা হইলে কষায় উপস্থিত হইয়া ভক্তির বাধা হইয়া যায়; যথা—ইন্দ্রদ্যুম্ন। তিনি নিজে ব্রহ্মানন্দ-রূপ মুক্তিলাভের আশায় শ্রীবিষ্ণুর আর্চনাঙ্গ বিষ্ণুধ্যানে নিরত থাকায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকারপ্রাপ্ত জীবন্মুক্ত অগস্ত্যমুনিকে আপাত দৃষ্টিতে সম্মান করেন নাই। ইনি ভগবৎ-সাক্ষাৎকারী ও ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারীতে ভেদবুদ্ধি করিয়াছেন বলিয়া এবং মূর্চ্ছিত কষায় জাতরতি শ্রীভরতও হরিণ শিশুর পালনরূপ জড়ীয় পরোপচি-কীর্ষা করিয়াছেন বলিয়া, উভয়েরই দেহের পরিবর্তন হইল, প্রারব্ধ কিছু ভোগ করিতে হইল; কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের বিষ্ণুভক্তি বা প্রেম (রতি) নষ্ট হয় নাই। ঐরূপ সাধুগণের যে মানবেতর নীচদেহ লাভ হয়, তাহাতে কি তাঁহাদের বিষয় ভোগ হয়?—না; অপরাধ-ফলে স্থূল দৃষ্টিতে নীচ প্রাণী-উচিত জড়দেহ লাভমাত্র হয়, ইহাই দেখাইলেন। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে জড়-দেহ ভগবৎ সাক্ষাৎকারের ব্যাঘাতক বলিয়া ভরতের অভীষ্টদেব-দর্শনের উৎকণ্ঠা শতগুণ বাড়াইয়াছিল; যেমন গঙ্গার স্রোত সমস্ত প্রতিবন্ধক ঠেলিয়া চলে, সেইরূপ উৎকণ্ঠা বাড়াইবার জন্যই এই বিজাতীয় দেহ দান করেন, যেমন দাসীপুত্র-জন্মে শ্রীনারদের রতির উদয় হইলেও তাঁহার হৃদয়ে একটু কষায় ছিল, ভগবান্ তাঁহাকে একবার মাত্র দেখা দিয়া আর দেখা দেন নাই। যাঁহাদের রতির উদয় হইয়াছে, অন্য তাৎপর্য হয় নষ্টপ্রায় হইয়াছে, নতুবা ছলনামাত্র আছে, তাঁহাদের সেই অবস্থায় ভগবান্ অন্তঃ-সাক্ষাৎকার অর্থাৎ হৃদয়ে (বাহিরে নহে) দর্শন দান বা আলোক

দান দ্বারা কৃপা করেন। ভগবৎকৃপা প্রদর্শন তিন প্রকার—(১) **আলোক** অর্থাৎ প্রথমে অন্তরে, পরে বাহিরে দর্শন দান, (২) **বাচিক** অর্থাৎ আকাশবাণী প্রেরণ ও (৩) **হৃদয়ে** (যেমন অন্তর্যামী রূপে) **প্রেরণা**। যাঁহারা মূর্চ্ছিত কষায়, তাঁহাদের চিত্তে কিছু কষায় থাকে উৎকণ্ঠা বাড়াইবার জন্য। এই উৎকণ্ঠা ভগবান্‌কে সুখ দেয়। নৃগ-ইন্দ্রদ্যুম্নাদির সাধক অবস্থায় বিবিধ অপরাধমূলক কষায় দেখা গিয়াছিল।

শিথিলতা—আধ্যাত্মিক অর্থাৎ মানসিক বা দৈহিক সুখ-কামনার ব্যাঘাত-হেতু দুঃখের উদয়ে ভক্তিতে শিথিলতা হয়, আবার তাদৃশ সুখের প্রাপ্তি-হেতু সুখের বা উল্লাসের উদয়েও শিথিলতা আসে। ভগবন্নিষ্ঠগণ জাগতিক সুখ-দুঃখে সুখী-দুঃখী হন না। **ভক্তগণ পরমার্থসিদ্ধির জন্য তদনুকূলে দেহ-যাত্রা নির্বাহ করেন। অতি ভোগ বা অতি বৈরাগ্য করেন না। ইহাতে তাঁহাদের ভক্তিহানি হয় না।** ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়াও যদি আগমাপায়ী সুখ-দুঃখে সুখ-দুঃখানুভব নিঃশেষে না যায়, তাহা হইলে ভক্তির শিথিলতাকারক অপরাধ আছে বুঝিতে হইবে। ভক্তিপরায়ণজনের জাগতিক হানি লাভে সুখ-দুঃখ হয় না।

স্বভক্ত্যাদি কৃত অভিমান বা অহঙ্কার—দক্ষ জড়-অহঙ্কার-মূলে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যাহারা নিজেরা কৃচ্ছ্রতা বা তপস্যা করিয়া দেহকে শুষ্ক করিয়া ফেলে, তাহাদের বিরাগ শ্রীবিষ্ণুর প্রতিও পৌঁছায় না। তাহারা ভবব্রতধর অর্থাৎ ভূত-প্রেত-পিশাচের মত হইয়া পড়ে। আবার ভক্তশ্রেষ্ঠ

মহাদেবের প্রতি অপরাধ করিলে অনন্ত সংসার-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া যাইতে হয়। নিজের ক্রিয়া-কলাপের স্তুতি প্রশংসা বা ফলকামনার বা প্রাপ্তির কোনরূপ ব্যাঘাত হইলেই ক্রোধ বা হিংসা, অসূয়া বা দ্বেষ ও নিন্দা করিবার প্রবৃত্তি হৃদয়ে আসিলে নিশ্চয়ই বৈষ্ণবাপরাধ হইয়া পড়িবে। অতএব খুব সাবধান!!!

অশ্রদ্ধা—ভগবৎসম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, স্বভাব, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিক মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহাতে সংশয় ও অবিশ্বাস; যেমন—দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃতত্বে বিশ্বাস করে নাই। অপরাধশূন্য একবার নামাভাসের ফলেই সমস্ত পাপ দূর হয়। আর নিরন্তর নাম উচ্চারণের ফলে সমস্ত অপরাধ ও পাপবীজ অর্থাৎ বাসনা দূরীভূত হয়—যদি প্রাচীন বা আধুনিক কোন অতিরিক্ত নূতন অপরাধ না জন্মিয়া থাকে। মরণের সময়ে কোনপ্রকার ভক্তির আভাসের বিন্দুমাত্র দেখা গেলেও বিপুল ফল হয়। জীবিতকালে যে ভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়, মরণের সময়ে তাহার লেশমাত্র অনুষ্ঠান করিলেও সেই মহাফল হয়; কেননা সেটি—সর্ববিধ সাধনভক্তির একমাত্র সাধন যে দেহ, সেই দেহের নির্জ্যাণকাল বা সঙ্কট মুহূর্ত; আবার সেইকালে সক্রন্দন দৈন্যার্তি হৃদয়ে আসিলে, সেই সময়ে শ্রীভগবান্ সর্বাপেক্ষা বেশী দয়া করেন। ইহার ফলে ভগবদ্দর্শন পর্যন্ত হইতে পারে। এই সুযোগ-সৌভাগ্য কাহার হয়? পূর্বে বা এ জন্মে যাঁহার সর্বাপরাধশূন্য ভগবদ্‌ভজন নিস্পন্ন বা লব্ধ হইয়াছে অর্থাৎ যে কোন আকারে সর্বাপরাধশূন্যা সাধনভক্তিরূপা ভগবদারাধনা যাঁহার লাভ হইয়াছে,

তাঁহারই মরণকালে ভগবন্নামোচ্চারণরূপ ভগবদ্ভক্তির আভাস দেখা গেলেও তাঁহার ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ হইবে। এই আভাসের এত প্রভাব যে, রজস্তমোগুণ দূর কারয়া, অবিদ্যা দূর করিয়া, হৃদয়-মল শোধন করিয়া, মহাপুরুষ ভগবৎপার্ষদের পর্যন্ত সাক্ষাৎক্যার লাভ করায়। যাঁহারা মহতের সঙ্গাভাস বা কৃপাভাস নিরপরাধ হইয়া পাইয়াছেন, তাঁহাদেরই ভক্তি নিষ্পন্ন হইয়া, মরণের সময় ভক্তির আভাসের উদয় করায়। অপরাধ দূর করিবার জন্য তাহার আর বারবার তাহা হইতে মুক্তিবাঞ্ছামূলা আবৃত্তির অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না; যথা—অজামিল। ভগবৎপার্ষদ বিষ্ণুদূতগণ স্বরূপশক্ত্যানন্দী ভগবৎসুখে সুখী, স্বরূপবৈভব। তাঁহারা নিত্যমুক্ত মহাপুরুষ। একদিকে যেমন অজামিলকে কৃপা করিলেন, পক্ষান্তরে আবার তেমনই তাঁহারা যমদূতগণের নিকট ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্তন করিলেও অজামিলের ন্যায় কিন্তু যমদূতগণের মুক্তিলাভ হয় নাই, পরন্ত অজামিলের মুক্তিলাভ হইয়াছিল; কেননা, অজামিল নিরপরাধ আর যমদূতগণের পুণ্য-পাপ-বিচারমূলক রজস্তমো-গুণাশ্রিত অপরাধ ছিল। অজামিল পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই কোন না কোন আকারে মহতের কৃপাসঙ্গাভাসও লাভ করিয়াছিলেন, ইহা তিনি নিজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন নতুবা প্রিয় পুত্রের নাম কেন 'নারায়ণ' রাখিয়াছিলেন? মহাপুরুষ শ্রীবিষ্ণুপার্ষদগণের দর্শন ফলে যখন তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থা, ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই, তখনই তিনি এই গূঢ় সত্য কথা ব্যক্ত করিয়াছেন; মহাপুরুষ বিষ্ণুপার্ষদগণের দর্শন ও উপদেশ ফলে তাঁহার উল্লাস বা রতির উদয় হইয়াছে, তিনি

প্রেমের সোপানের দিকে যাইতেছেন। এখন বিচার্য এই যে, মহৎসঙ্গাভাসের লাভজনিত লৌকিক পরম্পরাক্রমে ঔপচারিক নামাভাসের ফলেই সমস্ত পাপ ও পাপবাসনা বিনাশের পরেও অজামিলের যে বেশ্যাসক্তি দেখা গিয়াছে, অথবা ভরতের যে মৃগদেহ প্রাপ্তি, তাহা কি পাপ বা পাপের ফল ?—না ; ভারত সর্বদা পরমানন্দপ্রাপ্ত ও পরতত্ত্ববস্তুতে পরমাবিষ্ট ছিলেন। সুতরাং ঐ দেহ তাঁহার পাপের ফল নহে। অজামিল যে শরীরে বেশ্যাসঙ্গ করিয়াছেন, সেই শরীরে নাম বলে পাপপ্রবৃত্তিরূপ অপরাধ ছিল না ; নামাভাসের ফলে মহাপুরুষ বিষ্ণুদূতের দর্শন-ফলে, সেই দেহেই তিনি অন্তরে ভগবৎসাক্ষাৎকার পাইতেছিলেন ; তাঁহাকে পাপী বলা যাইবে না। মুক্তিপ্রাপ্ত অজামিলকে স্ত্রীসঙ্গী-জ্ঞান করিয়া 'পাপী' বলিয়া তুচ্ছতাচ্ছিল্য বা অবহেলা বা অসূয়া করিলে অপরাধ হইবে। যাঁহার অনন্যভক্তি লাভ হইয়াছে, তাঁহার মরণ সময়ে ভগবন্নাম কোন মতে আভাসে, মনে, মুখে বা কাণে আসিলে ভগবৎপার্ষদের দর্শন লাভ হইবে, ইহাতে অন্যথা হইবে না। যদি এই স্মৃতি বা উচ্চারণ কোনক্রমে অন্তিম কালে হয়, তাহা হইলে ভগবদ্দর্শন অনিবার্য,—ইহাই ভক্তির অত্যাশ্চর্য ফল। যখন তিনি জীবদ্দশায় পুত্রকে প্রথমবার মাত্র ডাকিয়াছেন, তখনই প্রথম 'নারায়ণ' শব্দের উচ্চারণ-ফলেই পাপ নষ্ট ও পরবর্তীনামোচ্চারণে পাপ-বীজ (বাসনা) ও অপরাধ চলিয়া গিয়াছিল ; কিন্তু অবৈধ কাম-প্রবৃত্তি পরিচালিত হইয়া পুত্রের জন্মের পরেও যে বেশ্যাসঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার আর নামবলে পাপ-প্রবৃত্তিরূপ নামাপরাধ বা তজ্জনিত পুনঃ

পাপানুষ্ঠান হয় নাই, তবে কামনা বা কষায়টা ছিল। ঐ বেশ্যার সঙ্গ তাঁহার পক্ষে পাপ বা অপরাধ নয়; কষায় মাত্র, উহা গুরুতর নয়। উহা নূতন পাপের বা অপরাধের উদয় করায় নাই। মানুষের পাপ না থাকিলেও অপরাধ থাকিতে পারে; তাহা নিরন্তর দৈন্য ও অনুতাপের সহিত পুনঃ পুনঃ ভগবন্নামের আবৃত্তি বা উচ্চারণ করিলেই বিনষ্ট হয়, অন্য উপায়ে বিনষ্ট হয় না। পুত্রের নামের আকারে আকার-যুক্ত ভগবন্নামের প্রথমবারের উচ্চারণের পরে, কয়েকবার উচ্চারণের ফলে, তাঁহার অপরাধ সমস্ত চলিয়া গিয়াছিল। পুত্র ও নারায়ণ—পৃথক বস্তু; অথাপি অজামিলের পুত্র সঙ্কেতে ভগবন্নাম উচ্চারিত হইবার ফলে সমস্ত অপরাধ চলিয়া গিয়াছিল বলিয়া, বেশ্যাসঙ্গ তাঁহার মুক্তি-ফল লাভের পক্ষে ব্যাঘাত করে নাই। এই জন্যই তাঁহার মৃত্যুকালীন নামগ্রহণের প্রশংসাই শুনা যায়; তাহা অপরাধাবৃত হয় নাই। যদি ইহা নাম বলে পাপপ্রবৃত্তি হইত, তাহা হইলে তাঁহার মরণকালে নামাভাসের উচ্চারণ হইত না, বিষ্ণুপার্ষদের দর্শনলাভও হইত না—সুতরাং উহার মাহাত্ম্যও শুনা যাইত না, তিনি দৈন্য ও অনুতাপভরে নিজকে জঘন্য, অশুচি, অপরাধী, বৃষলীপতি ইত্যাদিও বলিতে পারিতেন না। যদি কোন প্রকার অপরাধ না থাকে, এবং কোন আকারে মহতের কৃপাসঙ্গাভাসটুকুও লাভ হয়, তাহা হইলেই মরণকালে দৈন্যভরে অগতির গতি শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়া চোখে জল আসে, তাহাতেই সমস্ত পাপ ও অপরাধ নষ্ট হইয়া ভগবৎকৃপা নিশ্চয়ই উদিত হয়। ভজনপ্রভাব অধিকার-অনধিকারনির্বিশেষে সকলের উপর সমান হয় না।

তামসিক প্রকৃতি ব্যক্তির ভক্তি—তামসিকী ; রাজসিকগণের ভক্তি—রাজসিকী, মুক্তিকামিগণের ভক্তি—সাত্ত্বিকী এবং মহৎকৃপাপ্রাপ্ত প্রেমভক্তিকামিব্যক্তিগণের শুদ্ধা, কেবলা বা অকিঞ্চনা ভক্তির উদয় হইবে। ভক্তির স্বভাব এই যে, নিরপরাধ সাধকের রুচি বাড়ায় ও ভক্তিসিদ্ধের ষড়্গুণ নাশ করে। অপরাধ-প্রবৃত্তি থাকিলে ভজনে উন্নতি হয় না।

———

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

৩রা চৈত্র, বৃহস্পতিবার
বাংলা ১৩৫০ সন।

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

ভগবান্, ভক্ত ও ভগবৎসম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ, ক্রিয়ার প্রতি অবিশ্বাস, অবহেলা, অনাদর বা অশ্রদ্ধাই সমস্ত অপরাধের মূল। অশ্রদ্ধা, কুটিলতা, জড়াভিনিবেশ, ভক্তিশৈথিল্য, জড়াভিমান বা অহঙ্কার ও নামে অর্থবাদ—এগুলিই উক্ত অনাদরজনিত অপরাধের লক্ষণ। শ্রীহরি সম্বন্ধী কোন পদার্থের বা ব্যাপারের প্রতি বা মহতের প্রতি যদি অপরাধ না থাকে, অর্থাৎ যদি

মহতের কৃপাসঙ্গ লাভ হইয়া থাকে এবং অশ্রদ্ধাদি না থাকে, তাহা হইলেই মরণ সময়ে শ্রীহরিনাম কর্ণ, জিহ্বা ও স্মৃতি-পথে আসে, নতুবা নহে। অজামিলের এই ভগবৎ পার্ষদ-সাক্ষাৎকার শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযোগে হয় নাই। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার সহিত অনন্যভক্তির যাজন করিলে প্রেমভক্তি অর্থাৎ ভগবানে মমত্ব বোধ অবশ্যম্ভাবী। নামাভাস ফলে অজামিলের ভগবৎপার্ষদ সাক্ষাৎকার হইয়াছিল, কিন্তু শ্রীভগবানে মমত্ববোধ হয় নাই, শ্রীভগবানে মমতাহীন মুক্তি হইয়াছিল। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হইতে উদ্ভূতা ভক্তি—নির্গুণা ভক্তি। তদ্দ্বারা ভগবান্‌কে সুখী দেখা যায়। অজামিলের প্রথমেই মমতা হয় নাই, পরে যখন পুনরায় শরীর পাইয়া প্রপঞ্চে ভজন করিলেন, তখন ভগবানে মমতাবোধ লাভ করিলেন। অপরাধশূন্য হইয়া যে কোনও ভাবে ভজন করিলেই ফললাভ নিশ্চয়ই হইবে। নিরপরাধ হইলে একবার নামোচ্চারণেই নামাভাস হয়। অপরাধশূন্য হইলে যে কোনও ভাবে ভজনফলে মরণকালে নামাভাস আসিয়া যায়, তৎফলে মুক্তি অর্থাৎ পরমানন্দ হয়, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ও পরমাত্ম সাক্ষাৎকার হয়,—অবশ্য যদি তৎপূর্বে কোনক্রমে মহতের কোনপ্রকার কৃপালাভ হইয়া থাকে। ঐ ব্রহ্ম-পরমাত্ম সাক্ষাৎকার নির্বিশেষ নহে, ভগবৎসাক্ষাৎকারেরই অন্তর্গত। ইহা অস্পষ্ট ভগবদ্‌বৈভব দর্শন। ঐ অবস্থায় মমতাযুক্ত ভগবৎ সাক্ষাৎকার হয় না, তাহা একমাত্র শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত ভজনেই হইবে। নিরপরাধত্বই ভক্তি লাভের যোগ্যতা, আর অপরাধ দুষ্টত্বই—ভক্তিলাভে সর্বাপেক্ষা বাধা-বিঘ্ন ; সুতরাং অযোগ্যতা নিষিদ্ধাচার,

লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা, কুটিনাটী, জীব-দ্রোহ—এগুলি সমস্তই উপশাখা। এই উপশাখাগুলি ভক্তিবৃত্তিকে স্তব্ধ করিয়া দেয়। অজামিলের ভক্তি-স্তম্ভ ছিল না। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কথিত সম্বন্ধ-জ্ঞানই শ্রীল শ্রীজীবপ্রভুর ভাষায়—'শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা'। উপাস্যের মাহাত্ম্যের উপলব্ধিই সম্বন্ধ জ্ঞান বা মহিমজ্ঞান। শাস্ত্রের প্রতিপাদ্যবস্তুর মহিমার বা মাহাত্ম্যের অভিজ্ঞান না থাকিলে 'শ্রদ্ধা' হয় না। অজ্ঞের বা অনভিজ্ঞের শ্রদ্ধা নাই। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার হেতুই ঈশ্বরের মহিমজ্ঞান লাভ। তিনি দেশকালাতীত, সমস্ত জীবাত্মার আত্মা ও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, ইহাই তাঁহার মহিমার লক্ষণ। শুদ্ধ ভক্ত্যাভাসের কথা দূরে থাকুক, অপরাধ-প্রতিম ভক্ত্যাভাসেও মহাফল লাভ হয়,—যদি মূলে কোন অপরাধ না থাকে। কোন কর্মের অনুষ্ঠানে প্রথমে অপরাধের মত দেখা গেলেও উহার ফলটা যদি ভগবান্ পান, তাহা হইলে নিরপরাধ হইয়া নিশ্চয়ই ফললাভ ঘটিবে। নামে অর্থবাদাদি দশনামাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ, অশ্রদ্ধাদি, বিষয়-রাগ অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদি বা মিথ্যা কথা বলা—এইগুলি অপরাধের লক্ষণ। এই সকল অপরাধ থাকিলে, মরণকালে নামাভাস হয় না। যাহার এই জন্মে বা পূর্বজন্মে মহৎসঙ্গ-কৃপাজনিত কোন আকারে ভক্তি লাভ হয় নাই, তাহার মরণকালে ভক্ত্যাভাস হয় না। অপরাধ না থাকিলেই যে কোন আকারে ভক্তি-অনুষ্ঠানে কৃতার্থ হওয়া যায়। কর্মার্পণরূপ নৈষ্কর্ম-সন্ন্যাসই সমগ্র বেদশাস্ত্রের শেষ কথা। কর্মার্পণেরও সাধ্য অর্থাৎ শেষ ফল—সাক্ষাৎ ভক্তিই। এই সাক্ষাদ্ভক্তি সবলা। ভক্তি থাকিলে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বা

প্রেম—সবই পাওয়া যায়, ভক্তি না থাকিলে ঐ সকলের কোনটিই বা কিছুই পাওয়া যায় না। অপরাধ না থাকিলে এই ভক্তিই পরমপুরুষার্থফল দান করে। বিষ্ণুর একাগ্রচিত্তে উপাসনাই শুদ্ধা, নিষ্কামা, নিষ্কিঞ্চনা, কেবলা বা অহৈতুকী ভক্তি। অনন্য-বিষ্ণু-ভক্ত্যাভাসের অনুষ্ঠাতা দৈবাৎ পাপ করিলেও 'সাধু'; সে যখন বুঝিবে যে, পাপ করিলে বিষ্ণুর সন্তোষ হয় না, তখন শীঘ্রই ভগবৎকৃপায় কোন মহতের কৃপা-সঙ্গ পাইয়া ধর্মাত্মা—অর্থাৎ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং তাহাকে অবজ্ঞা বা নিন্দা করিতে হইবে না। বিষ্ণুর প্রতি অনন্যশ্রদ্ধা অতি দুর্লভ। বিষ্ণুর সুখ-কামনা ও বিষ্ণুব্যতীত অন্যকামনা ত্যাগই অনন্যা ভক্তি। অনন্যভক্ত বিষ্ণুর ঐশ্বর্যাদি, চতুর্বিধ মুক্তিও চাহেন না। এই নিষ্ঠাই অকিঞ্চনা ভক্তি। এ পর্যন্ত ভক্ত্যাভাস ও নিরন্তর ভগবৎনাম গ্রহণের মাহাত্ম্যের কথাই বলা হইল।

শ্রবণ-কীর্তনাদি সাক্ষাদ্ ভক্তি; উহা পারম্পরিকী নয়। নববিধা ভক্তি কৃষ্ণসহ অভিন্ন, কৃষ্ণ সুখোৎপাদিনী, ইহাতে অনুষ্ঠাতার নিজের কোন সুখ-কামনা নাই। যদি ঐকান্তিক হইয়া অর্থাৎ ভক্তি (ভগবৎসুখানুষ্ঠান) ব্যতীত অন্য সাধন রহিত হইয়া ও ভগবৎসুখবাসনারূপ সাধ্য ব্যতীত অন্যবাসনা রহিত হইয়া ভক্তি যাজন করা যায়, তাহা হইলেই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। এই ভক্তি অনুষ্ঠানে উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে লাভ-ক্ষতির খতিয়ান কিছু নাই। এই ভক্তি—স্বাভাবিকী। ভক্ত ও ভগবান্ পরস্পরকে সুখী দেখিয়া নিজে সুখ বোধ করেন,

আত্মহারা হইয়া যান। যেমন মুখে রং মাখিয়া আয়নার সামনে দাঁড়াইলে মুখের রংটাই আয়নাতে প্রতিফলিত দেখা যায়, তদ্রূপ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "ঘুচাও সংসার জ্বালা" প্রভৃতি গীতিতে শরণাগতির বাধক সংসার দূর করিয়া, পূর্ণ শরণাগত করিয়া দিবার প্রার্থনাই জানাইয়াছেন, নিজ মুক্তি কামনা করেন নাই। প্রহ্লাদমহারাজও বলিয়াছেন—"আমি মুক্তিকামী হইয়া তোমার চরণাশ্রয় করিলাম।" এখানে 'মুক্তি' অর্থে ভক্তিবিরোধী সংস্মৃতি বা ভগবদ্‌বিস্মৃতি-জননী অন্যবাসনার লেশও নিজ হৃদয়ে যেন না থাকে, এই কথাই বলিয়াছেন। অম্বরীষ মহারাজ লোক সংগ্রহের জন্য, অন্যান্য সাধারণ—বদ্ধ, বিমুখ ক্ষত্রিয় রাজগণকে পাপকর্ম ছাড়িয়া শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষাভাসজনক বৈদিক পুণ্য কর্মার্পণে প্ররোচিত করিবার জন্য অনভিনিবেশ সহকারে যজ্ঞ-তর্পনাদি করিতেন। ভগবানের সুখানুসন্ধানমূলে অর্থাৎ 'আমি ভক্তি করিলে তিনি কত সুখী হইবেন, আর আমি ভক্তি করিতেছি না, ইহাতে তিনি কত দুঃখ পাইতেছেন, ইহাতে আমার কত অপরাধ হইতেছে', এই চিন্তা সর্বক্ষণ করিয়া যে ভক্তির অনুষ্ঠান—তাহাই সাক্ষাদ্‌ভক্তি।

মন সব সময় বিষয়ের দিকে ছুটিয়া যাইতেছে, তাহাকে সমস্ত বিষয় হইতে তুলিয়া লইয়া, ভগবদ্‌-পাদপদ্মে লাগাইবার নামই মনের 'অর্পণ' বা স্মরণ বা ধারণা। এই অর্পণ করিবার পর তবে ভক্তি 'সাক্ষাৎ' হয়, তৎপূর্বে-সাক্ষাদ্‌ভক্তি হইবে না। সাক্ষাদ্‌ভক্তি অনুষ্ঠিত না হইলে বিলম্বে পরমপুরুষার্থ-ফল লাভ হইবে। শীঘ্র ফললাভ হইবে না।

পূর্বে অর্পণ ক্রিয়াটি অর্থাৎ কেবলমাত্র শ্রীবিষ্ণুরই সন্তোষের উদ্দেশ্যে এই ভক্তি ক্রিয়াটি হইতেছে বা হইবে—এইরূপ চিন্তা বা স্মৃতি না হইলে তাহাকে 'সাক্ষাদ্‌ভক্তি' বলা যাইবে না। এই স্মরণ বা মনোধারণা বা 'অর্পণ' হইলেই তবে তাহা 'পরধর্ম' হইবে। আমি ভক্তি করিলে ইষ্টদেবের সুখ হয়, আমি তাঁহাকে সুখী দেখিতে পাইলেই আমারও তাহাতে সুখ হইবে ; আর ভক্তি না করিলে তাঁহার কত দুঃখ হয়, আমারও কত অমঙ্গল হয়—এইরূপ চিন্তা—বা ভগবৎ সুখানুসন্ধান লইয়া যদি ভক্তি অনুষ্ঠান না করা যায়, তাহা হইলে শকটাসুরের ন্যায় ভার-বাহিত্বই হইবে ; শকটের তলে পুনর্জাত অধোক্ষজের সেবা বা সারগ্রাহিত্ব লাভ হইবে না। নববিধা সাক্ষাদ্‌ভক্তিযাজীই শাস্ত্রের প্রকৃত নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে পারেন। তাঁহার অধ্যয়নই সার্থক। 'পারম্পরিকী' শব্দের অর্থ—কর্মার্পণমূলক ভক্ত্যাভাসের অনুষ্ঠান ; তৎফলে সাক্ষাদ্‌ভাবে বিষ্ণু সন্তুষ্ট হন না, অনেক কিছুর মধ্য দিয়া ফলটা শেষে বিষ্ণুর নিকট পৌঁছায়। সমস্ত প্রকার ভক্ত্যনুষ্ঠানই নববিধা ভক্তির অন্তর্গত।

সাম্মুখ্য তিনপ্রকার—কর্মার্পণ, জ্ঞান ও ভক্তি। বৈদিক কর্মার্পণ দ্বারা ক্রমোচ্চ অবস্থা লাভ করিয়া সত্যলোক, এমনকি ব্রহ্মলোকে পর্যন্ত যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ; কিন্তু তাহার পরে পুনঃ সংসারে ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা থাকে। ভক্তির অনুগামী জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডভেদ করিয়া বিরজা ও ব্রহ্মলোক পর্যন্ত পাওয়া যায় ; কিন্তু মহৎ কৃপাসঙ্গজনিত ভক্তির দ্বারা ভগবদ্ধামে ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ হয়।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্‌-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্

৪ঠা চৈত্র, শুক্রবার,
১৩৫০ সন।

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

পরতত্ত্বের আবির্ভাব দুইপ্রকার—গুণহীন নির্ধর্মক ও গুণযুক্ত সধর্মক। ভক্তির আনুগত্যে জ্ঞানদ্বারা নির্বিশেষ আবির্ভাবের ও অনন্যা বা অন্য নিরপেক্ষা ভক্তিদ্বারা সবিশেষ আবির্ভাবের সাক্ষাৎকার হয়। কর্মার্পণ এই দুইটি অভিধেয়ের (জ্ঞান ও ভক্তির) দ্বারস্বরূপ। সাধকের যোগ্যতা অনুসারে এই তিন পথে চলিবার যোগ্যতা লাভ হয়। ফলকামীই অর্থাৎ ইহলোকে ও পরলোকে ফল বা ধর্মার্থ-কাম যে চায়, সে-ই 'কর্মী'। যাহার কর্মের ফল কামনায় অলং-বুদ্ধি বা ঘৃণা ও নির্বেদ আসিয়াছে, পুনঃ ভোগাভিলাষ আর যাহার নাই, তাহার পক্ষেই সন্ন্যাস-যোগের ব্যবস্থা। সে ইহলোকে বা পরলোকে ফলকামী হইয়া কোন কর্ম করে না। সে বিচারপ্রধান মার্গে 'তৎ' পদার্থ পরতত্ত্ববস্তুর সঙ্গে 'ত্বং' পদার্থ নিজকে অভিন্ন কল্পনা করে। সাধনোন্নতিতে বিভূতি প্রভৃতি লাভের ফলে তাহার বৈরাগ্য একটু এদিক-ওদিক হইলেই তাহার সর্বনাশ অর্থাৎ অধঃপতন হয়; আর তাহার এ-জন্মে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইবে না। পূর্বজন্মে কোন মহতের

(মহৎগণ প্রায়ই শ্রীবিষ্ণুর সম্পর্কযুক্ত কোন পুণ্যনদীতীরে অথবা শ্রীহরির কোন অবতার-লীলা-পূতঃ স্থানে বা তাঁহার কোন প্রসিদ্ধ অথচ নিজপ্রিয় নিজজনের লীলাস্থানে অথবা শালগ্রামের কিংবা তুলসীর সন্নিকটে, অথবা যেস্থানে শ্রীনামকীর্তন ও শ্রীগীতা-শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠের স্থানে বাস করেন) কোনপ্রকার কৃপা-সঙ্গ-সংস্পর্শ লাভ ঘটিয়াছে, অথচ সংসারে সম্পূর্ণ অলং-বুদ্ধিও হয় নাই, আবার সংসারে অতিরিক্ত আসক্তিও নাই, অথচ ভক্তির মাহাত্ম্যে অচল-অটল দৃঢ়বিশ্বাসী, তাঁহারই ভক্তি-মার্গে অধিকার। নববিধা ভক্তির প্রতি দৃঢ়শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসই প্রথম যোগ্যতা। এটি না হইলে আদৌ ভক্তির অনুষ্ঠানই চলিবে না। জগতে অধিকাংশ লোকই তমঃপ্রকৃতি বা রজঃপ্রকৃতি কর্মী। কর্মে অর্থ, শারীরিক সামর্থ্য, জাতিবিচার প্রভৃতির অপেক্ষা আছে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেহ যজ্ঞ ও বেদপাঠাদি করিতে পারে না ; কিন্তু ভক্তিতে কোন কিছুরই অপেক্ষা নাই।

কোন প্রকারে কোন বিষ্ণুতীর্থে অবস্থিত কোন সাধুর বা মহতের হাওয়া যদি গায়ে লাগে, অর্থাৎ তাঁহার দৃষ্টিপাত, কথোপকথন, পাদস্পর্শ, সম্ভাষণাদি দ্বারা যদি কোনরূপ সঙ্গ হয়, তবে সেইটিই ভাগ্য বা 'সুকৃতি' নামে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। উহাই ক্রমশঃ রুচি ও শ্রদ্ধাকে, শ্রদ্ধা আবার অনন্যভক্তিকে উদয় করায়। 'শ্রদ্ধা' শব্দে ভক্তিতেই দৃঢ়বিশ্বাস অর্থাৎ ভক্তির অনুষ্ঠানেই চরম পরম মঙ্গললাভ অনিবার্য ও সুনিশ্চিত, ভক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই করিব না,—এই দৃঢ়বিশ্বাসকেই বুঝায়। তখন স্বভাবতঃই আপনা হইতে কর্মকাণ্ডের প্রতি নির্বেদ বা স্বাভাবিক

বিতৃষ্ণা অর্থাৎ 'আর নয়' এরূপ বিচার আসে। সেই অবস্থায় হৃদয়-দৌর্বল্য বা পুণ্যজনক জাগতিক সাংসারিক কর্তব্যকর্মের প্রতি তৃষ্ণা কিছু থাকিতে পারে। তাহাতে দুঃখ বা ভয় করিবার কিছুই নাই। ভক্তির এত তীব্র বল যে, তাহা এই দৌর্বল্যকে সমূলে বিনাশ করিতে পারে। অনন্যভক্তি হইয়াছে কিনা, তাহার লক্ষণ এই যে, ভক্তির অনুষ্ঠান সে কখনও ছাড়ে না। জ্ঞানমার্গে শাস্ত্র বলেন যে, পূর্ণ বৈরাগ্য না হইলে 'ব্রহ্ম-জ্ঞান' উদিত হয় না ; কিন্তু ভক্তির সীমা এত বেশী বিস্তৃত যে, জড়বদ্ধ, অনর্থগ্রস্ত, বিষয়াসক্ত অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেমের পরাকাষ্ঠা পর্যন্ত ভক্তির একচ্ছত্র সাম্রাজ্য। দেহাত্মবোধ ছাড়িয়া, বৈরাগ্য করিয়া তবে ভক্তি করিতে হইবে, তাহা নহে ; প্রেমভক্তি না হওয়া পর্যন্ত অবিদ্যার বা দেহাত্মবোধের নাশ হয় না। ভক্তি করিতে করিতেই দেহাত্মবোধ যাইবে। পরতত্ত্বের মহিমজ্ঞানই 'শ্রদ্ধা'। ভক্তির মাহাত্ম্য যাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে, তাহাকে কর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য বা অভক্তির মাহাত্ম্য আকৃষ্ট করে না। ভক্তিতে শ্রদ্ধা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অভক্তির প্রতি স্বাভাবিক-ভাবে বিতৃষ্ণাও আসে, এটিই ভক্তিযাজীর শুদ্ধ 'বৈরাগ্য'। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা না থাকিলে অনন্যা ভক্তির অনুবৃত্তি (অনুসরণ) হয় না ; শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা ব্যতীতও অনন্যা ভক্তির আকার বা অভিনয় কোথাও কখনও দেখা গেলেও কিছুদিন পরে সেই অভিনয় নষ্ট হইয়া যায়। ভগবৎ কথায় শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হইলে আর কর্মকাণ্ড করিতে হয় না। ভক্তির আকারমাত্রের উৎপত্তিতে অবশ্য শ্রদ্ধার দরকার নাই। যথা—অজামিল পুত্রকে উপলক্ষ

করিয়া 'নারায়ণ' এই নামব্রহ্মের আকারটি (পুত্রকে ঐ নামে লক্ষ্য করায় উহা নামাভাস মাত্র) উচ্চারণ করিয়াছিল, ভক্তি (আকার) মাত্র করিয়াছিল। সেই উচ্চারণে শ্রদ্ধা ছিল না; কিন্তু কোন অপরাধও ছিল না বলিয়াই অজামিল ফল পাইয়া গেল। 'সতাং প্রসঙ্গাৎ' শ্লোকে এই 'প্রসঙ্গ' শব্দটি—ভজনের পূর্বাঙ্গ, পরাঙ্গ নয়। এই 'প্রসঙ্গ' হইতে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা (সাধন-ভক্তি), রতি (ভাবভক্তি) ও ভক্তির (প্রেমের) উদয় হয়। সাধনভক্তিতে শ্রদ্ধা ও রুচির তারতম্য, আর রতি ও প্রেমে উল্লাসের তারতম্য শোনা ও দেখা যায়। 'ভক্তি' শব্দে ঐ শ্লোকে প্রেমভক্তির কথাই বলিয়াছিলেন। এইগুলি সমস্তই ভজনের পরাঙ্গ। ঐ প্রথমমুখে, সাধুর নিকট ভগবৎ কথার শ্রবণ বা বর্ণনা-সংলাপ-ফলে হৃদয়ে ও কর্ণে যে রসায়ন, অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান উৎসাহ-বল এবং হৃদয়ে রুচি আসে, তাহা ভজনের পূর্বাঙ্গ। এটি ভক্তি (আকার) মাত্র। অনন্যাভক্তি তখনও আরম্ভ হয় নাই। 'জোষণাৎ'—সেই সাধু মুখে শ্রবণ-সংলাপাদির যদি নিরন্তর অনুবর্তন বা অনুষ্ঠান হইতে থাকে, তাহা হইলেই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার অর্থাৎ অনন্যা ভক্তি লাভের যোগ্যতা উদয় হয়। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার সঙ্গে অনন্য বা নিষ্কাম বা অকিঞ্চনভাবে ভজন করার ফলে সাধ্য-ভক্তি রতি ও প্রেমের উদয় হয়। পূর্বোক্ত ঐরূপ ভক্তি (আকার) মাত্রের অনুষ্ঠানও নিরপরাধ হইলে যে ফল লাভ হয়, কর্ম বা জ্ঞানযোগে তাহা পাওয়া যায় না। শ্রদ্ধা—শাস্ত্র বহির্মুখ মানব-জাতির জন্য যে নিত্য শাসন বিধান করিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃঢ় অবিচলিত বিশ্বাসই 'শ্রদ্ধা'। শ্রদ্ধা ক্রিয়া বা অনুষ্ঠানময়ী নয়

বলিয়া, অর্থাৎ শুধু উহা বিশ্বাসরূপা বলিয়া, স্বয়ং ভক্ত্যঙ্গ নহে ; তথাপি ইহাই অনন্যা ভক্তিতে যোগ্যতা লাভের কারণ। অনন্যা ভক্তি বস্তুতঃ কোনরূপ বিধিসাপেক্ষ নয়। আগুনের দাহনধর্মের মত সে স্বাভাবিকভাবেই ফল দেয়। নিরন্তর ভগবৎসুখানুসন্ধান-মূলে যে নবধা ভক্তি, তাহার স্বভাবই এই যে, তাহা ভগবৎ-সাক্ষাৎকার অর্থাৎ প্রেমের উদয় করায়, তাঁহাকে ভালবাসিয়া সুখী দেখিতে প্ররোচিত করায়, নিজের 'যথাসর্বস্ব' বলিয়া বোধ করায়।

নববিধা ভক্তির গঠনেই এরূপ ফলদানের শক্তি আছে। অতএব শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাসহ অনন্যা ভক্তিতে শীঘ্র ফল লাভ হয়। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা বাদ দিয়া করিলে বহু বিলম্বে ফল লাভ হইতে পারে বা না-ও পারে। সেস্থলে অপরাধাদি প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। শ্রদ্ধা না থাকিলেও যাহারা মূর্খ অথচ অকুটিল, তাহারা ভক্তি (আকার) মাত্র দ্বারা ভগবদন্তর্গত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পর্যন্ত লাভ করিতে পারে। এস্থলে কিন্তু শ্রদ্ধা ও 'হেলা' দ্বারা সমান ফল অর্থাৎ মুক্তি হয় মনে করিয়া, জানিয়া শুনিয়া 'হেলা' করিলে মহাদৌরাত্ম্য হইয়া যাইবে। অজ্ঞাতভাবে হেলাপূর্বক ভক্তির অনুষ্ঠান হইলেও যদি অপরাধ না থাকে, তাহা হইলে ফল লাভ হইবে।

একবার উচ্চারণ করিলেই 'আভাস' হইবে, পরিত্রাণের পক্ষে অসুবিধা হইবে না ; কিন্তু পণ্ডিতম্মণ্যব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া হেলা করিলে তাহার সুবিধা হইবে না ; যথা—বেণ। বেণের এই চিত্তবৃত্তিকে শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু 'নাস্তিকতা' বলিয়াছেন।

হিরণ্যকশিপু নিরাকার ঈশ্বর স্বীকার করিত ; কিন্তু বেণ ঈশ্বর স্বীকার করিত না, নিজকে 'ঈশ্বর' বলিত। এখানে মৎসরতা থাকার দরুণই বেণে ভগবন্নামের উচ্চারণরূপ ভক্তির বস্তুশক্তি বাধিত হইয়াছে দেখা যায়। স্বাভাবিক শুষ্ক অবস্থায় থাকিলে বস্ত্র, তৃণ, কাষ্ঠ, কাগজ, কয়লা প্রভৃতিকে আগুনে পোড়াইবেই ; কিন্তু ভিজা হইলে ধোঁয়া হইতে থাকে, আগুনের ধর্ম দাহন-ক্রিয়াটি প্রকাশিত হয় না। এই ধূমায়িত অবস্থাই অশ্রদ্ধা, কৌটিল্য, জড়াভিনিবেশ, জড়াহঙ্কারময় অনর্থযুক্তাবস্থা তুল্য। তারপর যখনই ঐ বস্তুগুলিতে আগন্তুক ভিজা-অবস্থারূপ উপাধিটি বা বাধাটি চলিয়া যায়, তখনই ঐ বস্তুগুলিতে আগুনের ধর্ম প্রকাশিত হয়—আগুন জ্বলিয়া উঠে। নিরন্তর শ্রীনামের আবৃত্তির ফলে অপরাধ দূরীভূত হইলেই, তবেই ভগবন্নাম গ্রহণের ফল দেখা যায়। 'শ্রদ্ধা' শব্দে আদর বুঝায়। শ্রদ্ধা, বিশ্বাস বা আদর না থাকিলেও অপরাধশূন্য নামাভাসেও ফল দেখা যায় বটে, কিন্তু শ্রদ্ধাযুক্ত অনন্যভজনে যে ফল লাভ হয়, শ্রদ্ধাহীন বা আদরহীন ভক্তিতে সেই ফল লাভ হয় না ; তাহাতে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনাও অত্যন্ত বেশী। সমস্ত অপরাধের মূলই ভগবানে, ভক্তে, ভক্তিতে ও তৎসম্বন্ধি বস্তুতে অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস বা অনাদর।

অনাদর বা অপ্রাকৃতবস্তুর বা ব্যাপারের পূজ্যত্বের ও শ্রেষ্ঠত্বের অস্বীকার এবং অপরাধের মধ্যে পরস্পর কার্য-কারণ সম্বন্ধ। অশ্রদ্ধাই অপরাধের কারণ বা জনক। শ্রীহরিসম্বন্ধি বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করিয়া, নিজের সমান ভূমিকায় অবস্থিত মনে করিয়া,

সমালোচনা (criticise) করিতে যাওয়াই অশ্রদ্ধার লক্ষণ। অনন্যা ভক্তির কারণই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা। এই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাটি অপরাধের জনক অশ্রদ্ধাকে বিনাশ করে। শ্রদ্ধাদ্বারা ভগবত্তোষণ হয়। অনাদর থাকিলে ভগবত্তোষণ হয় না, তিনি অসন্তুষ্ট হইলে তাহার ফলে অপরাধ হয়। ভগবান্ সন্তুষ্ট হইলেই এই অপরাধ বিনষ্ট হয়। ভগবানে, ভক্তে ও তদ্‌বস্তুতে আদর হইলেই ভগবান্ সন্তুষ্ট হন। শ্রদ্ধার সহিত নিরন্তর অনুশীলন ফলে ভগবান্ সন্তুষ্ট হইলেই সমস্ত অপরাধ বিনষ্ট হয়। তাহা হইলে দেখা যায় যে, শ্রদ্ধা—অনন্যা ভক্তির 'বিশেষণ'। এস্থলে 'বিশেষণ' ও 'উপলক্ষণ' এই দুইটি শব্দের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে হইবে। যে লক্ষণটি ক্রিয়ার সঙ্গে নিয়তই থাকে—ক্রিয়া হইতে যে লক্ষণটিকে বিচ্ছেদ করা যায় না, তাহাই 'বিশেষণ' নামে কথিত ; যেমন 'বস্ত্রধারীকে ভোজন করাও'—এই বাক্যে ভোজনকালে ভোজনকারীর বস্ত্র-ধারণ লক্ষণটিও থাকে, অতএব 'বস্ত্রধারী' শব্দটি 'বিশেষণ'। আর 'অস্ত্র-শস্ত্রধারীকে ভোজন করাও'—এই বাক্যে ভোজনকালে ভোজনকারীর অস্ত্র-শস্ত্র-ধারণরূপ লক্ষণটি পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়িয়া আসিয়া তবে ভোজন ক্রিয়াটির সম্পাদন বুঝায়। অতএব 'অস্ত্র-শস্ত্রধারী' এই শব্দটি 'উপলক্ষণ'-রূপে ব্যবহৃত। শ্রদ্ধা হইতে ভক্তিতে নিয়ত প্রযত্নশীলতা আসে, কখনও ভক্তির অনুষ্ঠানে শৈথিল্য আসে না। আর যদি কোন প্রকার হৃদয়-দৌর্বল্য থাকে, পুণ্যময় কর্মে আসক্তি থাকে, তাহাতে তৎকালে গর্হণ আসে। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হইলে পাপ থাকে না। পাপ যেখানে, সেখানে কোন বিষ্ণুসম্বন্ধ

নাই। যদিই বা—দৈবাৎ পাপ হয়, তাহাতে তাহার আদর হয় না।

লৌকিক শ্রদ্ধাতেও পাপ করিতে গেলে মনে কষাঘাত আসে,—'ইষ্টদেব ভগবান্ বিষ্ণু ত ইহাতে সুখী হইবেন না!' তখন সে আর পাপ করে না; শীঘ্রই পাপ ছাড়িয়া দিয়া শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যায়। যাহার মনে কষাঘাত আসে না, তাহার শ্রদ্ধা নাই; তাহার কপালে বহু কষ্ট আছে।

শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হইলে বর্ণাশ্রম ত্যাগই বিধেয়। "শ্রুতি স্মৃতি মমৈবাজ্ঞে" ইত্যাদি শ্লোকে ভগবান্ বিষ্ণু বর্ণাশ্রমবিধির বা কর্মের উপদেশ দিয়াছেন বটে কিন্তু এই পূর্ববিধি ছাড়িয়া দিয়া স্বয়ংরূপ ও সর্বাবতারীর অংশী শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীউদ্ধবের নিকট কথিত উপদেশ অনুসারে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয়ে সেই স্বয়ংরূপ ভগবানের আদিষ্ট পরবিধি অর্থাৎ কর্মত্যাগরূপ বিধি যে পালন করে না, তাহার নিশ্চয়ই দোষ হইবে।

জ্ঞানমার্গে পূর্ণনির্দোষ বৈরাগ্য বা নিবৃত্তিলাভ ততটুকু মাত্র হইতে থাকে—কর্মার্পণ করিতে করিতে নিজের যত্নচেষ্টার প্রতি আস্থা রাখিয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ যতটুকু বা যতদূর হইতে থাকে। আর ভক্তিমার্গে মহতের হাওয়া গায় লাগিলে স্বাভাবিকভাবেই ভগবদিতর সুখে বৈরাগ্য বা নিবৃত্তির উদয় হয়। অন্য দেবতাকে পৃথগীশ্বর বুদ্ধিমূলে বিষ্ণুর সহিত অভেদ-বুদ্ধিত্যাগ ও বর্ণাশ্রম ত্যাগই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার তটস্থ লক্ষণ। এই বর্ণাশ্রম পরিত্যাগী কোন পাপ প্রবৃত্তির পোষণ কিংবা পাপকার্যের অনুষ্ঠান করেন না, দৈবাৎ পাপকার্য করিলেও উহার জন্য আর পৃথক্‌রূপে প্রায়শ্চিত্ত

করেন না। যদি দৈবাৎ পাপ হয়, তাহা হইলে তিনি চিন্তা করেন,—'পাপ করিলে ভগবান্ বিষ্ণু ত সন্তুষ্ট হন না; পাপ করিলে তিনি অসন্তুষ্টই হইবেন, ফলে আমার অপরাধই হইবে, ভজনোন্নতি হইবে না'—এইরূপ চিন্তাশক্তিটি অন্তর্যামি-সূত্রে ভগবান্ই তাঁহার হৃদয়ে দেন, তিনি তখন আর পাপ করেন না। শ্রদ্ধা ও শরণাগতির উদয়ে বর্ণাশ্রম ত্যাগ হয়। সুতরাং শ্রদ্ধা ও শরণাগতি একার্থবাচক। শ্রদ্ধা—শাস্ত্রার্থ বিশ্বাস। ভগবান, ভক্ত ও ভক্তির মাহাত্ম্যকীর্তনকারী শাস্ত্র যাহা বলিতেছেন, তাহা আমার মঙ্গলের জন্যই—এই দৃঢ় বিশ্বাসই 'শ্রদ্ধা'। শাস্ত্র সর্বদা, সর্বত্র কেবলমাত্র শরণাগতির কথাই বলেন। জগতে কেহই দুঃখ বা যে সুখ বাধা প্রাপ্ত হয়, সেই ক্ষণিক অস্থায়ী সুখ চাহে না। বাধাটাই ভয়; এই ভয় সুখকে দুঃখে রূপান্তরিত করে। এই বিঘ্ন ও আতঙ্ক দূর করিয়া দেয় 'শাস্ত্র'। শাস্ত্র ভগবদ্‌বিস্মৃতিরূপ মৃত্যুর কবলিতকে অমৃত, অশরণকে শরণ, শোকগ্রস্তকে সান্ত্বনা ও ভীতকে অভয়ের সন্ধান দেয়। শরণাগতি না থাকিলে তাহার নিরবচ্ছিন্ন সুখ হইবে না,—ভয়, বাধা ও বিঘ্ন আসিবে,—এই কথা শাস্ত্র বলেন বলিয়াই শাস্ত্রে তাহার বিশ্বাস হয়। শাস্ত্রের মাহাত্ম্যই এই যে, শাস্ত্র সকল সময়ে, সকল স্থলে শরণাগতির কথাই বলেন। ছয় প্রকার শরণাগতির উদয়ই শ্রদ্ধার লক্ষণ। শ্রদ্ধা হইলে কর্মকাণ্ডে বা বর্ণাশ্রমের পালনে আন্তরিক উৎসাহ অথবা বর্ণাশ্রমের অপালনে দোষ হইবে—এই ভয়ও থাকে না। আবার, বর্ণাশ্রম ত্যাগের পরও যদি কোন কারণে কখনও কিছু সময়ের জন্য ভক্ত্যনুষ্ঠান বাধাপ্রাপ্ত

হয় বা ভজন না করা যায়, তাহা হইলে কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ? অর্থাৎ যদি বল, একে ত বর্ণাশ্রমত্যাগেই নিশ্চয়ই পাপ, তাহাতে আবার সেই বর্ণাশ্রমত্যাগী যদি সাময়িকভাবে ভক্তিরও যাজন ত্যাগ করে, তবে তাহার পাপ-ফল লাভ হইবে না কেন ? তদুত্তর এই যে, তাহার পাপ হইবে না ; সুতরাং বর্ণাশ্রমত্যাগের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বা অনুতাপেরও দরকার নাই। বর্ণাশ্রমত্যাগ ফলে যদি নীচজাতিতে জন্মগ্রহণ হয়, তাহা হইলেও পূর্বজন্মে ভগবদুপাসনা যতটুকু হইয়াছে, তাহার পর হইতেই তাহার ভজন আরম্ভ হইবে ; নূতন করিয়া আর তাহার ভজন আরম্ভ করিতে হইবে না। হ্লাদিনী শক্তির ভক্তিবৃত্তির সেস্থানে অভাব হইবে না, সুতরাং ক্ষতি কিছু নাই। "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য"—অর্থাৎ সত্ত্বগুণজাত কর্মার্পণজনিত ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা থাকিলেই অনন্যা ভক্তি থাকিবেই। হৃদয়ে অনন্যা ভক্তি থাকিলেই চিত্তকে বিষয় হইতে টানিয়া আনিয়া, শ্রীকৃষ্ণের সুখ হইতেছে কিনা, এই চিন্তা করাইবেই। ভরত মহারাজ অন্য কোন বচন আশ্রয় করেন নাই ; সর্বদা নামকীর্তন করিতেন। অন্য যাহা কিছু যজ্ঞাদি কার্য করিতেন, তাহাও নামাশ্রয়ে থাকিয়াই করিতেন—ইহাই 'শ্রদ্ধা'। অতএব শ্রদ্ধা বিনা অনন্যা ভক্তি উদিত হয় না। এখানে 'বিনা' বলিতে (১) বিরোধ বা অপরাধ ও (২) অভাব। 'অভাব' বলিতে একেবারে রাহিত্য বুঝাইতে না-ও পারে। আকার আছে, তাৎপর্য নাই ; এই অর্থেও 'অভাব' শব্দের প্রয়োগ হয়। শ্রদ্ধার আর একটি লক্ষণ—জাগতিক সুখ-দুঃখে বিহ্বলতার অভাব।

ভগবৎ সুখানুসন্ধান লইয়া, সুখে-দুঃখে অবিহ্বল, অক্ষুব্ধ, অব্যাকুল বা অবিকৃত থাকিয়া তাঁহার ও তাঁহার দয়ার কথা স্মরণ করিতে হইবে। এটুকু না হইলে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হয় না। শ্রদ্ধাবানের কখনও ভগবৎসম্বন্ধি দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার প্রতি অনাদর হয়না। প্রথমে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভজন করিতে থাকিলেও, পরে বৈষ্ণব অপরাধ ফলে অশ্রদ্ধালু হইয়া পড়িলে, ভজন স্তব্ধ হইয়া যাইবে। পূর্ব-মহাজন-নির্দিষ্ট স্নানাদি ক্রিয়াও, নির্গুণভক্তি অর্চনেরই অন্তর্গত, সুতরাং নির্গুণভক্তি অর্চনের অনুকূল জানিয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি স্নানাদি সেই সকল বিধি আদরের সহিত পালন করেন। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা উদিত হইলে স্বর্গপ্রাপ্তিলিপ্সুর মত সিদ্ধিলাভ না করা পর্যন্ত, সেই ব্যক্তি সর্বক্ষণ ভগবৎপ্রিয় সাধু মহাজনের অনুবর্তন করিতে থাকেন। তাঁহার মনে কোনরূপ কুটিলতা বা প্রতিষ্ঠাশার লেশও থাকে না; বিশেষতঃ তিনি সর্বপ্রকার অপরাধ হইতে অত্যন্ত সতর্ক ও সাবধান থাকেন। শাস্ত্রে দেখা যায় যে, মহাভাগবত চিত্রকেতু নিজ স্বভাব আচ্ছন্ন রাখিয়া, মহাভাগবত-গুরু শ্রীশিবের স্বরূপ জানিলেন না, অনাদরই করিলেন, ফলে প্রতীপ অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করিতে হইল। তিনি সাধকের সতর্কতা-বিধানের জন্যই ইহা করিয়াছেন। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, মহাভাগবত চিত্রকেতু জ্ঞানপূর্বক নিজকে লুকাইয়াছেন। প্রারব্ধ কর্মফলে বা পাপ বশে যদি বিষয়-সম্বন্ধ হয়, তাহা হইলে শ্রদ্ধালু সাধক পরম দুঃখ ও অনুতাপভরে মনে করেন,—'নিশ্চয়ই ইষ্টদেব অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, নতুবা আমাকে এই বিষয় দিয়া বঞ্চনা করিলেন কেন?' তখন

তিনি মনকে এইরূপে গর্হণ করিতে থাকেন—'হে দুষ্ট মূঢ় মন! এই বিষয়সকল তোমার ইন্দ্রিয় সুখের জন্য নহে।' মহতের সঙ্গ কারতে করিতে সকল সময় সাবধান থাকিতে হইবে, যেন জড়ে আসক্তি বাড়িতে না থাকে। ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধান-স্মৃতি ও নিজ মনকে সর্বদা গর্হণ করিবার ইচ্ছা থাকিলে, বিষয়-সংস্পর্শ থাকিলেও বিষয় তাহাকে কিছু করিতে পারে না। 'অপি চেৎ সুদুরাচারো'—ইত্যাদি গীতা বাক্যে সগুণা লৌকিকী শ্রদ্ধার কথাই বলা হইয়াছে। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধায় পাপ-প্রবৃত্তি হয় না, দৈবাৎ হইলেও তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। লৌকিকী শ্রদ্ধায়ও বেশীক্ষণ পাপ-প্রবৃত্তি থাকে না, শীঘ্রই সদাচার আসিয়া যায় এবং শাস্ত্রীয় বা অনুক্ষণ বিষ্ণুস্মৃতিময়ী শ্রদ্ধা লাভ করিয়া ঐকান্তিকী ভক্তি বা শান্তি বা নিষ্ঠাতে পর্য্যবসিত হয়। লৌকিকী শ্রদ্ধাও ব্যর্থ নয়, কর্ম-জ্ঞান অপেক্ষা ইহা ভাল। দৈবাৎ বা মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু পাপকার্য ঘটিলেও লৌকিকী শ্রদ্ধা সত্ত্বগুণকে উদয় করায়, অর্থাৎ লৌকিকী শ্রদ্ধা কাহারও থাকিলে, তাহাকেও 'সাধু' বলা যাইবে, 'অসাধু' বলা হইবে না। দৈবাৎ-পাপ তাহার সাধুত্বের ব্যাঘাত করেনা। রজস্তমোগুণের দেবতাকে পূজা করিলে সত্ত্বগুণের উদয় হয় না। লৌকিকী শ্রদ্ধা পূর্ণা হইলেই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হয়। লৌকিকী শ্রদ্ধায় এই প্রকার বিচার হয়—এই কথাটা সত্য না মিথ্যা? তারপর বিচার করিয়া, মিথ্যাকে বর্জন করিয়া, সত্যকে দৃঢ়রূপে গ্রহণ করে। যখন এই বিচারটি সুষ্ঠুরূপে সিদ্ধ হয়, তখনই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হইল জানিতে হইবে।

এখন আর একটি বিষয়ের বিচার হইতেছে। শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে বলিলেন—(ভা, ১।৫।১৫) "আপনি যে মহাভারতে ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষকে 'পুরুষার্থ' বলিয়া স্থাপন করিলেন,—প্রীতি বা অকিঞ্চনা ভক্তির কোন ইঙ্গিতই দেন নাই, ইহা ভাল কাজ হয় নাই। একেই বদ্ধজীব নিসর্গতঃ ধর্মার্থ-কামেই আসক্ত, তারপর ধর্মশাস্ত্রকার মহাজনগণও যদি উহাই ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে পরে আর উহাকে উত্তম মহাজনগণ গর্হণ করিলেও তাহারা উহা শুনিবে না।" ভগবান্ শ্রীঅজিতও বলিয়াছেন—(ভা, ৬।৯।৪৭) "অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট কর্মের উপদেশ মোটেই করিবেন না ; রোগী কুপথ্য চাহিলেও সদ্‌বৈদ্য তাহাকে তাহা কখনই দেন না।" আবার অন্যদিকে গীতায় শ্রীভগবান্ (৩।২৬) বলিয়াছেন—"অজ্ঞ কর্মাসক্ত ব্যক্তির বুদ্ধিভেদ কখনও জন্মাইবে না। সে যাহা করিতেছে, তাহাই করিতে থাকুক।" এই দুইটি আপাতবিরোধী বাক্যের সামঞ্জস্য কি? শ্রীব্যাসদেবের প্রতি পূর্বে উল্লিখিত শ্রীনারদের ও শ্রীঅজিতের এই বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্যরূপ সামঞ্জস্য এই যে, যাঁহাদের শ্রীহরিকথায় কোনপ্রকার একটু রুচি বা ঝোঁক্ অর্থাৎ শ্রদ্ধায় সংস্কার দেখা যায়, তাঁহাদের নিকটও শ্রীহরিকথাই বলিতে হইবে ; তাঁহাদিগকে ধর্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষের উপদেশ দিয়া উহাতে প্ররোচিত করা বিপ্রলিপ্সা মাত্র। শ্রদ্ধাবানের জন্য কর্মের উপদেশ নহে। লৌকিক শ্রদ্ধাও যাহার হইয়াছে, তাহাকেও নীরাগবক্তা সাধারণতঃ কর্মের উপদেশ না দিয়া ভক্তির মাহাত্ম্য শুনাইবেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভক্তিমার্গে শ্রদ্ধা

যাহার উদিত হইয়াছে, কর্মের অধিকার তাহার আর নাই। শ্রীভক্তিবিনোদঠাকুর-কথিত "সম্বন্ধ জ্ঞান"কেই শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর ভাষায় 'শ্রদ্ধা' বলা যায়। যে অজ্ঞ তাহার ত সম্বন্ধ জ্ঞান নাই, সুতরাং তাহার শ্রদ্ধাও নাই। সভা-সমিতিতে নানা চিত্তবৃত্তিযুক্ত বহু লোকের সমাগম হয় দেখা যায়, তন্মধ্যে সকলে শ্রদ্ধালু নহে। সে ক্ষেত্রেই বা কি মীমাংসা? মীমাংসা এই যে, যদিও স্পষ্টভাবে কোন স্থলে শাস্ত্রীয় বা লৌকিক শ্রদ্ধা না-ও দেখা যায়, তথাপি সেস্থলে প্রাচীন বা প্রাক্তন জন্মে লব্ধ ভক্তিতে কোনরূপ বিশ্বাস-রূপ কিছু সংস্কার হইয়াছে অনুমান করিয়া, 'হরিকথা শ্রবণের ফলে তাহার শ্রদ্ধা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে পারে'—এইরূপ বিচার করিয়াই তাহার নিকট হরিকথা বলা যাইতে পারে। সভা-সমিতিতে কোন প্রকার শ্রদ্ধাযুক্ত বা শ্রদ্ধাভাসযুক্ত ব্যক্তিও থাকিতে পারেন,—এরূপ অনুমান করিয়াই তাঁহার উদ্দেশ্যে হরিকথা বলা যাইতে পারে। অনধিকারী অর্থাৎ শ্রদ্ধাভাস পর্যন্ত শূন্য পাঁচমেশালী জনসঙ্ঘে বা দলের নিকট কোন হরিকথা না বলাই উচিত। নতুবা অশ্রদ্দধানে হরিনামোপদেশরূপ নামাপরাধের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। অবশ্য প্রাচীন কোন শ্রদ্ধার বা বিশ্বাসের সংস্কার বা চিহ্ন অর্থাৎ সুপ্ত বা গুপ্ত ঝোঁক কাহার আছে বা নাই, তাহা সাধুই বুঝিতে পারেন।

কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—এই তিন প্রকার সাম্মুখ্যের অধিকারী নিজ নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা, তাহাই তাহাদের পক্ষে 'গুণ' বলা যায়। কর্মার্পণকে জ্ঞানের ও ভক্তির দ্বারস্বরূপ বলা হইলেও

উহাতে স্বার্থপরতা থাকায় ভক্তি ও জ্ঞান,—এই উভয় পথাবলম্বিগণই কর্মকে নিরাস করিয়াছেন। ভক্তি ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃত নির্বিশেষজ্ঞান পথও হেয়, অনুপাদেয় ও বিপদ্‌সঙ্কুল।

এইভাবে কর্ম, জ্ঞান প্রভৃতি ভক্তীতর যাবতীয় উপায় বা পথকে ক্রমে ক্রমে নিরাস করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত অকিঞ্চনা ভক্তিকেই সর্বোর্দ্ধসাম্মুখ্য (উপাসনা) রূপে স্থাপন করিলেন। অকিঞ্চনা ভক্তির মধ্যেও আবার বিধি অপেক্ষা রাগ-ভক্তিরই মাহাত্ম্য অধিক। যদিও বিধিভক্তি ও রাগভক্তি, উভয়ই ঐকান্তিকী ও অকিঞ্চনা ভক্তি, তথাপি বিধিভক্তির তুলনায় রাগভক্তির তীব্রতা, বেগশালিতা ও ঐকান্তিকতা বেশী। এই কথা দ্বারা বিধিভক্তি অপেক্ষা রাগভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও উৎকর্ষ দেখান হইল। যদিও বিধিভক্তি ও রাগভক্তি, উভয়েই শুদ্ধা বা অকিঞ্চনা ভক্তি, তথাপি রাগের তুলনায় বিধির ক্ষুদ্রতা ও দুর্বলতা আছে। রাগভক্তি জনিত আনন্দ পরতত্ত্ব-সুখ-সন্তোষবিধান বিষয়ক সমস্ত আনন্দকে অতিক্রম করিয়া বর্তমানা। বিধিভক্তির দ্বারা প্রাপ্য যে বৈকুণ্ঠ সাক্ষাৎকাররূপ পরমানন্দ, তাহাকেও অতিক্রম করেন—রাগভক্তির আনন্দ। সেইজন্যই রাগভক্তি পরমানন্দ বৈচিত্র্যস্বরূপা এবং শ্রেষ্ঠ ঐকান্তিক ভক্তগণের উহাতেই স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি। বিধিভক্তিতে—ইহা করা 'বিধি'—ইহা করা 'নিষেধ', বিধির অপালনে বা নিষেধের অনুষ্ঠানে প্রত্যবায় অনিবার্য সুতরাং তৎফলে ফললাভে সুদীর্ঘ বিলম্ব হয়—শাস্ত্রের এই যে শাসন বা লাঠিমারার ব্যাপার, ইহা রাগভক্তিতে একেবারেই অনুপযোগী। বিধিনিষেধ হইতে

উৎপন্ন যে গুণ-দোষ, উহাতে আবদ্ধ হইয়া বৈধভক্তগণ তৎকাল যাবৎ রাগের মাধুর্য অনুভব করিতে পারেন না, পরতত্ত্ববস্তুর প্রিয়ত্বানুভব তাঁহাদের তুলনাগত বিচারে কমই যতক্ষণ না সেই বিধিভক্তি রাগে বা ভাবে পর্যবসিত না হয়। স্বাভাবিক অনুরাগ বশতঃ প্রবৃত্তি, আর শাস্ত্রের লাঠির শাসনে পরিচালিত হইয়া প্রবৃত্ত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য ত নিশ্চয়ই থাকিবে।

বিধিভক্তের শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ দ্বারা চালিত হইবার যে প্রবৃত্তি, উহাই তাঁহাদের পক্ষে নিরুপাধিপ্রিয় পরতত্ত্বের মাধুর্যানুভবে বাধা দেয়। নিরপরাধে, সুষ্ঠুভাবে বিধিভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে শেষে রাগে পরিণত হয়। এই যে বিধি-নিষেধ বিচার বা গুণ-দোষ (ন্যায়-অন্যায় বা পুণ্য-পাপের) বিচার—প্রকৃতপক্ষে ইহাই 'দোষ'। গুণ-দোষ দর্শনই 'দোষ' বা 'কষায়'। উহাই প্রিয়ত্বানুভবের পক্ষে বাধাস্বরূপ, আর প্রিয়ত্বানুভবই প্রকৃতপক্ষে 'গুণ'। সুতরাং গুণ-দোষ-দর্শন-জনিত যে আপেক্ষিক তথাকথিত সদ্‌গুণ, তাহা রাগাশ্রিতভক্তের নাই বলিয়া, তিনিই পরম ঐকান্তিক ও পরম নির্গুণ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবা বিজয়ন্তেতমাম্।

৫ই চৈত্র, শনিবার,
১৩৫০ সন

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতাশ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণসাক্ষাৎকার যাহার ফল, এমন অকিঞ্চনা ভক্তি দূরে থাকুক, ভক্তির দ্বারস্বরূপ যে কর্মার্পণ, তাহার ফলেও জ্ঞানী বা ভক্তরূপ সাধুসঙ্গ লাভ হয়। সাধুসঙ্গ যেস্থলে, সেস্থলেই পরতত্ত্বের আবির্ভাব। আবার যেস্থলে কোনপ্রকার পরতত্ত্ব-প্রসঙ্গ বর্তমান, সেস্থলেই সাধু থাকেন। সাধুসঙ্গাভাস হইলেই কর্মী কর্মের ফল-কামনা ছাড়িয়া, সাক্ষাৎ উপাসনারূপ জ্ঞানে বা ভক্তিতে শ্রদ্ধা ও রুচিযুক্ত হয়। সাধুর সঙ্গ-কৃপা ব্যতীত পরতত্ত্বের সাক্ষাৎ উপাসনা বা সাম্মুখ্য লাভ করা যায় না। সাধু সঙ্গাভাস-ফলে সাক্ষাদ্ জ্ঞানের লক্ষণস্বরূপ নির্বেদ অথবা ভক্তির মূল শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস ও তৎপূর্বে যে পরতত্ত্ববস্তুর মাহাত্ম্যজ্ঞান, তাহার উদয় হয়। নির্বেদ হইলে জ্ঞানমার্গে ও মহিমজ্ঞান হইলে ভক্তিপথের অনুসরণে বিশ্বাস উদিত হয়। সাধুমুখে হরিকথা শুনিবার (এই শ্রবণটি—ভক্ত্যাভাস মাত্র) পর রুচি ও শ্রদ্ধা বা মহিমজ্ঞান লাভ হয়। সাধুগণ লোক-মঙ্গলের জন্যই জগতে ঘুরিয়া বেড়ান। জনার্দন—জন অর্থাৎ

অসাধু দুর্জন, তাহার অর্দনকারী, বিনাশক। অনাদি বহির্মুখতা ও তমোগুণজনিত হিংসা-অসূয়া হইতে জাত ভগবজ্জনের প্রতি অনিষ্ট চেষ্টাকে অর্দন বা বিনাশ করেন বলিয়া ভগবানের নাম—জনার্দন। সাধুর হাওয়া গায়ে লাগিলেই উন্মুখতার উদয় হইতে আরম্ভ হয়।

সাধুসমাগম যেস্থলে, সেখানেই পরতত্ত্বের স্ফূর্তি হয়। পিঙ্গলাও বলিয়াছেন—"সমগ্র মিথিলা বা বিদেহ রাজ্য—সাধুগণের দ্বারা পরিপূর্ণ, অথচ আমার কি মোহ! আমি এমন সাধুসঙ্গের সুযোগ পাইয়াও ভগবদ্‌ভজন করিলাম না!" যদি এরূপ দেখা যায় যে, সাধুসঙ্গ আপাত দৃষ্টিতে হয় নাই অথচ পরতত্ত্বে উন্মুখতা আছে, সেখানে বুঝিতে হইবে পূর্বজন্মে বা এ-জন্মে তাহার পরম্পরাক্রমে সাধুসঙ্গ হইয়াছে। আবার দুর্ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গ লাভ যাহার ঘটে না, তাহার পূর্বজন্মে বা এই জন্মে বা পরম্পরাক্রমে কোনপ্রকার দুরন্ত বৈষ্ণবাপরাধ আছে জানিতে হইবে। দেবগণের দেবর্ষি শ্রীনারদে সাধারণ মুনিজ্ঞানরূপ মর্ত্যবুদ্ধি ছিল বলিয়া তাহাদের নিয়মাগ্রহস্পৃহা যায় নাই। ভগবানের ও নিত্যসিদ্ধ পার্ষদের দর্শনমাত্রেই চিত্ত শুদ্ধ হয়। যেস্থলে অস্বচ্ছ হৃদয় থাকিয়া যায়, সেস্থলে দর্শনাভাস; তদ্দ্বারা স্বর্গাদি-সুখ লাভ হয়; বিষ্ণুর সন্তোষ হয় না বলিয়াই ভক্তি হয় না। দেবগণ দেবর্ষির কৃপা পায় নাই; কিন্তু নলকুবরমণিগ্রীব তাঁহার অনাদররূপ অপরাধ করিলেও তাহাদের প্রতি দেবর্ষির বিশেষ দয়া বর্ষিত হওয়ায় তাহারা শ্রীকৃষ্ণচরণকমল লাভ করিয়াছিল। দয়া করা বা না করা, সাধুর ইচ্ছা। সাধারণতঃ পাপ থাকিলেও

সাধু দয়া করেন ; কিন্তু অপরাধ থাকিলে প্রায়ই দয়া করেন না। অপরাধ যদি না থাকে, তবে সাধারণ বিষয়ী পাপী হউক না কেন প্রথম মুখে তাহার যত্ন, চেষ্টা ও অধ্যবসায় না থাকিলেও বা কোন প্রকার কিছু অনবধান থাকিলেও, সাধুসঙ্গাভাসেই মঙ্গললাভ শুরু হয়। শাস্ত্রের সাহায্যে অতন্নিরসন দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্মবিদ্যা, চেতনাচেতন বিশ্বের কৌশল দর্শনে অন্তর্যামিপুরুষ-নারায়ণোপাসনারূপা আত্মবিদ্যা আরোহ পথে কতকটা অনুভব করা যায় ; কিন্তু গুহ্যবিদ্যা যে ভক্তিযোগ, সেটি কেবল ভগবানের বা ভাগবতের কৃপাকে দ্বার করিয়াই অবতীর্ণ হন। ব্রহ্ম, পরমাত্ম ও ভগবল্লোকে যাহা অতীন্দ্রিয় চিচ্ছক্তি-বিলাস, তাহাই শুদ্ধসত্ত্ব ; তাহাকেই জড়েন্দ্রিয়াতীত 'গুহা' বলে। গুহাতে যিনি থাকেন, তাহাকেই 'গুহ্য' বলে। গীতায় ভক্তিকে রাজগুহ্যযোগ বলিয়াছেন।

প্রপঞ্চে সাধুর কৃপাকে অবলম্বন করিয়াই ভগবৎ কৃপা আসে, স্বতন্ত্রভাবে আসে না। দৈন্য-আর্তিতে হৃদয় যাহার যত বিগলিত হয়, সে তত ভগবৎ কৃপা পায়। সাধুর কৃপার পিছনে পিছনেই ইষ্টদেবের কৃপা আসে। অঙ্গিরার সঙ্গফলে চিত্রকেতু জ্ঞানী হইলেন, ব্রহ্মরূপ পরতত্ত্বের উপাসনা আরম্ভ হইল। প্রথমে তাঁহার জ্ঞান অঙ্কুর অবস্থায় দেখা গেল, পরে শ্রীনারদ-সঙ্গে স্পষ্টভাবে উদ্দীপিত অর্থাৎ প্রাদুর্ভূত হইল। তখন ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, সেই ভগবান্ সঙ্কর্ষণের দেখা পাইয়া তাঁহার মহাভক্ত হইলেন। জীবের দুরবস্থা দেখিলেই সাধুর দয়া হয় ; তাঁহারা দেবতার ন্যায় নিজ পূজার অপেক্ষা করেন না। সাধুসঙ্গের

অসাধারণ লক্ষণ এই যে, কোটি কোটি চেষ্টায় যে সকল চিত্তমল শোধিত হয় না, সাধুর কৃপা হইলে সেই লয়, বিক্ষেপ, কষায়, বিরসাস্বাদ ও অপ্রতিপত্তি প্রভৃতি অনর্থ সকল দূরীভূত হইয়া চিত্ত সংস্কৃত ও শোধিত হয়। সাধুকৃপাব্যতীত পরতত্ত্বের সাক্ষাৎ উপাসনা লাভ হয় না। সেই পরতত্ত্বটি—স্বরূপ লক্ষণে সত্য অর্থাৎ শাশ্বত, সনাতন, অদ্বিতীয় জ্ঞানময় বস্তু। তিনি বিশুদ্ধ মায়াতীত; তিনি এক—নানাত্ব নাই; তিনি অবহিরন্তঃ—দেহ-দেহী ভেদ নাই অর্থাৎ জীবাত্মার বা জীবাত্মার উপাধির পরস্পর ভেদের মত পরতত্ত্বে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদ নাই; তিনি ব্রহ্ম—পরিপূর্ণ, অখণ্ড, তিনি প্রত্যক্—বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নহেন, সহজ-ইন্দ্রিয়াতীত; তিনি প্রশান্ত—তাঁহাতে বিকার, পরিণাম, হ্রাসাদি নাই। এই পরতত্ত্ববস্তুকেই সিদ্ধ মহাত্মগণ 'বাসুদেব' বলেন; কেননা তিনি বিশুদ্ধ সত্ত্ব বসুদেবে আবির্ভূত। পূর্ণ, পরমপুরুষ বাসুদেবকেই এখানে "পরতত্ত্ব" শব্দে উদ্দেশ করিলেন; কেননা কান্তি ও অংশস্বরূপ ব্রহ্মও পরমাত্মা বাসুদেবের মধ্যেই আছেন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে,—পরতত্ত্ব জ্ঞানময় বস্তু, জীবও ত তাই, তবে কি জীব ও পরতত্ত্ব বস্তু এক?—না; পরতত্ত্ব ব্রহ্ম, জীব স্বরূপতঃ অণু-আনন্দ, পরমানন্দ-স্বরূপ নয় অর্থাৎ মুক্তাবস্থায়ও জীব বিশ্বের বা জগতের সৃষ্টি বা ধ্বংস করিতে পারে না। জীবাত্মার অণু আনন্দটি 'গৌণ' অর্থাৎ পরতত্ত্বের সচ্চিদানন্দস্বরূপের অধীন বা অনুগামী।

পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকারীই 'সাধু'। সাধারণ বৈদিক সদাচার-সম্পন্ন ব্যক্তিকে 'সাধু' বলা যাইবে না। সাধু দুই প্রকার—সৎ ও

মহৎ। সাধকাবস্থায় 'সৎ' বা সাধু এবং সিদ্ধাবস্থায় 'মহৎ' নামে কথিত হন। সৎ দুই প্রকার—জ্ঞানী ও ভক্ত। মহৎও উক্ত দুই প্রকার হন। **মহাভাগবত বা সিদ্ধপুরুষ**—ভক্তমহৎ— মূর্চ্ছিতকষায়, নির্ধূতকষায় ও পার্ষদতা-প্রাপ্ত ;—এই তিন প্রকার। 'মূর্চ্ছিতকষায়' ভক্তে প্রীতির প্রথম উদয়াবস্থা, 'নির্ধূত-কষায়' ভক্তে প্রেমের প্রকটোদয়াবস্থা। 'কষায়' অর্থাৎ ইতর কামনা-বাসনা থাকিলে ভগবদ্দর্শন ততটা পরিপূর্ণরূপে হয় না। নির্ধূতকষায়ের নিকট পরতত্ত্বের আবির্ভাব বেশী হয়। প্রেম সকলেরই সমান ; তবে মূর্চ্ছিতকষায়ের কেবল অবিরত উল্লাস, আর নির্ধূতকষায়ে ও পার্ষদে সেটির সঙ্গে আবার মমতাবোধ ইত্যাদি ক্রমেই বাড়িয়া চলে। পূর্ণতম আবির্ভাবের প্রতি তাঁহার ভক্তের যে প্রেম, অংশাবির্ভাবের প্রতি প্রেম ততটা হয় না। ভগবদাবির্ভাব-ভেদে, প্রেমের স্তরভেদে, (প্রেমের স্বরূপগত তারতম্য,—দাস্য ইত্যাদি, পরিমাণগত তারতম্য—রতি, প্রেম, প্রণয়, স্নেহ ইত্যাদি) সাক্ষাৎকারের ভেদ হয়। প্রিয়ত্বধর্মের অনুভব না হইলে, সেই সাক্ষাৎকারও অসাক্ষাৎকারের সমান। প্রীতির ধর্ম এই যে—যাঁহাকে ভালবাসা যায়, তিনি যেভাবে সুখী হন—অর্থাৎ নিজেকে সুখী বোধ করেন, ঠিক সেই ভাবেই তাঁহাকে সুখী দেখিতে বা সুখী মনে করিতে ইচ্ছা থাকিবেই এবং কিরূপে তিনি সুখী হইবেন—এই চিন্তাটি সর্বক্ষণই থাকে। প্রিয়জন চোখের সামনে থাকিলে তাঁহার স্মৃতি থাকে, আর তিনি চোখের সামনে না থাকিলে তাঁহার স্মৃতি থাকে না—ইহা এই জগতের রীতি বটে, কিন্তু প্রীতির পাত্র অর্থাৎ প্রিয়জন সংযোগে-বিয়োগে—

অনন্যভজন গুণে তিনি কেবল শরণাগত অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ। আবার যাহার মধ্যে উক্ত ২৭টি (সমস্ত) গুণ, আবার অনন্য-ভজনাসক্তিও দেখা যায়, তিনি 'পরম সত্তম'। সদাচার-সম্পন্ন অনন্যবিষ্ণুপাসককে 'সত্তর' ও অনন্যবিষ্ণুপাসকমাত্রকেই (সে 'সুদুরাচার'ও হইতে পারে) 'সৎ' বলা যায়। তবে এই দুরাচারযুক্ত সাধুটি সঙ্গ-যোগ্য নহেন।

এ পর্যন্ত বিধিমার্গের উপাসকদের কথা হইল। এখন রাগমার্গীয় ভজনকারীর কথা বলিতেছেন—"আমি যেরূপ তিনটি গুণবিশিষ্ট—অর্থাৎ (১) দেশ-কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, (২) সকল জীবাত্মার প্রিয় ও (৩) সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ—এই তিনটি জানিয়াই হউক বা না জানিয়াই হউক, আলম্বন অর্থাৎ প্রিয়জন যে আমি, আমাকে সিদ্ধ দাস্য-সখ্যাদি ভাবে অর্থাৎ অভিমানে অভিমানী হইয়া নিত্যসিদ্ধ ও আমার লীলা-পরিকর ভক্তগণ যে সুখবিধান করিতেছেন, আমিও তাহাতে যেভাবে সুখী হইতেছি, তাহার শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-পাদসেবনাদি-পরিপাটি কোন মহাজন-মুখে শ্রবণ করিয়া, যাঁহারা ঐ নিত্যসিদ্ধলীলাপরিকর ভক্তগণের অনুগতি লাভ করিবার জন্য লোভবিশিষ্ট হইয়া বিদ্যুদ্ গতিতে ছুটিয়া যান, তাঁহারাই 'ভক্ততম' সাধক। তাঁহারা ভাবের (সম্বন্ধময় আবেশের) সহিত ভজন করেন। রাগানুগা ভক্তি দুই প্রকার,—সম্বন্ধানুগা ও কামানুগা। দাস, সখা ও পিতামাতার সম্বন্ধানুগা ও প্রেয়সীগণের কামানুগা রতি। কামানুগায় জীবকে নারী ও ভগবান্‌কে কান্ত-অভিমান করায়। দ্বারকায় ঐশ্বর্যজ্ঞান প্রচুর আছে, মথুরায়

কিছুটা ঐশ্বর্যজ্ঞান, আর মাধুর্যানুভব প্রচুর, কিন্তু ব্রজে মোটেই ঐশ্বর্যজ্ঞান নাই।

এই যে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-মথুরা-গোকুলবাসকামী রাগমার্গীয় সাধক, ইঁহাদিগকেই 'ভক্ততম' বলা হইয়াছে। পূর্বোক্ত 'সত্তম' অপেক্ষাও এই রাগমার্গীয় ভক্তের স্বরূপাধিক্য বেশী।

প্রচেতোগণ এই রাগমার্গীয় দাস্যভাব বা দাস্যরতি ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করিয়াছেন; তাঁহারা বলিয়াছেন—"তোমার ও আমাদের সুখানুসন্ধান যেন আলাদা না থাকে, আমরা যেন তোমাকে সুখী দেখিতে পারি।" প্রচেতোগণ শান্তরসে উল্লাস লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া, দাসোচিত মমত্ববোধটুকু চাহিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবা বিজয়ন্তেতমাম্।

৬ই চৈত্র, রবিবার,
১৩৫০ সন

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতাশ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

সাক্ষাদুপাসনা দুই প্রকার,—সবিশেষ ও নির্বিশেষ। সবিশেষ উপাসনা দুই প্রকার,—অহংগ্রহোপাসনা ও ভক্তি। নির্বিশেষ

পথে রজস্তমোগুণ নিরস্ত হইয়া সত্ত্বগুণের উদয়ে অণু (জীব) চৈতন্যের উদয় হয়। তারপর অণু (জীব) চৈতন্যের সঙ্গে বিভুচৈতন্যের অভেদ ভাবনা করিতে করিতে বিভুচৈতন্য ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়। অভেদ ভাবনাকালে রজস্তমোগুণের সংস্পর্শ অর্থাৎ মায়ার বা জগতের সঙ্গ যতটা কম হইবে, ততই অধিকতররূপে সত্ত্বের উদয় হইয়া জীবাত্ম-সাক্ষাৎকার ও পরে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে থাকিবে, পরে অবিরত অভেদ ভাবনায় পূর্ণব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। উহাতে সবিশেষ পরতত্ত্ববস্তুর প্রিয়ত্বমাধুর্যাদি গুণের অনুভব হয় না। যদি ঐ ব্রহ্মজ্ঞানীর কোন ভক্ত-মহতের কৃপা-সঙ্গ লাভ হয়, তাহা হইলেই সবিশেষ-পরতত্ত্বভগবদ্‌গুন-বৈশিষ্ট্যের সাক্ষাৎকার লাভ হইতে পারে। জ্ঞানী দেহত্যাগমাত্র সদ্যোমুক্তি লাভ করে। যোগী যোগাভ্যাসদ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া ক্রমমুক্তিমার্গে প্রকৃতির অষ্ট আবরণ ভেদ করিয়া অবশেষে পরব্যোমে চতুর্ভুজ নারায়ণের প্রতি প্রেমলাভ করিতেও পারেন, কিন্তু সেটি যদি তাহার পছন্দ না হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে তবে তাহার ঈশ্বর-সাযুজ্য লাভ হয়। যম-নিয়ম, আসন, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই অষ্টাঙ্গযোগকে অবলম্বন করিয়া, ক্রমে বায়ুর ও আকাশের আশ্রয় করিয়া প্রকৃতির অষ্ট-আবরণাত্মক ব্রাহ্মণ্ডভেদ করিয়া যোগী ক্রমমুক্তি লাভ করে। ভক্তিরহিত জ্ঞানমার্গে অতন্নিরসন কার্যে পতনের আশঙ্কা খুব বেশী। যাহারা কৃষ্ণে সাযুজ্য লাভ করিয়াছে, সেই শিশুপালাদি আবার ব্রহ্ম-পরমাত্ম-সাযুজ্যপ্রাপ্ত জ্ঞানী ও যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সবিশেষ উপাসনান্তর্গত অহং-

গ্রহোপাসনায় নিরন্তর ঈশ্বরাভিমানরূপ অনুশীলন থাকিলেও উহা ভক্তি নয় ; তবে অহংগ্রহোপাসনাফলে সার্ষ্টি প্রভৃতি মুক্তিলাভ ঘটিতে পারে। নিরন্তর বিষ্ণুর সুখানুসন্ধান-মূলে শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তির অনুশীলনই শুদ্ধা ভক্তি।

কপট ভক্তিতে নিজ সুখানুসন্ধানরূপা স্বার্থপরতা ও দুরভিসন্ধি আছে। দম্ভ—ছলনা। ইষ্টদেবকে বঞ্চনা ও সঙ্গে সঙ্গে নিজকে বঞ্চনা করাই কুটিলতা বা দম্ভ। এটি ভক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। নিরন্তর স্মৃতির সহিত নববিধা ভক্তির যে কোন একটি বা দুই-তিনটি রুচি অনুসারে পালন করিলে শুদ্ধা অর্থাৎ কেবলা ভক্তি হয়। অতঃপর রাগানুগা ভক্তি বর্ণিত হইতেছে,—ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের যে সংস্পর্শ, তাহাকে 'সঙ্গ' বলে। এই সঙ্গ করিবার যে স্বাভাবিকী তৃষ্ণা, তাহাকে 'রাগ' বলে। নিরুপাধি প্রীতির পাত্রকে ভালবাসার জন্য চিত্তের যে উদ্দাম বেগ, তাহাকেই 'রাগ' বলা যায়। যে ভালবাসিবে ও যাহার জন্য ভালবাসা, এই দুইজনের লক্ষণের ভেদ-অনুসারে প্রীতিরও লক্ষণের ভিন্নতা হয়। প্রীতি—সাধন ও সিদ্ধ, উভয় অবস্থায় চিত্তের মসৃণতার তারতম্য সাধন করে। প্রাগবস্থা-শুদ্ধসত্ত্ব 'রতি' হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেমের পরাকাষ্ঠা পর্যন্ত উদয় করায়। রতির উদয়ে ভগবান্ কাহারও কান্ত, শান্ত জ্ঞানী-যোগীদের নিকট পরমাত্মা, পিতামাতার নিকট পুত্র, কাহারও সখা, কাহারও প্রভু, কাহারও বৈবাহিক ইত্যাদি অভিমানযুক্ত হন। এইভাবে ভগবান্ ও ভক্ত, উভয়কে অভিমান-যুক্ত করানই প্রীতির একটি অন্যতম লক্ষণ।

আবার যে জাতীয় প্রীতি বিশিষ্ট মহতের সঙ্গ করা যায়, সাধকের মধ্যেও রাগমার্গীয় ভজন সেই জাতীয় রতি ও অভিমানের উদয় করায়। প্রীতির ব্যাপারে জীবের কোন প্রভাবের কথা নাই।

অণুচৈতন্য বিভুচৈতন্যকে যে আনন্দ দেন, আবার বিভুচৈতন্য অণুচৈতন্যের নিকট হইতে যেভাবে সুখী হন, তার মধ্যে তটস্থের কোন কথা নাই। ভগবানের প্রতি ভক্তের যে ভাব, সেটির নামই 'প্রেম'। মোহিনীর প্রতি রুদ্রের যে ভাব, উহা 'কাম' মাত্র, রাগানুগাভক্তি নহে। প্রীতির পাত্র অর্থাৎ প্রিয়জন প্রীতিকারী সেবক 'আশ্রয়'কে বলেন,—"কি ভাবে আমাকে পাইতে চাও?"—এটি স্বাভাবিক। রাগানুগা ভক্তিতে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, বন্দন ও আত্মনিবেদন এই ষড়ঙ্গ থাকে। দাস্য ও সখ্য স্বাভাবিকভাবে থাকে বলিয়া ঐ দুইটির পৃথক্ উল্লেখ হয় নাই। রাগানুগা ভক্তিতে অর্চনরূপ পাদসেবনই থাকে, বিধিবহুল অর্চন রাগমার্গে থাকে না; যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় চতুর্ভুজেরই অর্চন শিক্ষা দিয়াছেন। চতুর্ভুজ মহাপুরুষেরই অর্চন হয়, আর দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণের অর্চনরূপ পাদসেবনই হয়। শ্রীকৃষ্ণ একাদশ স্কন্ধে নিজের দ্বিভুজ বিগ্রহের অর্চনের কথা বলেন নাই; অন্যান্য সব কথা বলিয়াছেন। কৃষ্ণ-লোকে অর্চন নাই, সে ধামে রাগ-প্রীতিই দৃষ্ট হয়। অর্চনে উপাস্যের পরমৈশ্বর্য ও উপাসকের পরমবশ্য বোধরূপ ভয়-সঙ্কোচ আছে। কৃষ্ণপ্রীতিতে সেটি নাই। বিধিভক্তিতে অর্চন যেমন প্রধান, রাগমার্গে পরিচর্যা বা পাদসেবনই প্রধান। কলিযুগে কীর্তনাখ্যা ভক্তি প্রধান, এটি মোটামুটি কথা। এই কীর্তনও

নিরন্তর স্মৃতিময়ী। রাগমার্গে আবেশের সহিত কীর্তন স্বয়ংই হয়। পূর্বোক্ত ছয়টি অঙ্গই রাগানুগা ভক্তির পরিপাটি বা সুষ্ঠু প্রণালী ; ইহা বাহিরে প্রকাশ পায়। নিত্যসিদ্ধের যে ছয় প্রকার ভক্তি-পরিপাটি—সেটি রাগাত্মিকা ; কেননা গঙ্গার তরঙ্গও গঙ্গাই। এই ছয় প্রকার ভক্তিই রাগাত্মিকা ভক্তির পরিপাটি। ইহারা রাগাত্মিকা ভক্তির শোভা বর্দ্ধন করে,—কখনও তাহা হইতে এই ছয়টিকে পৃথক্ করা যায় না।

এখন রাগানুগা ভক্তির কথা বলিতেছেন,—নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ যেরূপ প্রীতির দ্বারা বিভিন্ন সম্বন্ধে অভিমানযুক্ত হইয়াছেন, ভগবান্‌কেও অভিমানযুক্ত করাইতেছেন, নানা প্রকার সেবা পরিপাটিদ্বারা ভগবান্‌কে সুখী দেখিতেছেন, অসাধারণ ভাগ্যবশে যিনি সেই প্রকার রতি প্রদর্শনকারী গুরুমুখ হইতে বা শাস্ত্রমুখ হইতে সেই পরিপাটির কথা শ্রবণ করেন, তখন প্রথমতঃ তাঁহার স্বয়ংসিদ্ধ রাগ বা প্রীতির উদয় না হইলেও, অথবা সম্বন্ধবিশেষের অভিমান না জন্মিলেও, নিত্যসিদ্ধপরিকরের প্রীতির আভাসের দ্বারা,—রাগরূপ জ্যোৎস্নার আভাসে স্ফটিক-মণির ন্যায় হৃদয়টি ক্রমশঃ আলোকিত ও উল্লসিত হয়; নিত্যসিদ্ধ-পরিকরের সেবা-পরিপাটিতে রুচি অর্থাৎ ‘আমিও কবে এইরূপ পরিপাটিক্রমে নিরুপাধি প্রীতির পাত্র স্বীয় অভীষ্টদেবকে এইভাবে সুখী করিব’—এই প্রকার উদ্দাম লালসা জন্মে।

অধিকাংশ স্থলে ভক্তমহতের শ্রীমুখবিগলিত রাগভক্তির অমৃতময়ী বাণী নিষ্ঠা সহকারে শ্রবণ করিতে করিতে সহজেই, রাগের প্রতি স্বাভাবিকী রুচি উদিত হয়। এই সাধনের নামই

রাগানুগা ভক্তি সাধন। ইহাকে 'অবিহিতা' ভক্তি বলে। বৈধী ভক্তিতে শাস্ত্র শাসনের প্রয়োজন; কিন্তু এখানে স্বাভাবিক স্মৃতিময় আবেশ থাকে বলিয়া শাস্ত্র-শাসনের ততটা প্রয়োজন হয় না। এই রাসানুগায় প্রবৃত্তি বা রুচিটি তৃষ্ণা হইতেই আসে। ভক্তি করিতে গেলে শাস্ত্র শাসনের বাধ্যতা দরকারই হইবে,—এমন কোন কথা নাই। শ্রীশুকদেবাদি পরমহংসগণ, যাঁহারা বিধিনিষেধের অতীত, তাঁহারাও কেবলা-ভক্তি করিয়াছেন। শ্রীহরির সৌন্দর্য-মাধুর্যাদি তাঁহারা বর্ণনা করেন। তাঁহারা স্বভাবতঃই কি আইন ভঙ্গ করেন যে, শাসনের দরকার? তৃষ্ণা যেখানে স্বাভাবিকী, সেখানে শাসন দরকার হয় না। শাস্ত্র-শাসন দ্বারা প্রবর্তিত ভক্তির গতিটি দুর্বলা, কিন্তু এই স্বাভাবিকী ভক্তির গতিটি খুবই প্রবলা। প্রীতির পাত্রকে সুখী দেখাই রাগানুগা-ভক্তির স্বভাব, তাহার জন্য শাসনের দরকার নাই।

'অভিরুচিই'—এই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ; তটস্থ লক্ষণ—নিরুপাধি প্রীতির পাত্র ভগবান্ ও তৎসম্বন্ধি বস্তুব্যতীত অন্য বস্তুতে অর্থাৎ মায়া, জগৎ, নিজসুখানুসন্ধান, উগ্রতা, ভয়, হিংসা, বিরোধ, আলস্য—এইগুলিতে অনভিরুচি। এই তৃষ্ণা ও বিতৃষ্ণা যুগপৎ থাকিবে। এই তৃষ্ণা বা রুচি সর্বক্ষণ বাড়িতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিষয়প্রীতি একেবারেই চলিয়া যাইতে থাকে। প্রজল্পাদিতে তখন মতি থাকে না। প্রায় অধিকাংশ স্থলে রাগভজনটি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই উদিত হয়।

শ্রীনারায়ণের প্রতি রাগ হইলেও তাহা অপূর্ণ ও অস্পষ্ট হয়। রাগানুগীয় দাস্য, সখ্য এবং বিধিমার্গীয় দাস্য-সখ্যে প্রভেদ আছে।

রাগে স্বাভাবিকী রুচি ও বিধিতে শাস্ত্র-শাসন-বাধ্যতা—এই ভেদ। বিধিমার্গের প্রণালী যদি রাগমার্গে সুষ্ঠু অনুষ্ঠিত না-ও হয়, তাহা হইলেও রাগানুগাভক্তি কখনও অবৈধী হইবে না। রাগভক্তগণ যে পরিপাটি অবলম্বন করিয়া ইষ্টদেবকে সুখী দেখেন, রাগানুগ-গণ সেই প্রণালীকেই আশ্রয় করিবেন। বিধি ভক্তির প্রণালীকে আদর বা অনাদর কিছুই দেখাইবেন না। "সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্"—ইত্যাদি শ্লোকে বিধিধর্মকে আঘাত দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবাত্মার স্বাভাবিক স্বামী। রক্ত-মাংসধারী জড়দেহবিশিষ্ট জীব ঔপাধিক স্বামী মাত্র। চরু, মন্ত্র, আহুতি প্রভৃতি কৃত্রিম উপায়ে ঔপাধিক স্বামী লাভ হয়, আর কৃষ্ণ স্বাভাবিকভাবেই স্বামী। ঔপাধিক স্বামীর দ্বারা জড় নশ্বর সুখ পাওয়া যায়। ঐ সুখ নরকেও পাওয়া যায়। ঐ সুখ মাংসের মধ্যে আবদ্ধ, উহা বিষয়াবিষ্ট, দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট চঞ্চল মনেরই ধর্ম ; আত্মায় সে সুখের সংস্পর্শ নাই। 'আত্মা' শব্দে উল্লিখিত শ্লোকে পরম প্রিয়তম স্বামী শ্রীকৃষ্ণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণে পতিত্বমনন অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক হইলেও পিঙ্গলা বলিতেছেন,—"আজ আমি আত্মসমর্পণরূপ মূল্য দিয়া, কন্যা যেমন বিবাহরূপ মূল্য দিয়া পতিকে ক্রয় করে, সেইরূপ পরম মনোহররূপ আমার চিত্তচোর শ্রীহরির সঙ্গে (লক্ষ্মী যেমন লক্ষ্মীনাথের সঙ্গে বিহার করেন) লক্ষ্মীর অনুগতা হইয়া আমিও বিহার করিয়া, সেই তাঁহাকে সেবনের দ্বারা সুখী করিব।" লক্ষ্মীনাথের প্রতি লক্ষ্মীর যে রাগ, তাহার প্রতি পিঙ্গলার স্বাভাবিকী রুচি এখানে দেখানো হইল। এই আবেশ বা রুচিটি

সর্বদা কায়মনোবাক্যের দ্বারা সর্বত্র আনুগত্যময়ী—ইহাই প্রধান বৈশিষ্ট্য। "সন্তুষ্টা শ্রদ্দধত্যেতদ" ইত্যাদি শ্লোকে পিঙ্গলা বলিয়াছেন,—**"মনের দ্বারা বিহার করিব।" রাগমার্গ মনঃপ্রধান** অর্থাৎ যে মনের সংস্কার সাধিত হইয়াছে, অর্থাৎ 'সাফ্' বা নির্মল হইয়াছে, সেই মনই বা হৃদয়ই এই রাগমার্গীয় ভজনের প্রধান উপকরণ। ভগবদ্‌বিষয়ে তৃষ্ণা আর ইতর বিষয়ে ঔদাসীন্য বা বিতৃষ্ণাই রাগের প্রধান লক্ষণ। যাঁহারা মধুর-রতির আশ্রিত ভক্তগণের আনুগত্যে লোভবিশিষ্ট সাধক, কান্তারূপে যাঁহারা ভগবান্‌কে ভজন করিতে লালসাযুক্ত, তাঁহারা মানস-ভজন করিবেন, 'স্মরণ-নিষ্ঠ' হইবেন। আবেশ বা স্মরণই প্রধান, কীর্তনও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিবে। মনের বা হৃদয়ের ধর্ম যে আবেশ, লালসা বা রুচি, সেটি বাদ দিয়া কীর্তন হইবে না। রাগানুগা ভক্তিতে হৃদয় দিয়াই ভজন সঙ্গত; তাই বলিয়া শ্রীবিগ্রহকে নিজ জড় শরীরের দ্বারা কান্তার ন্যায় চুম্বন-আলিঙ্গনাদি করিলে অপরাধ বা দৌরাত্ম্য হইবে, তাহা কখনও করিতে নাই। আনুগত্যময় স্মরণ বা আবেশ ব্যতীত প্রতিমাদিতে রাগাত্মিকের ন্যায় ব্যবহার করিলে উহা সাধকভক্তের পক্ষে ঔদ্ধত্য হইবে। বস্তুসিদ্ধিতে ঐরূপ ব্যবহার হইতে পারে, অসিদ্ধ সাধক শরীরে তাহা হইবে না। যে প্রহ্লাদ সাধনসিদ্ধকালে নিত্যসিদ্ধগণের অনুসরণ করিয়াছেন, তিনিও নিত্যসিদ্ধ প্রহ্লাদের সহিত মিলিত হইতে চাহিয়াছেন,—"উপনয় মাং নিজভৃত্য-পার্শ্বম্"—এই বাক্য-দ্বারা। তাঁহার এই সামীপ্যাকাঙ্ক্ষার মধ্যেও "পার্ষদগণ যেভাবে তোমাকে সেবা করিয়া সুখী করেন,

আমিও তোমাকে সেই পরিপাটির সঙ্গে সেবা করিয়া সুখী দেখিতে চাই”—এই ভাবটি আছে। প্রহ্লাদের এটি মমতাযুক্ত অনুগ্রাহ্যাভিমান বা দাস্যরতি। আবার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার দাসগণের যেমন অনুরাগ, অবশ্য শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের অনুরাগ ততটা নয়।

ভগবদ্‌বস্তুর আবির্ভাব-তারতম্য ও প্রীতির তারতম্যই ইহার কারণ। সাধকভক্ত কখনও নিত্যসিদ্ধমূল আশ্রয়বিগ্রহের অভিন্নরূপে নিজেকে ধ্যান করিবেন না। বাৎসল্য রতির উদয়ে ভক্ত নিজেকে মূল আশ্রয়বিগ্রহগণের আনুগত্যে ভগবানের মাতৃ-পিতৃবৎ ও ভগবান্‌কে নিজের সন্তানবৎ ধ্যান করিবেন। তাহা না হইলে ‘আমিই ঈশ্বর’—এইরূপ অহংগ্রহোপাসনার ন্যায় “আমি ভগবানের নিত্যসিদ্ধপরিকর বা আশ্রয়-বিগ্রহরূপা স্বরূপশক্তি”—এইরূপ ভাবনাও অহংগ্রহোপাসনার মতই অপরাধময়ী। যাঁহারা নিত্যসিদ্ধভক্তের অনুসরণে রাগানুগা ভক্তি যাজন করেন, তাঁহাদিগকেও আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি; সুতরাং যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মিকভক্ত, তাঁহাদের সম্বন্ধে ত’ কথাই নাই; আমি তাঁহাদের উচ্ছিষ্টভোজী নিত্যদাসানুদাস হইয়া তাঁহাদের অনুবর্তন করি।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবা বিজয়ন্তেতমাম্

২রা শ্রাবণ, মঙ্গলবার,
বঙ্গাব্দ ১৩৫১।

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

যথার্থ জ্ঞানের নামই 'প্রমা'। যাহা-দ্বারা যথার্থ বস্তু-জ্ঞান লাভ হয়, তাহাকেই 'প্রমাণ' বলে।

'বেদ' শব্দে বিদ্ ধাতুর অর্থ কেবল জানা নয়, পরন্তু অনুভব করা। সেই বেদই পরতত্ত্ব-বিষয়ে প্রমাণ। বেদ শব্দাত্মক পরতত্ত্ব বলিয়া পরতত্ত্বকে একমাত্র বেদই জানাইতে পারেন। বেদের শিরোভাগ বা সারভাগ উপনিষদ্। সমগ্র উপনিষদ্ শাস্ত্রের সার সত্যটি জগদ্‌গুরু শ্রীবেদব্যাস সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। আবার সেই সূত্রের অর্থ বুঝিবার পক্ষে ভ্রম হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া, সূত্রকার নিজেই ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুপাদ এই শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন করিয়াই প্রথম চারিটি সন্দর্ভে 'সম্বন্ধিতত্ত্ব', পঞ্চম সন্দর্ভে 'অভিধেয়তত্ত্ব' ও সর্বশেষ ষষ্ঠ সন্দর্ভটিতে 'প্রয়োজনতত্ত্ব' কীর্তন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল জীব প্রভুর শ্রীগুরুদেব শ্রীল রূপ গোস্বামি-প্রভুপাদ ও তাঁহার শ্রীগুরুদেব শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুপাদ যথাক্রমে প্রয়াগে ও কাশীতে দশাশ্বমেধঘাটে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখ হইতে যে বেদ-সার, শ্রীভাগবত-সার-শিক্ষা শ্রবণ করিয়াছিলেন, কলিহত দুর্গত জীবের জন্য অহৈতুক করুণাময় শ্রীশ্রীল জীবপ্রভু তাহাই সন্দর্ভাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাঁহাকে না পাওয়া পর্যন্ত সমস্ত পাইয়াও দুঃখ দূর হয় না, অথচ যাঁহাকে পাইলে সমস্ত দুঃখ নিঃশেষে দূরীভূত হইয়া চরম ও পরম সুখপ্রাপ্তি হয়, তাঁহার সন্ধান দিতে যাইয়া শ্রীমদ্ভাগবত "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোক কীর্তন করিয়াছেন। অদ্বিতীয় জ্ঞানময় বস্তুকেই চরম বস্তু বলে। তিনি নিজস্ব স্বতন্ত্রতা 'জাহির' করিতে পারেন, অন্যের অধীন হন না, সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে পারেন, তিনিই সব জানেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে, মাপিতে বা প্রকাশ করিতে পারে না; তিনি স্বতঃপ্রকাশ —জ্ঞানস্বরূপ। তাঁহার তিনটি প্রকাশ—(১) ব্রহ্ম—অজ্ঞেয় বা দুর্জ্ঞেয় নির্বিশেষ আবির্ভাব। **'বিশেষ'**—(যাহা এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুকে তফাৎ করে অর্থাৎ শক্তি, ধর্ম বা গুণ বা স্বভাব) তাহাতে স্পষ্টভাবে প্রকাশমান নহে। যাঁহাকে ধরা-ছোঁয়া যায়, যাঁহার সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করা যায়, **'বিশেষ'** অর্থাৎ শক্তি বা গুণ যাঁহার আছে, তিনি সগুণ (সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণ-যুক্ত নহেন), সধর্মক ও সবিশেষ। তাঁহার দ্বিবিধাবির্ভাব,—(২) পরমাত্মা ও (৩) ভগবান্। একই পরতত্ত্ববস্তুর এই ত্রিবিধ আবির্ভাব বা প্রকাশভেদ। উপাসকের চিত্তবৃত্তির

বিভিন্নতা ও অবস্থানগত পার্থক্য-অনুসারে এই সংজ্ঞা বা নামভেদ হয়।

পরতত্ত্ববস্তু—পূর্ণ, সনাতন ও পরমানন্দ অর্থাৎ সৎ, চিৎ ও আনন্দ—এই তিনটি পরতত্ত্ববস্তুর স্বরূপলক্ষণ। জ্ঞানদ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়। পরমাত্মা—(অন্তর্যামী বা পুরুষ বা নারায়ণ বা ঈশ্বর) জীবশক্তি ও মায়াশক্তি—এই দুইটি শক্তিকে পরিচালনা করেন। পরমাত্মাকে গীতায় 'অধিযজ্ঞ' (ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ) ও 'অধিদৈবত' (গর্ভোদশায়ী নারায়ণ) বলিয়াছেন। সমগ্র জীব বা তটস্থশক্তির নিয়ামক যে হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মা, যিনি জগৎসৃষ্টিকর্তা বৈরাজব্রহ্মা হইতে ভিন্ন, 'অধিদৈবত' পরমাত্মা শ্রীগর্ভোদশায়ী নারায়ণ সেই হিরণ্যগর্ভেরও জনক-নিয়ামক। পরতত্ত্বের পূর্ণতম আবির্ভাব ভগবান্ কেবল স্বরূপ-শক্তিকেই লইয়া থাকেন। ভগবান্ ও তাঁহার স্বরূপশক্তি বহ্নি ও বহ্নির দহনশক্তির ন্যায় অভিন্ন। স্বরূপশক্তিকে পরতত্ত্ব-বস্তুর নিজস্ব ধর্ম বা গুণ বা বস্তুর পরিচায়ক বলা যায়।

স্বরূপ শক্তির তিনটি প্রভাব,—(১) **সন্ধিনী**—(প্রকাশ বা ব্যক্ত করে), (২) **সম্বিৎ**—(জানায়) ও (৩) **হ্লাদিনী**—(আনন্দ দেয়)। সৎ বা সন্ধিনী—বস্তুর বিচিত্রতা অর্থাৎ ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা, ধাম ও পরিকরগণকে প্রকাশ করে। সম্বিৎ—পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ও অভিমানের উদয় এবং অনুভব করায়। হ্লাদিনী—আনন্দ দান করে। এই তিনটি প্রভাবময়ী স্বরূপ-শক্তিকে লইয়াই ভগবদ্‌বিগ্রহ অর্থাৎ বিষ্ণু, নারায়ণ বা কৃষ্ণ নিত্য বর্তমান। ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যেও আবার গুণ-তারতম্য আছে।

পরমাত্মা—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়প্রধান বা বিশ্বের ও অণুচৈতন্যের উপর প্রভুত্ব করেন।

তিনি সর্বব্যাপক ও অন্তর্যামী। ভগবান্ কিন্তু নিত্যকালই কেবল স্বরূপশক্তির সঙ্গে বিহার করেন। পরতত্ত্ববস্তু সচ্চিদানন্দ ও অদ্বিতীয় জ্ঞানময় হইলেও সর্বোত্তম বিশেষধর্ম যে প্রিয়ত্বধর্ম, এটিই তাঁহার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য-সূচক ধর্ম বা গুণ; যেহেতু—পরতত্ত্ববস্তুটি সকলের ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে হইয়াও, দুর্লভ হইতে দুর্লভতম হইয়াও যদি আবার সুলভ হইতে সুলভতম হইয়া যান, আপনার প্রিয়তমজনরূপে যদি তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর গুণ আর নাই। তিনি নিজে ভালবাসেন, ভালবাসা চান, ভালবাসার বশীভূত হইয়া যান,—এই কেবল নিরুপাধি প্রীত্যাস্পদত্বই অর্থাৎ তাঁহার প্রেমময়স্বভাব, প্রেমময় গঠনই সর্বশ্রেষ্ঠ চমৎকারিতা। এই গুণটি পরতত্ত্বের যে আবির্ভাবের মধ্যে যত বেশী, তাঁহার শ্রেষ্ঠতাও অন্যান্য আবির্ভাব হইতে তত বেশী। তাঁহার ঐশ্বর্যের সীমা নাই, ঔদার্য ও মাধুর্য আবার সেই ঐশ্বর্যকে 'ছাপাইয়া' উঠে।

ঔদার্য—অর্থাৎ সাধককে তিনি স্বীয় ভালবাসার যোগ্য করিয়া তুলিয়া, আত্মদানরূপ মহাবদান্যতা প্রকাশ করেন।

মাধুর্য—উপাসককে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া নিজের অধীন করেন; আবার নিজেও তাঁহার অধীন হইয়া, পরস্পর নব-নবায়মানভাবে সুখী হ'ন। স্বীয় হ্লাদিনীশক্তি-দ্বারাই নিজে অধীন হইয়া, অপরকে অধীন করেন, এই স্বভাবটি তাঁহার প্রিয়ত্বধর্ম বা ভালবাসা। এটি যে ভগবদাবির্ভাবের মধ্যে যত

বেশী, সেই ভগবৎস্বরূপের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ধাম ও পরিকরও তত বেশী চমৎকারিতাময়।

সৌন্দর্য ও মাধুর্যের মূর্তি যে হ্লাদিনীশক্তি, তাঁহার দ্বারা আলিঙ্গিত, তাঁহার বশীভূত শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীর কৃষ্ণ বা শ্রীমান্ কৃষ্ণই ভগবত্তার চরম পরাকাষ্ঠা। এই যে দুইটি স্ত্রী-পুরুষ-রূপ, ইঁহারা নিত্যকাল লীলাবিলাসে মত্ত। ইঁহাদেরই বিকৃত প্রতিফলন এই প্রপঞ্চে অনাদি-পরতত্ত্ব-বিস্মৃতি-জনিত ভোক্তৃ-অভিমানযুক্ত প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষ-জাতীয় অবিদ্যাগ্রস্ত জীব।

নির্বিশেষ ব্রহ্মই পরম-চরম আকরস্বরূপে—পরমানন্দময় পরাকাষ্ঠাবির্ভাবে সর্বাংশী পূর্ণতম সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই পর-পুরুষ। হ্লাদিনী শক্তিটি মূর্তি ধরিয়া নিজের সম্পূর্ণ প্রভাব-বিলাস যে ভগবদাবির্ভাব-বিশেষে প্রকাশ করেন, সেই সর্বাকর্ষক, হ্লাদিনীসমাশ্লিষ্ট, রসরাজ রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই জ্ঞানীর নিকট নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যোগীর নিকট মায়ার ও জীবের নিয়ন্তা পরমাত্মা 'অন্তর্যামী' 'নারায়ণ' 'পুরুষ' বা 'ঈশ্বর'। তিনিই "রসো বৈ সঃ",-রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" অর্থাৎ রসস্বরূপ হইয়াও রসকে অর্থাৎ হ্লাদিনী-সহিত রসস্বরূপ নিজেকে উপভোগ করিয়া আনন্দিত হন। তিনিই মূর্তিমান্ শৃঙ্গার অর্থাৎ রসরাজ উজ্জ্বল-নীলমণি। তিনি বলপূর্বক সকলকে আকর্ষণ করিয়া মাতাল করেন, আবার নিজেও মাতাল হন। তিনিই অনঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গ-অঙ্গী-ভেদ তাঁহার নাই। আগাগোড়া—পূরাপূরিই তিনি শৃঙ্গারস্বরূপ—"শৃঙ্গারঃ সখি মূর্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি।" তিনি রসের সমুদ্র; সেই রস-সমুদ্রে তাঁহার

শ্রীরূপ-বিগ্রহে আকাশচুম্বী তরঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র বীচি পর্যন্ত অনন্ত লীলা-বৈচিত্র্য নিত্যকাল প্রকাশমান হইতেছে। মহাভাব-রূপা হ্লাদিনীশক্তির সহিত রসরাজের এই অনন্ত বৈচিত্রীপূর্ণ খেলা নিত্যকাল চলিতেছে।

সমস্ত বেদশাস্ত্রের নিগূঢ়তম রহস্য,—যাঁহার কোনরূপ উদ্দেশ-নির্দেশ এ'জগতের লোক কোন যুগে কোন আকর হইতে পায় নাই, সেই রহস্যের মুদ্রা উদ্ঘাটন করিয়া, স্বয়ং রসরাজ হইয়াও মহাভাবের ভাব ও কান্তি চুরি করিয়া উজ্জ্বল-নীলমণি আসিয়াছিলেন ঔদার্যের খনি হইয়া, নিজ নাম-প্রেমামৃত বিতরণ করিবার জন্য।

বারটি রসের মধ্যে শৃঙ্গারই সর্বশ্রেষ্ঠ রস। রস-বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্লেষণে ইহাই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে, উজ্জ্বল রসের বর্ণ—শ্যাম। তিনি কামদেব বা অনঙ্গ বা পুষ্পবাণ। 'বিদ্মহে' ক্রিয়ার কর্ম যে কামদেব, তিনিই শ্রীমদ্ভাগবতের 'বেদ্য' বস্তু। 'বেদ্য'—অনুভব-যোগ্য ; নিরুপাধিপ্রীতির পাত্র। তিনি মদনমোহনরূপে শ্রীচরণ-মধুদ্বারা, গোবিন্দরূপে বদন-মধুদ্বারা ও গোপীনাথরূপে বক্ষো মধু-দ্বারা মাতোয়াল করেন। তাঁহারও মত্ততাবিধানকারিণী তাঁহারই দ্বিতীয়স্বরূপ যে হ্লাদিনীশক্তি, তাঁহাকে অধীন ও মত্ত করাইয়া, আবার নিজেও তাঁহার অধীন হইয়া যান। উপাস্য ও উপাসক উভয়ে উভয়কে আকৃষ্ট করেন এবং উভয়ে উভয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হন,—হ্লাদিনীশক্তির দ্বারা। এই চিল্লীলা-মিথুনের মৈথুনই বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব। ইহারই বিকৃত প্রতিফলনরূপে আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত পরতত্ত্ব-বিস্মৃতিজনিত যে ভোক্তৃ-অভিমান, তাহাই অণু-চৈতন্য জীবের সংসার-বন্ধনের মূল কারণ।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে—'সত্যং পরং ধীমহি'—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করি, নির্বিশেষ ব্রহ্মকে নয়। 'ধীমহি'—শব্দে সংবেদ্য (সম্বেদ্য) শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার বা প্রীতির পাত্র রূপে তাঁহাকে আবেশময় ধ্যান করা বা তাঁহার অধীন হইয়া যাওয়া, তাঁহাকে ভালবাসা।

ধ্যান—নিরবচ্ছিন্ন আবেশ বা অভিনিবেশময়ী স্মৃতি। মহাভাব বা হ্লাদিনীশক্তির আনুগত্যে, প্রীতির পাত্রের সুখের অবিরোধে, তাঁহাকে পাইবার ইচ্ছামূলে যে সেবা-সুখময়ী স্মৃতি হয়, তাহাকেই এই শ্লোকে 'ধ্যান' বলা হইয়াছে। এই 'ধ্যান'—'কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং'—ইত্যাদি শ্লোকে নির্দিষ্ট মুক্তি-প্রাপক বিধি-মূলক 'ধ্যান' নয়। 'শিবদ'—প্রেমসুখদ, অর্থাৎ প্রেমসুখই তাঁহার স্বরূপ বলিয়া তিনি আত্মদ অর্থাৎ সুখস্বরূপ নিজকে নিজে বিলাইয়া দেন ; ফলে আনুসঙ্গিকভাবে আত্যন্তিকরূপে দুঃখমোচন হয় অর্থাৎ তাপত্রয়ের সমূলে উন্মূলন হইয়া যায়। সম্বন্ধি-বস্তুকে পাইয়া আমাদের কৃত্য কি ?—উপাসনা। অনাদিকাল হইতে জীব পরতত্ত্ববস্তুকে না জানিবার দরুন, জীবের এই বিমুখতার ছিদ্র লইয়া পরতত্ত্ববস্তুর ছায়া বা মায়া তাহার বন্ধনের কারণ, তাহার সকল দুঃখের মূল যে জড়প্রধান, তাহার সহিত আত্মবোধ জন্মাইয়া, ত্রিতাপ-দুঃখ দিতেছে। বিষ্ণু মূলপ্রযোজক কর্তা হইলেও জীবের বহির্মুখতার জন্যই তাহার এই শাস্তি। বর্তমানে তাহার প্রথম কৃত্য—'ঘাড় ফিরানো'। নিজে কর্তা না হইয়াও বদ্ধজীব কর্তৃত্বাভিমানে ফলকামনা লইয়া যে কর্ম করিতেছে, উহাই তাহার বন্ধনের কারণ। যাহা বন্ধনের কারণ, তাহাই

আবার মোচনের কারণ হইতে পারে না ; সুতরাং 'নৈষ্কর্ম্য'-লাভ দরকার। 'ঘাড় ফিরানোই' হইল—কর্মার্পণ। কর্মের ফলটা নিজে নিজে আত্মসাৎ না করার নাম—কর্মার্পণ। এই ফল-কামনা-ত্যাগকেই উপাসনার পূর্বাভাস বলা হয়। ঘাড়-মুখ ফিরাইবার পর সামনে চাওয়াকে সাক্ষাৎ সাম্মুখ্য বা প্রকৃত উপাসনা বলা যায়। শাস্ত্র এই উপাসনার কথাই উপদেশ করেন। 'শিষ্যতে অনেন ইতি শাস্ত্রম্।' পরতত্ত্বই নিজ অচিন্ত্যশক্তিবলে অপ্রাকৃত শব্দাবতাররূপে প্রকট হইয়া নিজের কথাই নিজে বলেন। সৌভাগ্যবান্ জীবই সেই শাস্ত্র শ্রবণ করে।

সৌভাগ্যবান্—(১) পূর্বজন্মজনিত সুকৃতিক্রমে সংস্কার-প্রাপ্ত।

(২) মহতের কৃপাতিশয্যপ্রাপ্ত।

দুর্ভাগা—রজস্তমোগুণে আচ্ছন্ন। রজোগুণ—নানা জড়-কাম পূরণার্থ বিক্ষিপ্ত চিত্ততা ; তমোগুণ—লয়াত্মক হিংসা, কুটিলতা ও নিদ্রা।

দুর্ভাগা চারি প্রকার—(ক) বিষয়ী, (খ) অবজ্ঞাকারী, (গ) অরুচিপরায়ণ ও (ঘ) বিদ্বেষী। অরুচি—ভীতিময়ী।

অভিধেয়-যাজনের ফলেই প্রয়োজন-প্রাপ্তি হয়। প্রয়োজন—পরতত্ত্বকে জানা অর্থাৎ অনুভব ; অর্থাৎ ভিতরে বাহিরে সাক্ষাৎকার-লাভ বা ভালবাসা। যদিও এই পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার বদ্ধ বা তটস্থদশায় অবস্থিত অনুচিৎ-এর পক্ষে সম্ভব নয়, তথাপি তাদাত্ম্যাপন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থাৎ সাধুমহতের কৃপা-সঙ্গের দ্বারা, হ্লাদিনীর কৃপাশক্তি-প্রভাব সৌভাগ্যবন্ত উপাসকের যে ইন্দ্রিয়ে

অবতরণ করিয়াছে, সেই হ্লাদিনী-প্রভাবান্বিত সেবোন্মুখ—অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়-দ্বারাই পরতত্ত্ববস্তুর সাক্ষাৎকার-লাভ হয়।

যে শক্তি দ্বারা পরতত্ত্বকে ভালবাসা যায় এবং তাঁহার দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া যায়, যে শক্তি পরতত্ত্ব ও জীব, উভয়কে 'দেহলী-প্রদীপ'-ন্যায়-অনুসারে সুখী করেন, সেই শক্তির প্রধান ও প্রথম ধর্ম—করুণা। জীবের এমন কোন সাধ্য নাই যে, সে পরতত্ত্ব-বস্তুকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পায়; তথাপি সাধুর বা মহতের মধ্য দিয়া অর্থাৎ সাধুর বা মহতের আকারে সেই হ্লাদিনীশক্তির প্রকাশ-প্রভাব আসিয়া জীবকে পরতত্ত্বের সহিত যোগযুক্ত করিয়া দেন। হ্লাদিনী-শক্তির কৃপাক্রমেই হ্লাদিনীর সঙ্গে তাদাত্ম্যাপন্ন অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় ভগবানকে সুখী করিতে পারে। হ্লাদিনী-শক্তির যে কাজ—পরতত্ত্ব শ্রীভগবান্‌কে সুখী দেখা, তাহা তখন সেই সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে নামিয়া আসে। বস্তু যখন নিজেকে ভাল করিয়া ধরা ছোঁয়া দিতেছেন, তাঁহার পরিচয় পাইবার সুযোগ করিয়া দিতেছেন, তখনই তাঁহাকে 'বাস্তব' বা 'শক্তিমান্' বস্তু বলা যায়। সেই পরতত্ত্ব বস্তুটি কেবল স্বরূপানন্দ নহেন, পরন্তু স্বরূপ-শক্ত্যানন্দী অর্থাৎ তাঁহাতে নিত্যকাল পরম আনন্দ-বিলাস-বৈচিত্রী আছে।

বস্তুর আনন্দিনী-শক্তি যখন বস্তুকে পরিচয় করাইয়া দেন, তখনই তিনি বাস্তব বস্তু; তখন আর তিনি অসুলভ নহেন—পরম দুর্লভ হইয়াও পরম সুলভ হন। বস্তুর বিশেষণ—'বাস্তব।'

তিনি শক্তি-দ্বারা অন্বিত বা যোগযুক্ত থাকেন। 'বাস্তব' শব্দটি এখানে উপলক্ষণ নয়, বিশেষণ। আবার তিনি কেবল

'সত্যং' নহেন, তিনি 'পরং'। সত্য বস্তুর সর্বশ্রেষ্ঠ আবির্ভাব বা চূড়ান্তরূপ—শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহাকেই দেখিতে পাওয়া অর্থাৎ ভালবাসা, অর্থাৎ বশীভূত করাই চরম-পরম প্রয়োজন। অণুচৈতন্যরূপ ঝিনুকের মধ্যেও যিনি রসামৃত সমুদ্রকে আনিতে পারেন, তিনি হ্লাদিনী-সার মহাভাবের মূর্তি এবং তাহাই তাঁহার অসমোর্দ্ধ চমৎকারময় বৈশিষ্ট্য, গুণ বা ধর্ম বা স্বভাব। তিনি রসরাজকে নাচান। সেই মহাভাব-সমন্বিত রসরাজই উজ্জ্বল-নীলমণি শ্যাম। জীবাত্মা অণু হইয়াও প্রেমলাভ ফলে বিভুত্ব-ধর্ম লাভ করিয়া নিত্যকাল সেই উজ্জ্বল-রসরাজের আস্বাদনকেই প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করিতে থাকেন। প্রেম জিনিষটি অসমোর্দ্ধ চমৎকারিতাময় মহাসমুদ্র। তাহা বিভু (সর্বব্যাপক) হইয়াও নিয়ত বর্ধমান, গৌরবযুক্ত হইয়াও গৌরবরহিত—এরূপ বহুবিরুদ্ধধর্মবিশিষ্ট। এই 'আত্মরসের' জন্ম যে 'পরাৎ'—'শ্রীকৃষ্ণরূপ হইতে' তিনিই লীলা আস্বাদন-কামনায় নিত্যকাল নারী ও পুরুষ—এই দুই মূর্তি ধরিয়া, রসস্বরূপ হইয়া বিহার করিতেছেন। 'রসরাজই' নারীরূপে 'মহাভাব', আবার মহাভাবই 'রসরাজ' (পুরুষরূপে) হইয়া আত্মরস বা উজ্জ্বল রসের সন্ধান দিতেছেন। ইঁহার প্রাপ্তিই উপাসকের সমস্ত প্রয়োজনের পরাকাষ্ঠা। উজ্জ্বল-রসের মাধুর্যানুভবের মধ্যেই মোক্ষাদি সমস্ত প্রয়োজন এবং নিরন্তর প্রীতিময়ী, স্মৃতিময়ী ধ্যান বা আবেশের মধ্যেই নৈষ্কর্ম্য বা কর্মার্পণ, জ্ঞান বা যোগাদি সমস্ত অভিধেয়; আর শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবদাদি সমস্ত পরতত্ত্বাবির্ভাব অন্তর্ভুক্তরূপে আছেন। 'ভগবতঃ পরাকাষ্ঠা স্বরূপস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ইদম্'—ইতি ভাগবতম্।

সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ নবম পদার্থ মুক্তির আশ্রয় বা চরম গতি শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছেন ; এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতই সর্বপ্রমাণ-চক্রবর্তি-চূড়ামণি।

সেই শ্রীমদ্ভাগবতরূপেই আবার রসরাজ—মহাভাবের সহিত সম্মিলিতরূপে শ্রীধাম-মায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বে সেই রস বিতরণ করিয়াছেন। সেই রসে নিমগ্ন হইয়াছেন যে সাধু, সেই সাধুর আনুগত্য-হাওয়া কোন ক্রমে গায়ে লাগিলে তবেই সেই রসের সন্ধান পাওয়া যায়, নতুবা নহে।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্‌-গোবিন্দদেবা বিজয়ন্তেতমাম্।

৩রা শ্রাবণ, বুধবার,
বঙ্গাব্দ ১৩৫১।

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

'এতে চাংশকলাঃ' ইত্যাদি শ্লোকে স্বয়ং ভগবত্তার কথা বলা হইয়াছে। ইহাকে 'পরিভাষা' 'উপমর্দন-বাক্য' বা 'সাবধারণা'-শ্রুতি বলে ; কারণ এই বাক্যটি পরতত্ত্ব-সম্বন্ধি সমস্ত বাদকে নিয়মিত করে। পরতত্ত্ববস্তুর সাক্ষাৎকার হইলে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি হইবে। পরতত্ত্ব সনাতন অর্থাৎ নিত্য,

অখণ্ড অর্থাৎ পূর্ণ ও পরমানন্দ, অর্থাৎ সৎ, চিৎ ও আনন্দ। পরতত্ত্ব বস্তুর সাক্ষাৎকার বা অনুভবও পরমানন্দ। পরতত্ত্বের আনন্দ দুই প্রকার,—স্বরূপানন্দ ও স্বরূপশক্ত্যানন্দ। আবার পরতত্ত্বের শ্রীভগবদাবির্ভাবেই স্বরূপ শক্ত্যানন্দের বা পরম-আনন্দ-বিলাস-বৈচিত্রীরই শ্রেষ্ঠতা বেশী। পরতত্ত্ব বস্তুটি কেবল বাস্তব-বস্তু নহেন ; পরন্তু 'শিবদ।' স্বরূপানন্দ অপেক্ষা স্বরূপ-শক্ত্যানন্দেই পরম আনন্দ-বিলাস-বৈচিত্রী বা পরম আনন্দের প্রকাশ-বৈচিত্র্য বেশী বর্তমান। তিনি যদি সুখময় বা আনন্দময় স্বরূপ না হইতেন, তাহা হইলে জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির আর উপায় থাকিত না। 'বদন্তি তত্ত্তত্ববিদস্তত্ত্বং' শ্লোকে আনন্দ বিশেষ বৈচিত্র্যময় পরতত্ত্বের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। তিনি ভালবাসেন, ভালবাসা চান ও ভালবাসার বশীভূত হইয়া যান। তিনি নিরুপাধি-প্রীতির পাত্র অর্থাৎ সকল স্থান, কাল, পাত্র ও অবস্থাতেই কেন তিনি ভালবাসার জিনিষ, সকলে কেন তাঁহাকে ভালবাসিয়া সুখী দেখিতে চাহে—ইহার কোন কারণ নাই। এজন্য সেই শ্রীভগবানের প্রতিই এই প্রীতি পূর্ণভাবে থাকে, অন্য কোন উদ্দেশ্যের দ্বারা খণ্ডিত বা আবৃত হয় না। ব্রহ্ম অপেক্ষা পরমাত্মা, তদপেক্ষা ভগবান্, তাহার মধ্যে আবার শ্রীকর্তৃক আলিঙ্গিত, শ্রীর বশীভূত কৃষ্ণই ভগবত্তার বা সম্বন্ধিতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা। কিভাবে তাঁহাকে পাওয়া যায় ?—উপাসনার দ্বারাই পাওয়া যায়। 'উপাসনা' অর্থে অনাদি বহির্মুখতার বিপরীত সাম্মুখ্য-ক্রিয়া অর্থাৎ মুখ ফিরানো। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্মুখ্যের অর্থাৎ শ্রীভগবানের সামনের দিকে তাকানোর নামই ভক্তি। ভক্তি

কি ? কায়মনোবাক্যে ইষ্ট, অভীষ্ট বা প্রাপ্য বস্তুর সুখানুসন্ধানপূর্বক অর্থাৎ সুখ-সন্তোষকরী চিন্তা লইয়া শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধাভক্তি। সুখানুসন্ধান না থাকিলে আকারে ভক্তি অর্থাৎ অভিনয় হইতে পারে বটে, কিন্তু সেটি নিরুপাধিক হয় না। ভক্তি নিরুপাধিকী, অহৈতুকী ও অব্যবহিতা।

"আমি ভক্ত্যঙ্গের যে কোন একটি অনুষ্ঠান করিলে আমার ইষ্টবস্তুর সুখ হইবে"—এই চিন্তা করিয়াই অর্থাৎ তাঁহার চরণ-কমলে মনটি নিবিষ্ট করিয়াই ভক্ত্যঙ্গ সাধন করিতে হইবে। ইষ্টদেবের সুখবিধান-চিন্তাহীনতা সর্বাপেক্ষা গুরুতম অভক্তির লক্ষণ। সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি না থাকিলে ফল পাইতে অর্থাৎ ভজনোন্নতিক্রমে প্রেমলাভে বহু বিলম্ব হইবে। অপরাধী ব্যক্তির ইষ্টদেবের সুখ-সন্তোষ-বিধানের চিন্তা থাকে না।

দশ প্রকার নামাপরাধী ; অশ্রদ্ধালু বা কুটিল ; চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা জ্ঞানেন্দ্রিয় জিহ্বা ও ত্বক্-দ্বারা নিজ-ভোগ্যবস্তু-আহরণে মত্ত, কর্মেন্দ্রিয় জিহ্বা-দ্বারা বৃথা বাক্যব্যয়কারী ও মন-দ্বারা নিজ ইন্দ্রিয়-সুখকর ভোগ্যবিষয়ের চিন্তাপরায়ণ, ভজনে শিথিলতাযুক্ত (জাগতিক, দৈহিক বা সাংসারিক সুখ-দুঃখে উল্লাস বা বিষাদই শিথিলতার লক্ষণ), দাম্ভিক অর্থাৎ কপটী, গর্বিত বা অহঙ্কারী অর্থাৎ ক্রিয়াদক্ষতার জন্য শ্লাঘাপরায়ণ—ইহারাই 'অপরাধী'। 'আমি পরতত্ত্বের দাস'—ইহাই শুদ্ধ অহঙ্কার। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরতত্ত্বের নিরন্তর ধ্যানই অচ্যুতাত্মতা বা ব্রাহ্মণতার লক্ষণ। বস্তুর আকৃতি, প্রকৃতি বা স্বভাবই তাহার স্বরূপ-লক্ষণ। আর বস্তুর নিজস্ব বিশেষ বা অসাধারণ কার্যদ্বারা পরিচয়ই তটস্থ বা

অনন্যাপেক্ষ বা অন্যনিরপেক্ষ লক্ষণ। সমুদ্রাভিগামিনী গঙ্গার একটানা স্রোতের মত স্বীয় অভীষ্টদেবের নিরন্তর ও নিরবচ্ছিন্ন সুখানুসন্ধানময়ী ধ্রুবানুস্মৃতিই ভক্তির তটস্থলক্ষণ। তাহার বিশেষত্ব এই যে, তদ্দ্বারা কর্মার্পণ, জ্ঞান ও যোগের ফল মোক্ষ ত' পাওয়া যায়ই, তাহা অপেক্ষাও পরম চমৎকারময় সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবদাবির্ভাবের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর, সেবা ও প্রেম (ভগবৎ-সাক্ষাৎকার ও মাধুর্যানুভব) পর্যন্ত লাভ হয়। এই প্রেমলাভেই প্রয়োজনের পূর্ণতা।

সর্বাদৌ ঘাড় ফিরানোই—কর্মার্পণ ; জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি—এই তিনটিই সাক্ষাৎ মুখ ফিরানো বা সান্মুখ্য হইলেও ইহাদের মধ্যে কেবলা, অকিঞ্চনা বা ঐকান্তিকী ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা।

ভক্তির স্বরূপলক্ষণ বা আকৃতি ও তটস্থলক্ষণ—নিরবচ্ছিন্ন সুখানুসন্ধানময়ী নববিধা ভক্তি। তলবকার-উপনিষদে 'তদ্বন-মুপাসীতব্যম্', ছান্দোগ্যে 'শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে' ইত্যাদি মন্ত্রে মদনমোহন, গোবিন্দ, গোপীনাথের সেবার ইঙ্গিত আছে। জড় ইন্দ্রিয়গুলি বস্তুগ্রহণের ক্ষমতা কোথায় পাইল ?—মূল-আকর বিভুচেতন ব্রহ্মবস্তু পরমাত্মা হইতেই পাইয়াছে,—এই সংবাদ তলবকার বলিয়াছেন। রসের সমঝ্দারী স্বভাবটি ব্রহ্ম বা পরমাত্মায় নাই ; সর্ব ভগবদাবির্ভাব-পরাকাষ্ঠা শ্রীর কৃষ্ণেই পূর্ণমাত্রায় আছে।

ঈশ্বর, পুরুষ, নারায়ণ, পরমাত্মা বা অন্তর্যামী—ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে। তাঁহাকে বেদ 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ'—ইত্যাদি 'পুরুষ-সূক্তে' স্তব করিয়াছেন। রাজার সঙ্গে যদি প্রজার দেখাশুনা,

কথাবার্তা বা আদর-আপ্যায়ন অর্থাৎ স্নেহ-পূজার পরিচয়-আদান-প্রদানাদি না হয়, তাহা হইলে যেমন রাজা-প্রজা সম্পর্কের কোন সার্থকতা থাকে না, সেই প্রকার পরমাত্মা জীবের অন্তর্যামী ও নিয়ামক হইলেও তাহাতে জীবের বিশেষ কোন স্পষ্ট ও সম্যক্ লাভ বা উপকার নাই। শৃঙ্গার-রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ কেবল নিজে আস্বাদন করেন না। তিনি রসিকশেখরও বটে, আবার পরম-করুণও বটে। তিনি এক স্বরূপে রস আস্বাদন করেন, আবার এক স্বরূপে তাহা বিতরণ করেন। ঐ যে হ্লাদিনী শক্তি, যিনি শ্রীকৃষ্ণকে সুখ আস্বাদন করান, তিনি আবার ভাবেন, 'একোঽহং বহু স্যাম্'—অর্থাৎ বহুরূপ বিস্তার করিয়া যদি শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করানো যায়, তাহা হইলেই চমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা হয়। সমুদ্রে আবার যদি রঙ্, শব্দ ও নানা-বীচি-তরঙ্গ-বৈচিত্র্য উদিত হয়, তাহা হইলেই তাহার গৌরব-গাম্ভীর্য বেশী বাড়ে। সেটি দুর্ল্ভ, সকলে পায় না। পাওয়া যায়, কেবল নিরবচ্ছিন্ন সুখানুসন্ধানময়ী নববিধা ভক্তিদ্বারা ; শরণাগতিদ্বারা ও সাধুসঙ্গ-দ্বারা ;—অর্থাৎ সেই সুখানুসন্ধানে পরমাবিষ্ট, শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিমান্ সাধুর পরাঙ্গ-ভক্তিরূপ সঙ্গের দ্বারা অর্থাৎ প্রসঙ্গ ও পরিচর্যা-দ্বারা অর্থাৎ কাণের দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা ও কায়িক সেবার দ্বারা। ইহাকেই বলে 'শুশ্রূষা'। ইহার মধ্যে নিজেন্দ্রিয়-সুখমূলক পশুবৎ ক্রিয়াকলাপ নাই।

এই ভক্তি দুই প্রকার—বৈধী ও রাগানুগা। বৈধী—ধীরগতি ; রাগে আবেশ বা নিরন্তর-রুচিময়ী সম্বন্ধযুক্তা সুখানুসন্ধানস্মৃতি বেশী থাকে বলিয়া, তাহার গতি দ্রুতবেগময়ী।

পরমসৌভাগ্যক্রমে উপাসকের অপ্রাকৃত দ্বারকাবাসী, মথুরাবাসী, ব্রজবাসী কেবল ঐকান্তিক ভজননিরত সাধুর আনুগত্য-লাভ হইলেই পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম বর্ণনীয় বস্তুর দর্শন বা প্রেম-সেবা-সৌভাগ্য লাভ হয়। নিরন্তর আবেশ বড়ই দুর্লভ। 'ধীমহি'-শব্দে এই আবেশের কথা বলিয়াছেন। ভর্গোদেব, পুষ্পবাণ বা 'সত্যং পরং'কে 'ধীমহি'—আমরা ধ্যান করি। ইষ্টদেবের সুখকে সর্বোত্তম আদর্শ জ্ঞান করিয়া, তাঁহার আনুকূল্যময়ী যত্ন-প্রচেষ্টা অর্থাৎ ইষ্টদেবের সেবা ইষ্টদেব যেভাবে চান', সেইভাবে তাঁহাকে সুখী করিবার ধ্যানই 'ধীমহি'-শব্দের উদ্দেশ্য বা অর্থ। ধ্যানের পূর্বাঙ্গটি—'ইতি পুংসাপতা বিষ্ণৌ' ইত্যাদি বচনান্তর্গত 'অর্পিতা'-শব্দের বাচ্য ; 'অর্পিতা'-অর্থে 'ভাবিতা' অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর সুখ-সন্তোষ-বিধানের নিমিত্ত বা উদ্দেশ্যে স্মরণ ও ধারণা। ঐ স্মরণ ব্যতীত কখনও কোথাও শুদ্ধভক্তি থাকে না। সাধনভক্তির পরাঙ্গে ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধি থাকে। শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের পর সর্বক্ষণ তাঁহার সুখানুসন্ধান থাকা দরকার। কোন্ গুরুদেবের ?—ইষ্টদেবের প্রিয়তম যিনি, তাঁহারই কায়মনোবাক্যে নিষ্কপটভাবে অনুগত হইয়া অর্থাৎ গুর্বাত্ম-দৈবত হইয়া ইষ্টদেবের অনুকূল সুখানুসন্ধান বা অনুবর্তন থাকিবে। গুরুদেব ইষ্টদেবের প্রতি যে অভিমান করেন, শিষ্যেরও সিদ্ধিলাভে সেই অভিমান প্রকাশিত হয় ; আবার ভগবান্ শ্রীগুরুদেবকে যে সম্বন্ধে অভিমান করেন, সিদ্ধিপ্রাপ্তিতে শিষ্যকেও ভগবান্ সেই সম্বন্ধে অভিমান করেন।

ধ্রুবানুস্মৃতি—নৈষ্ঠিকী ভক্তি অর্থাৎ ইষ্টদেব যেভাবে সুখী হইবেন, সেইভাবে তাঁহাকে পাইবার ইচ্ছা। আবেশ বা রাগে

ধ্রুবানুস্মৃতিময়ী এই নিষ্ঠা বা ঐকান্তিকতা প্রচুর। শ্রীমদ্ভাগবতে 'আবেশ', 'রাগ', 'ভাব'—এই শব্দগুলির প্রচুর প্রয়োগ আছে।

'ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ'—শ্লোকে অভিধেয়ের কথা আছে। ভয়—ভববন্ধন ; ইষ্টদেবকে 'পর' বলিয়া চিন্তা, তাঁহার প্রতি ভালবাসার অভাব, ইহাও একপ্রকার হিংসা-বিশেষ। ভাল না বাসাই মূল অনর্থ। বহির্মুখ মানবজাতি সর্বতোভাবে মনটাকে 'দ্বিতীয়' বস্তুতে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। ইষ্টদেব ছাড়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যত বস্তু, তাহাই 'দ্বিতীয়' বা 'মায়া'। ইষ্টদেবের সহিত সম্পর্করহিত দৃশ্য বা ভোগ্যবস্তুই পরতত্ত্বেতর বস্তু। উহাতে মনঃসংযোগই-ইন্দ্রিয়-সুখ বা বন্ধন, ভয়, শোক জন্মায়। উহাতে পরতত্ত্ব-বিষয়িনী প্রীতি নাই। উহাকে 'মায়া', 'প্রধান', 'প্রকৃতি', 'জড়জগৎ' বা 'বিশ্ব' বলে। মায়া সেই জড়প্রধানে মনের বিলাস জন্মায় অর্থাৎ ইষ্টদেব ব্যতীত অন্যবস্তুর চিন্তা করে ; ফলে মায়া ইষ্টদেবের সুখবিধান ভুলাইয়া বিস্মৃতি আনিয়া দেয়। ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধান ছাড়িয়া দিবার ফলেই অনাদিবহির্মুখ জীবের বিস্মৃতি আসিয়াছে। এখন তাঁহাকে কি করিয়া লাভ হইবে ?—'একয়া ভক্ত্যা।' 'একয়া'—আবেশের সহিত, অর্থাৎ অব্যভিচারিণী নৈরন্তর্যময়ীভাবে। 'ভক্ত্যা'—নববিধ ভক্ত্যঙ্গ-দ্বারা। গুরুদেবতাত্মা হইয়া অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ও প্রিয়তম দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া তাঁহার কাছে নাম-মন্ত্র-দীক্ষা ও ইষ্টদেবের সহিত নিজ সিদ্ধ পরিচয়-সম্বন্ধ এবং ভজনশিক্ষা লাভ করিতে হইবে। শ্রীগুরুই 'দেবতা' অর্থাৎ ঈশ্বর, 'আত্মা' অর্থাৎ প্রেষ্ঠ যাঁহার, তিনিই গুরুদেবতাত্মা।

প্রয়োজন—পরতত্ত্ববস্তুটি নির্মল ও নিরুপাধি পাত্র। তিনি রসিক। তাঁহারই মত নির্মল ও শুদ্ধ না হইলে তাঁহার প্রাপ্তি ঘটে না, অতএব তাঁহার প্রিয়জনের আনুগত্যে নিরপরাধে নিরন্তর ঐকান্তিক ভজন-ফলে শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া, তাঁহার মাধুর্য-রসের আস্বাদনই 'কৈবল্য'। ইহার মধ্যে অন্য কোন বাসনার বা ফলাভিসন্ধির লেশমাত্রও নাই। তাঁহাকে পাইবার উপায়—ঐকান্তিকতা বা তন্নিষ্ঠতা অর্থাৎ নিরন্তর সুখানুসন্ধানময় আবেশ।

সম্বন্ধি-বস্তুর লক্ষণ—ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণ। 'আত্মা'-শব্দে কেবল সকল আত্মার আত্মা 'পরমাত্মা' নহেন, পরন্তু 'প্রিয়', তিনিই হরি। তিনিই নির্বিশেষ ব্রহ্ম, তিনিই যোগি-ধ্যেয় পরমাত্মা, আবার তিনি সর্বপাপহর, সর্বচিত্তচৌর হরি। শ্রীহরিই স্বীয় বেণু, রূপ, লীলা, প্রেমিকভক্ত—এই চারিটির মাধুর্য-দ্বারা সর্বহারী, আবার আত্মপর্যন্ত সর্বস্বদাতা। এই প্রীতি কেবল উল্লাসময়ী নয়, ইহাতে মমত্ববোধও আছে। সেই মমতা সাধককে ক্রমে ক্রমে বিগলিত করায়, কুটিলগতিতে চলে, বিশ্বাসযুক্ত করায়, আসক্ত করায়, নব নব ভাবে অনুভব করায় ও উন্মত্ত করায়। প্রীতির বৈচিত্র্যকেই 'শাবল্য' বলে।

শ্রীগৌরসুন্দরই 'শবল'। মহাভাবের বর্ণ—গৌর ও শৃঙ্গারের বর্ণ—শ্যাম। চিল্লীলা-মিথুন-রসরাজ ও মহাভাব—পরস্পর নিত্যকাল সংযোগ ও বিয়োগ, উভয় অবস্থাতেই অষ্টপ্রকার মৈথুন-রত। কেবল নিজে আস্বাদন করেন না, নিজের সৌন্দর্য, সৌকুমার্য, সৌস্বর্য, সৌস্বাদ্য ও সৌরভ্যদ্বারা আশ্রিতগণকে বশীভূত ও প্রমত্ত করান, আবার নিজেও বশীভূত হইয়া যান। ধুশু তাহাই নয়;

সেই রস বিলাইতেও আসেন। কাহাদের নিকট? তটস্থ-শক্তিজাত বহির্মুখ, সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিক প্রকৃতিবিশিষ্ট, পাপী, পাষণ্ডী—যাহাদের কোনকালে আশাভরসা নাই,—তাহাদেরই নিকট ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-রূপে অবতীর্ণ হইয়া সেই রস-স্বরূপ নিজেকে বিতরণ করেন,—ঝিনুকের মধ্যে সিন্ধু দিয়া দেন। কেবল যে নিত্যসিদ্ধগণকেই তিনি আকৃষ্ট করেন, তাহা নহে। লীলাপুরুষোত্তম ও তাঁহার মোহিনী বা নন্দিনী শক্তি, এই দুই-এ মিলিয়া নিত্যকাল শৃঙ্গার-রস পুষ্ট করিতেছেন; আবার তাঁহারাই দুইজন 'এক' হইয়া সেই পরমদুর্লভ রস আপামরে আচণ্ডালে বিতরণ করেন। শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেবের মধ্যে,—শ্বেতে—সমস্ত বর্ণ মিশ্রিত আছে। আর শ্রীগৌরে চমৎকারিতা-বিচিত্রতা বেশী। প্রীতির চরম পরিপাকে 'বিষয়' 'আশ্রয়' হন, আর 'আশ্রয়'ও 'বিষয়' হন,—'স্ত্রী' 'পুরুষ' হন, 'পুরুষ' 'স্ত্রী' হইয়া যান, ইহাকেই প্রেমবিলাস-বিবর্ত বলে। তখন রমণ-রমণীর ভাব বা রমণী রমণের ভাব অর্থাৎ পৃথক্ অভিমান থাকে না। এটি পরম চমৎকারিতা ও পরম-চমৎকারময় অবাঙ্মনসোগোচর অবস্থা। রসরাজের আনুগত্যেই মহাভাবকে এবং মহাভাবের আনুগত্যেই রসরাজকে পাওয়া যায়।

শবলা-সমাশ্লিষ্ট শ্যাম ও শ্যাম-সমাশ্লিষ্ট শবলার সন্ধান সর্ব বেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতই দিয়াছেন। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ভগবান্, তিনিই শৃঙ্গার, কামদেব, পুষ্পবাণ ও অনঙ্গ। প্রাকৃত অনঙ্গ বা কাম—মনসিজ অর্থাৎ মনেই জন্মে; উহাকে দেখা যায় না, কিন্তু অপ্রাকৃত কামদেব অনঙ্গও বটে, আবার

ভূষণ-ভূষণাঙ্গও বটে। তাঁহাকে আশ্রয়রূপে পাইয়াই ভূষণ 'ভূষণ'-রূপে গণ্য হয়, আবার তিনি অরূপও বটেন। যিনি অঙ্গ, তিনিই অঙ্গী, তিনিই অনঙ্গ। যিনি স্থূলবৎ দেহধারী, তিনিই আত্মা, দেহী; অর্থাৎ তাঁহার দেহ-দেহীতে কোনরূপ ভেদ নাই। তিনিই মূর্তিমান্ শৃঙ্গার। এই মহাভাব-সমাশ্লিষ্ট রসরাজেরই সেবা অর্থাৎ পরিচর্যা করিতে হইবে—তাঁহার সর্বোত্তম সেবিকার আনুগত্যে। 'বননীয়' শব্দে উপনিষদ্ তাঁহারই কথা বলিয়াছেন।

বননীয়—প্রীণনযোগ্য অর্থাৎ অপরূপ রূপশালী।

আনুকূল্যে অনুবৃত্তিদ্বারা তাঁহার সেবা করিতে হইবে।

সুখ—স্বার্থ বা বিষয়নিষ্ঠ; প্রিয়তা—বিষয় ও আশ্রয় উভয়নিষ্ঠ। প্রীতিতে স্ব-সুখ-বিসর্জন আর সুখে স্ব-সুখ-কামনা থাকে। প্রীতিতে প্রিয়তা ও সুখ, উভয়ই বিদ্যমান।

এই সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের কথা শ্রীগৌরসুন্দর প্রথম শুনিলেন, শ্রীরায় রামানন্দের নিকট। রমণ যে 'রাম', তাঁহাকে যিনি আনন্দ দান করেন, তিনিই 'রামা'। সেই রামার সেবায় তাঁহাকে আনন্দ দিয়া যিনি আনন্দিত হ'ন, তিনিই 'রামানন্দ'। এই শ্রীরামরায়, শ্রীস্বরূপ-দামোদর ও শ্রীহরিদাস ঠাকুর, ইঁহারা তিনজনই মধুর-রতির মূলমহাজন। তাঁহাদের মনোঽভীষ্টের আচরণদ্বারা প্রচারকারী শ্রীরূপ-সনাতন ও তাঁহাদের অনুগবৃন্দ। শ্রীলসনাতন-গোস্বামিপাদ চতুঃসনের মধ্যে শ্রীসনৎকুমার বা শ্রীসনাতনরূপে অবতীর্ণ। চতুঃসন—শঙ্করের অত্যন্ত প্রিয়। অভীষ্টদেবের নিরবচ্ছিন্ন সুখানুসন্ধানময় ধ্যানছাড়া, ইহাদের দ্বৈত বা ভেদবুদ্ধি নাই। শ্রীসনাতনের প্রিয়—শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ—

শ্রীগৌরসুন্দরের 'দয়িতস্বরূপ'—সবচেয়ে বেশী ভালবাসার পাত্র। শ্রীগৌরের 'স্ববিলাসরূপ' অর্থাৎ স্বীয় লীলা-বিলাস বা মহাবদান্য-লীলা ও সৌন্দর্যের বৈচিত্র্য-বৈভব শ্রীরূপের দ্বারাই শ্রীগৌরসুন্দর প্রচার করাইয়াছেন। 'প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে' শ্লোকের অন্তর্গত 'স্ববিলাসরূপে ততান' ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের অন্তর্গত 'তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে'—এই দুইটি কথার একই অর্থ। 'হৃদা'—রাগরূপ পরমাবেশের আঁধার হৃদয়ে উদিত হইয়া ও প্রেরণা দান করিয়া। এই বুদ্ধিবৃত্তি বা ধীবৃত্তির প্রেরণা দানকারী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতিময়ী উপাসনা কামগায়ত্রী-দ্বারাই হয়। 'তেনে ব্রহ্ম'—এস্থলে 'ব্রহ্ম' শব্দে 'জন্মাদ্যস্য'-পদের অন্তর্গত 'আদ্য'রস। যে পরসত্য বস্তু হইতে 'আদ্য' অর্থাৎ শৃঙ্গার-রসের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই পরসত্য বস্তুই আবার সেই আদ্যরসের কথা বিস্তার ও কীর্তন করিবার জন্য শ্রীরূপের হৃদয়ে উদিত হইয়া প্রেরণা দান করিয়াছিলেন। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মঙ্গলাচরণে শ্রীরূপ তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীগৌরহরি নিজে ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া, আবার অনুগতগণের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিয়া প্রচার করিয়াছেন ও করাইয়াছেন। তৎকালে ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন, স্মৃতি, সাহিত্য, অলঙ্কার, ইতিহাস—সমস্ত দিক্ দিয়াই পারমার্থিক অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতিবহুল অভূতপূর্ব অভিনবযুগের উদয় হইয়াছিল এবং সমগ্র বঙ্গে ও উৎকলে একটিমাত্র রস অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছাড়া অন্য রস ছিল না। বিশেষতঃ গৌড়-দেশে ও ওড্র-দেশে তখন স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক-যুবা, সকলেই বিদ্যুদ্‌গতিতে পরতত্ত্বের সেবা করিবার জন্য ছুটিয়া

চলিয়াছিল। সেই শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধাম-মায়াপুরে আবির্ভূত হইয়া আদিলীলা করিয়াছেন। আদি ও মধ্য দুই লীলাই গোষ্ঠীলীলা ; আর অন্ত্যলীলা—বিবিক্তলীলা। গোষ্ঠীলীলায় আশ্রয়-বিগ্রহের (সখিস্থানীয়) বন্ধুগণের সঙ্গে বিহার, আর বিবিক্তলীলায় স্বীয় দাস বা লাল্য বা পাল্যজনের সেবা-গ্রহণ। শ্রীগৌরের এই ঔদার্যলীলাই শ্যামসুন্দরের মাধুর্যলীলার পরিশিষ্ট ; ইহা কেবলমাত্র সাধকেরই অনুশীলনের বস্তু নয়, সিদ্ধগণেরও সিদ্ধদশায় ইহাই নিরন্তর অনুশীলনীয়। সেই শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যকাল দুই-এ এক। তিনি কান্তি-দ্বারা হৃদয়-গুহার অন্ধকার ও হুঙ্কার-দ্বারা হস্তি-ব্যাঘ্রাদিস্বরূপ অপরাধরাশি বিনাশ করিয়া নিত্যকাল জয়যুক্ত হউন।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবা বিজয়ন্তেতমাম্।

৩০শে আশ্বিন, সোমবার,
বঙ্গাব্দ ১৩৫১।

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

রসরাজ-মহাভাব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর কলিহত জীবের প্রতি অশেষ-বিশেষ দয়া-পরবশ হইয়া, এই শ্রীধাম-মায়াপুরে

আবির্ভূত হইয়া, শ্রীপুরীধামে শেষলীলা বিস্তার করেন। তদানীন্তন মুসলমান বাদশাহের প্রধান মন্ত্রিদ্বয়, তাঁহার নিত্যলীলা-পরিকর শ্রীরূপ-সনাতনকে যথাক্রমে প্রয়াগ ও কাশীধামে (অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে) নিখিল বেদপ্রতিপাদ্য শ্রীউরুক্রম বা শ্রীত্রিবিক্রম (সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজনাত্মক ত্রিপাদবিক্ষেপকারী অথবা দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল এই তিন ধামে যুগপৎ লীলা-বিহারশীল লীলাপুরুষোত্তমই ত্রিবিক্রম) শ্রীকৃষ্ণের অনুভব বা সাক্ষাৎকাররূপ চরমপ্রয়োজন প্রীতিধর্মের কথা বলিয়াছিলেন। প্রয়াগে ত্রিবেণী-সঙ্গমে (দশাশ্বমেধ-ঘাটে, যেখানে বহির্মুখ ইন্দ্রিয়-রূপ দশটি অশ্বকে পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান-কামনায় বলি দেওয়া হয়) শ্রীরূপের নিকট আর বারাণসীতে দশাশ্বমেধ-ঘাটে শ্রীবিশ্বনাথের (কৈলাসনাথ নহেন, তাঁহার অংশী সদাশিবের) অভিন্নতনু, তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় চতুঃসনের অন্যতম শ্রীসনাতনের অংশী অবতারী শ্রীসনাতন গোস্বামীর নিকট সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের কথা, সেই ত্রিবিক্রম শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরই কীর্তন করিয়াছেন। পরতত্ত্বের আবির্ভাব-পরাকাষ্ঠা শ্রীশৃঙ্গার-রসরাজই, সেই ত্রিবিক্রম শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার তিনটি আবির্ভাবের—(ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্) অথবা স্বরূপশক্তির তিনটি আবির্ভাব—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিদ্‌বৃত্তির তিনিই অধীশ্বর। এই ত্রিবিক্রমের লীলা-প্রেমরসতত্ত্বের কথা শ্রীগৌরসুন্দর নিজে শ্রবণ করিবার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন—গৌতমী-গঙ্গাতীরে শ্রীগোস্পদতীর্থে—রসরাজ শ্রীরাধারমণ নবনবায়মানভাবে আনন্দ আস্বাদন করিতেছেন—যাঁহার সেবায়, সেই 'সমানরূপ

বয়োধর্মা'—শ্রীরামরায়ের নিকট। সেই রসরাজ-মহাভাবের লীলা প্রেমরসতত্ত্বকেই বলে 'রাজগুহ্য-যোগ।' উপাসনা-সাহিত্যে দুইটি শব্দ আমরা শুনিতে পাই—**'বিদ্যা' ও 'বেদনধর্ম'।** কেবল ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মবিদ্যা বা 'মহাবিদ্যা' নহে, বেদনাত্মক পরবিদ্যাই বস্তুতঃ সমস্ত বেদশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। জড়বিদ্যার বা অবিদ্যার নিরসনকারিণী বিদ্যাই আত্মবিদ্যা ও মহাবিদ্যা। তাহারও ঊর্দ্ধ ভূমিকায় অবস্থিত বেদনধর্মাত্মিকা রসময়ী গুহ্যবিদ্যা,—তাহারই অপর নাম 'ভক্তি'। এই ভক্তি বা 'রাজগুহ্য-বিদ্যাই' সমস্ত বেদশাস্ত্রের গূঢ় রহস্য। এই রাজগুহ্যবিদ্যা শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিত্যধাম শ্রীব্রজমণ্ডলে ও তথা হইতে সমগ্র গৌড়ীয়-ক্ষেত্রে তাঁহার প্রেষ্ঠ অনুগ শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন-শ্রীরঘুনাথ দাস-শ্রীজীবগোস্বামি-পাদ প্রমুখ গোস্বামিবর্গের দ্বারা 'সন্দর্ভ' প্রভৃতি-দ্বারে প্রচার করাইয়াছেন। আবার সগণ শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীঅদ্বৈতাদি-দ্বারে এবং শ্রীগোবিন্দমাধব বাসুঘোষাদির দ্বারে পদাবলী-গানের দ্বারা শ্রীগৌড়মণ্ডলে প্রচার করিবার আদেশ দিয়া প্রয়োজন-পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ রসরাজ-মহাভাবের মাধুর্য-পরাকাষ্ঠা-আস্বাদনরূপ মহাবদান্যতা দেখাইয়াছেন। শ্রীরূপ-সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতার আত্মজ, তাঁহাদের অলৌকিক স্নেহানুকম্পা-ভাজন শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুকে তাঁহারা সেই রাজগুহ্যবিদ্যারূপ রত্নসম্পুটের চাবিকাঠিটি প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুপাদ তাঁহার ষট্‌সন্দর্ভ বা ভাগবত-সন্দর্ভে পরতত্ত্বের তিনটি পূর্ণতার বিষয় অর্থাৎ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। যাহা বেদনধর্মের দ্বারা

বেদ্য, পরন্তু কেবল বিদ্যা-দ্বারা প্রাপ্য নহে, সেই তিনটি পরাকাষ্ঠার কথা তিনি তাঁহার সন্দর্ভে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার ফলে পরম সৌভাগ্যবন্ত জীবকুল সেই রাজগুহ্যবিদ্যা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। বেদে যাহা গুহ্যাতিগুহ্যরূপে ছিলেন, তাহা জগতে ব্যক্ত হইলেন—"কৃষ্ণরসতত্ত্ববেত্তা দেহ—প্রেমরূপ। সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ॥" এই বাক্যের উদ্দিষ্ট শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয় বিগ্রহ শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামি-প্রভু, শ্রীরায়-রামানন্দ, শ্রীঠাকুর হরিদাস—ইঁহাদের দ্বারা। ইঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্নতনু, তাঁহার অন্তরের কথা ইঁহারা জানেন। ইঁহাদের অভিন্নমিত্র, সুহৃৎ ও কৃপা-গৌরব-ভাজন শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ গোস্বামি-পাদত্রয় ও তাঁহাদের নিকট হইতে তাঁহাদের পরম-কৃপাস্নেহাস্পদ শ্রীশ্রীজীব প্রভুপাদ লাভ করেন।

'সন্দর্ভ' কাহাকে বলে? শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু বলেন,—"গূঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা। নানার্থবত্ত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥"

'গূঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ'—শাস্ত্রের প্রকৃত রহস্যটি যাহাতে প্রকাশিত হয়; 'সারোক্তিঃ'—অপ্রয়োজনীয় কথা না বলিয়া, অবঞ্চকভাবে সমস্ত সিদ্ধান্তের সার-নির্যাস-বর্ণন; 'শ্রেষ্ঠতা'—যাহার আকর্ষণ-ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী; 'নানার্থবত্ত্বং'—দর্শকের দর্শনের বিভিন্নতা-অনুসারে বা পাঠকের চিত্তবৃত্তি-ভেদ-হেতু যোগ্যতানুসারে বিভিন্নভাবে যাহাকে ব্যাখ্যা করা যায়।

শ্রীলস্বরূপ-রামরায়-সনাতন-রূপ-রঘুনাথ-জীব প্রমুখ গৌড়ীয় গুরুবর্গের সঙ্গে যাঁহারা সম্পূর্ণ খাপে খাপে মিলিয়া গিয়াছেন,

তাঁহারা এই সন্দর্ভের কথা সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারিবেন ; আর যাঁহারা পূর্ণভাবে মিলেন নাই, তাহাদের মধ্যে যাহার যে পরিমাণে মিলন হইয়াছে, সে সেই পরিমাণেই মাত্র ততটুকু ধারণা করিতে পারিবে—ইহাই 'নানার্থবত্ত্বং' ; 'বেদ্যত্বং'—বেদনধর্ম যাহাতে বা যাহাদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। "ত্রেধা নিদধে পদম্" ও 'তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং'—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের উদ্দিষ্ট উরু বা পরম বা অদ্ভুতবিক্রম বিষ্ণুই সন্দর্ভের প্রতিপাদ্য বিষয়। তাঁহার তিনটি অদ্ভুত পদন্যাস বা বিক্রম—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন অথবা দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল এই তিন ধাম। 'ত্র্যধীশ' শব্দের উদ্দিষ্ট সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের অধীশ্বর ; স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির অধীশ্বর ; হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—এই স্বরূপশক্তি-প্রভাবত্রয়ের অধীশ্বর ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই গুণাবতারত্রয়ের অধীশ্বর ; দেবীধাম, মহেশধাম বা ব্রহ্মধামের ও হরিধামের অধীশ্বর অথবা ত্রিপাদবিভূতির অধীশ্বরই উরুক্রম বা ত্রিবিক্রম। তিনিই রাজগুহ্যবিদ্যার প্রতিপাদ্য সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের অধিদেব। তত্ত্বসম্বন্ধে প্রমাণের কথা বলা হইয়াছে। 'প্রমা' বা যথার্থ জ্ঞান যাহা-দ্বারা নিরূপিত হয়, তাহাকেই 'প্রমাণ' বলে।

তত্ত্ব-সন্দর্ভে শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রমাণচক্রবর্তিচূড়ামণিরূপে সংস্থাপন করা হইয়াছে। ইহাতে নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সম্বন্ধে আলোচনাও আছে। সন্দর্ভকার 'ব্রহ্মসন্দর্ভ'—এই নাম দেন নাই ; কারণ 'বেদন', 'বেদ্য' ও 'বেত্তা' এই বিশেষত্রয় থাকিলে আর নির্বিশেষ ব্রহ্মপ্রতীতি থাকে না। অতএব 'ব্রহ্মসন্দর্ভ' নাম

না দিয়া 'ভগবৎসন্দর্ভ' নাম দিয়াই উহাতে পরতত্ত্বের প্রথম আবির্ভাবের বিচার বলিয়াছেন।

পরমাত্মসন্দর্ভে পরমাত্মার কথা বলা হইয়াছে।

পরমাত্মা—ঈশ্বর, পুরুষ, অন্তর্যামী বা নারায়ণ—তিনি জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তিদাতা ; জীবের নিয়ন্তা ও সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তা। ভগবৎসন্দর্ভে বৈকুণ্ঠাধিপতির কথা ও বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের বিষয় বর্ণিত আছে। শ্রীকৃষ্ণেই ভগবত্তার পরাকাষ্ঠা ; তাঁহার কথা শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বলিয়াছেন। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' —এই বাক্যটিকে 'পরিভাষা'-বাক্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অনিয়মের মধ্যে নিয়ম আনয়ন করে যে বাক্য,—অর্থাৎ সমস্ত বিবদমান বাক্যকে উপমর্দন করিয়া, যে অসমোর্দ্ধ প্রভাবযুক্ত বাক্যটি নিজের প্রভুতা সর্বত্র সর্বদা বিস্তার করে, তাহাকেই 'পরিভাষা' বলে। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তার বিরোধী যত বাক্য, সেই সমস্ত বাক্যকে খণ্ডন করিয়া এই বাক্যটি সম্পূর্ণ ও সমগ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তাকে স্থাপন করিয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিলে 'শ্রীমান্ কৃষ্ণ' বা শ্রীসমাশ্লিষ্ট কৃষ্ণকেই বুঝায়। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে 'শ্রীকৃষ্ণ' শব্দটি বলিয়াছেন, শুধু 'কৃষ্ণ' বলেন নাই। ইঁহারই অসম্যক্ আবির্ভাব 'ব্রহ্ম'। বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম যেখানে স্পষ্ট প্রকাশ পায় না, সে স্থলেই তাঁহাকে 'ব্রহ্ম' বলা হয়।

গুণ বা ধর্মই গুণী বা ধর্মীকে প্রকাশ করে। যেস্থলে গুণ, ধর্ম বা শক্তি বস্তুকে প্রকাশ করে না, ধরা-ছোঁয়া দেয় না, অথচ যাহা চেতনসত্তাময়, সেই দুর্নির্ণেয় তত্ত্বকেই 'ব্রহ্ম' বলে। তদপেক্ষা স্পষ্টতর বিশেষযুক্ত, সুতরাং শ্রেষ্ঠতর আবির্ভাবই ঈশ্বর,

পুরুষ, অন্তর্যামী, পরমাত্মা বা নারায়ণ ; তাঁহার বৈশিষ্ট্য আছে অর্থাৎ তিনি সধর্মক বা সশক্তিক। তিনি সর্বব্যাপক ও সর্বনিয়ন্তা। তাঁহার সত্তায় সকলের সত্তা, অসত্তায় অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে তাঁহার নিষ্ক্রিয়াবস্থায় সকলের 'অসত্তা'। তিনি মায়া ও জীবকে প্রকট করিয়া নিয়মন করেন। প্রতিজীবের হৃদয়-পুরে অন্তর্যামী নিয়ামক-রূপে যিনি অবস্থান করেন, তিনিই ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ বা ব্রহ্মা-রুদ্র-বিষ্ণু—এই তিনজনের মধ্যে তৃতীয় পুরুষ বা 'মহাত্মা'।

'তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্'—ইত্যাদি শ্রুতিতে দ্বিতীয় ও প্রথম-পুরুষকেই 'মহাপুরুষ' বলে। দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ী পদ্মনাভই, পদ্মযোনি ব্রহ্মার জনক। কারণার্ণবশায়ী ও গর্ভোদশায়ী একই রূপধারী পুরুষ, তবে উভয় লীলায় কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি কখনও কখনও প্রভূত পুণ্যশালী কোন জীবকে ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করেন,—কখনও নিজ অংশেই 'ব্রহ্মা' হন। তাঁহার ভ্রূদেশ হইতে শিবের আবির্ভাব হয়। ব্রহ্মা বহু হইতে পারেন, কিন্তু শিব বহু হ'ন না ; তবে তদংশ রুদ্র বহু হইতে পারেন।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা, নারায়ণ বা কৃষ্ণ—একই তত্ত্ব। তন্মধ্যে পরম বা পরতম আবির্ভাবই শ্রীকৃষ্ণ ; তিনিই ভগবদ্রূপ পরাকাষ্ঠা। তিনিই অসম্যক্, নির্বিশেষ, নির্ধর্মক, নিঃশক্তিক আবির্ভাবে 'ব্রহ্ম'-নামে উক্ত ; তিনিই পরমাত্মরূপে মায়াকে ক্ষোভিত করিয়া, তাহার গুণত্রয়-যোগে জীবশক্তির প্রাকট্য ও বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এবং নানা অবতার গ্রহণপূর্বক সতের পালন ও অসতের হনন করেন ; তিনিই পরব্যোম-বৈকুণ্ঠে কেবল স্বরূপশক্তি লক্ষ্মীর সহিত মহানারায়ণরূপে নিত্যকাল বিহার করেন ; তিনিই আবার

গোলোকে নিজ-ধামে নিজ পূর্ণতমস্বরূপে হ্লাদিনীশক্তির সঙ্গে বিহার করেন। পরতত্ত্বের সর্ববৈশিষ্ট্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যই নিরুপাধিপ্রীতির পাত্রত্ব। তিনি ভালবাসেন ও ভালবাসা স্বীকার করেন। তিনি সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতম ও প্রিয়তম। এরূপ নয় যে, তিনি কেবলই সুদূরবর্তী, অথবা যখন নিকটবর্তী হন, তখনও কেবল ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হইয়াই থাকেন। কেন তাঁহাকে ভালবাসা যায়, তাহার কোন কারণ নাই; কারণ প্রিয়ত্ব-ধর্মটি তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিগুণ; দৃষ্টান্ত—যেমন সূর্যকে আলোক হইতে পৃথক্ করা যায় না; কেননা, উহা তাঁহার স্বরূপেরই ধর্ম, তদ্রূপ। তিনি কেবল অন্তর্যামী বা অন্য ভগবদ্বিগ্রহের ন্যায় নিজধামে অবস্থিত নহেন।

শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে যতটা ভালবাসেন, অন্য ভগবদ্বিগ্রহের ভক্ত তাঁহার উপাস্যকে এতটা ভালবাসেন না বা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিজ ভক্তকে যতটা ভালবাসেন, অন্য ভগবদ্বিগ্রহও তাঁহার ভক্তকে এতটা ভালবাসেন না। তিনি যে কেবল প্রীতি স্বীকারই করেন, তাহা নয়, প্রীতির বশীভূতও হইয়া যান। এইটি তাঁহার অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। পরমাত্মায় নিরুপাধি-প্রীতির পাত্রত্ব নাই; কিন্তু সমস্ত ভগবদাবির্ভাব-সমূহেই ঐ ধর্মটি আছে। পরমাত্মার সাক্ষাৎকার সত্ত্বেও (যেমন যোগমার্গ-সিদ্ধগণের) যদি মাধুর্যানুভব না হয়, তাহা হইলে সেই সাক্ষাৎকার ও অসাক্ষাৎকারের সহিত সমান। উদাহরণ—যেমন মহাপ্রতাপশালী রাজা,—সাধারণ প্রজার নিকট যাঁহার দর্শন আদৌ সুলভ নহে, কদাচিৎ প্রজা অনেক কষ্টের পর দর্শন পাইল

বটে, কিন্তু তিনি আদর করিয়া প্রজার সঙ্গে কথা বলিলেন না ; তাহা হইলে সেই দর্শনের সার্থকতা কতটুকু ? যে পরতত্ত্ববস্তু জীবের পক্ষে দূরবর্তী নহেন, যাঁহাকে সাক্ষাৎকার করা যায়, তাঁহাকেই শ্রীমদ্ভাগবত 'অধোক্ষজ' বা 'প্রত্যক্-অক্ষজ' বলিয়াছেন। হ্লাদিনীশক্তির তাদাত্ম্যাপন্ন অপ্রাকৃত সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারাই তিনি সুখলভ্য। সেই অপ্রাকৃত সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তিনি সুখলাভ করেন, ভালবাসেন ও ভালবাসার অধীন হইয়া যান। জীব ভগবান্‌কে ও ভগবান্ জীবকে যদি আপন বলিয়া না জানিতে পারেন, ভগবান্ যদি নিরুপাধি প্রীতির পাত্ররূপে ধরা না দেন, তাহা হইলে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্তির আদৌ প্রয়োজনীয়তা বা আবশ্যকতা থাকে না এবং তৎফলে জীবের কোন মঙ্গল লাভও নাই। এই বৈশিষ্ট্যটি শ্রীর দ্বারা অনুক্ষণ অবিরত সেবিত ও সেবামুগ্ধ কৃষ্ণে পূর্ণমাত্রায় আছে। 'শ্রী' বলিতে কেবল ঐশ্বর্য নয়, পরন্তু 'সুখ', 'সম্পত্তি' ও 'আনন্দ' বুঝায়। ষড়ৈশ্বর্যের মধ্যে শ্রী-ই অঙ্গী। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই ত্রিবিধ আবির্ভাবই স্বরূপানন্দ বা পরমানন্দ। ইহাদের পর পর আবির্ভাবে আবার স্বরূপগত পরমানন্দ বৈচিত্রীর আধিক্য যথাক্রমে অধিকতর। শ্রীকৃষ্ণে ঐ স্বরূপগত পরমানন্দ সমগ্রভাবে সর্বাধিক ও অসমোর্দ্ধ। সকল রসশাস্ত্রবেত্তৃগণই একবাক্যে বলেন,—রসের পরিপূর্ণতা শৃঙ্গার রসেই সর্বাপেক্ষা অধিক। সেই শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্তিধরই শ্রীকৃষ্ণ। তিনি আনন্দস্বরূপ হইয়াও আনন্দী হন। যাঁহার দ্বারা তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে, নবনবায়মানভাবে আনন্দ-বিলাস-বৈচিত্র্য আস্বাদন

করেন, সেই শ্রীর সহিত সমাশ্লিষ্ট হইয়াই তিনি নিত্য বিরাজমান।

'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ'—এই শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে, তিনি কেবলমাত্র স্বরূপতঃ আনন্দের বিকারযুক্ত নহেন, পরন্তু আনন্দ-প্রাচুর্য অর্থাৎ পরমানন্দ-বিলাস-বৈচিত্রীও তাঁহাতে বর্তমান। সেই পরমঘন আনন্দই দ্বিদলের মত মূর্ত হইয়াছেন যুগপৎ রসরাজ ও মহাভাব রূপে; নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ অর্থাৎ সৌন্দর্য, মাধুর্য ও বৈদগ্ধ্যের নবনবরূপে স্ফূর্তি ও বৃদ্ধি নিত্যকাল চলিতেছে। একজন রসের উপভোক্তা ও আর একজন রসের যোগানদাররূপে লীলা করিতেছে।

এই চিল্লীলা মিথুনের মৈথুনের কথাই গুহ্যবিদ্যাত্মক বেদ বলিয়াছেন। পরস্পরের মধ্যে নিত্যকালই এই প্রেমানন্দলীলা-ময়ী বিজিগীষা বা পরাভব করিবার 'লুকোচুরি' খেলা চলিতেছে।

যদি কোন সৌভাগ্যক্রমে জীব এই পরমচমৎকারময়, পরম-ব্রহ্মানন্দের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারে, তাহা হইলেই চরম প্রয়োজন-পরাকাষ্ঠা লাভ হইবে। 'বেদ্যং'—কেবল জ্ঞেয় নয়, সেই বাস্তববস্তু পরতত্ত্বটি উপরন্তু বেদন-ধর্ম-প্রতিপাদ্য বা অনুভবযোগ্য। এই যে বেদন বা অনুভব বা সাক্ষাৎকার, ইহাকেই বলে 'প্রেম'। প্রেমের সার বা চরমোৎকর্ষ মহাভাবের মধ্যেই প্রীতিধর্মের বিভিন্ন ভাব-বৈচিত্র্যের একত্র বা সমগ্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই মহাভাবরূপাই শবল-রূপা। রাজগুহ্যবিদ্যা-নিরূপণকারী বেদ তাঁহাকে 'শবল' বলিয়াছেন। ছান্দোগ্য বলিয়াছেন—"শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে,

শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে।"—শ্যাম ও শ্যামা পরস্পরের সঙ্গপ্রভাবে পরস্পর, পরস্পরের মধ্যে সমাধি লাভ করিয়াছেন। ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধিতে সঙ্গ হয়। রসরাজের হৃদয়ে মহাভাবের ও মহাভাবের হৃদয়ে রসরাজের মূর্তি সমাধিতে স্ফূর্তি লাভ করিতেছে। এই দুই মূর্তি মিলিয়া শ্রীগৌরসুন্দররূপে প্রকাশ পান।

সঙ্গ—অর্থাৎ ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধির ফলে যাঁহার সঙ্গ বা ধ্যান করা যায়, তাঁহার ভাব ও কান্তিলাভ ঘটে। যথা—দাহ্য পদার্থ ও আগুন। রসরাজের সঙ্গফলে মহারাসে মহাভাবও রসরাজের ভাব ও কান্তি পাইয়াছিলেন; আবার মহাভাবের সঙ্গ করিয়া রসরাজও মহাভাবের ভাব ও কান্তি পাইয়াছেন। পরস্পরের গাঢ়সমাশ্লেষ-যুক্ত অবস্থাই রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর। "হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥" এস্থলে হৃদয়-কন্দরে স্ফূর্তিলাভের কথা বলিয়াছেন, মস্তিষ্ক-কন্দরে নয়।

আরোহ-পন্থায় দ্বৈতবুদ্ধি প্রবল থাকা পর্যন্ত মেধা বা যুক্তি বা বিচার-আলোচনা-দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না। যতক্ষণ দ্বৈতপ্রপঞ্চে ভোক্তা বা ভোগ্য, দ্রষ্টা বা দৃশ্য, পুরুষ বা যোষিৎ অভিমান, ততক্ষণ শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গে সম্পর্ক নাই। বেদে 'মৈথুন' শব্দটি বলেন নাই, তৎপরিবর্তে 'লীলা' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন; পাছে কোন প্রাকৃত ধারণা আসিয়া অমঙ্গল ঘটায়—এই আশঙ্কা দূরীকরণের জন্য।

এই যে যুগল বা মিথুন, ইঁহাদের মধ্যে পরস্পর আনন্দ-রসের আদান-প্রদান নিত্যকাল চলিতেছে। কান্তই যে কেবল বিষয়,

আর কান্তাই যে কেবল আশ্রয়, এরূপ নয়। লীলাবিশেষে কান্তও 'আশ্রয়' হন, আবার কান্তাও 'বিষয়' হন। স্ত্রী-পুরুষ না হইলে আদিরস হয় না। বহির্মুখতার আধারেও নর-নারী ব্যতীত সৃষ্টি থাকে না। আবার এই বহির্মুখ জগৎটি যাঁহার বিকৃত-প্রতিফলন, সেস্থলেও নর-নারীর মূর্তি ও লীলা না হইলে চমৎকারজনক রসের উদয় হয় না। ব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত বৃন্দাবনে ব্রহ্মকুণ্ড-তটে, নন্দীশ্বর ও বর্ষাণের নিকটে, প্রেমসরোবরে ও গিরিরাজের নিকটবর্তী দেশে, আবার ক্ষেত্রমণ্ডলের অন্তর্গত পুরুষোত্তমক্ষেত্রে কাশীমিশ্রের গৃহে, চটকপর্বতের নিকটবর্তী যমেশ্বর-টোটায় ও সুন্দরাচলে এবং গৌড়মণ্ডলে—শ্রীগৌরকুণ্ড-তটে, সুরধুনীতটে পাদসেবনাখ্য-কোলদ্বীপে ও শান্তিপুরে এই পরস্পর সম্মিলিত রসরাজ-মহাভাবের স্ফূরণ বা আবির্ভাব হইয়াছে।

ব্রহ্মা, শিব, নারদ, উদ্ধব—ইঁহারা নিত্যকাল এই সকল বিভিন্ন লীলাস্থলীতে অবস্থান করিয়া, শ্রীগৌরকৃষ্ণের লীলা-বিহার ধ্যান, দর্শন ও আস্বাদন করেন। নন্দীশ্বর,—শ্রীঅদ্বৈত প্রভু; ইনি কৈলাসনাথ নহেন, ইনি সদাশিব; ইনিও স্বয়ং কৃষ্ণই। এই শ্রীশিবজী শ্রীনন্দ-যশোদার, তথা সমগ্র ব্রজবাসীর ঈশ্বর। শ্রীমায়াপুরে যোগপীঠের উত্তর দিকে যে শ্রীশিবজী আছেন, তিনি শ্রীশচী-জগন্নাথের ঈশ্বর বা গুরুদেব। এই জন্য শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশচীমাতাকে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নিকট ক্ষমাভিক্ষা করাইয়াছিলেন। বরষাণীশ্বর—শ্রীব্রহ্মা; ইনিই শ্রীগৌরাবতারে অভিন্ন গৌর শ্রীনামাচার্য ঠাকুর হরিদাস। গোবর্দ্ধনের ঈশ্বর—

শ্রীহরিদেব ; ইনি সঙ্কর্ষণের অংশ—বিষ্ণু। মূল নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীব্রজে বা গোকুলবৃন্দাবনে ব্রহ্মারূপে, শিবরূপে, সঙ্কর্ষণাংশ হরিদেব (বিষ্ণু)-রূপে অবস্থিত হইয়া লীলা দর্শন করিতেছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর—শ্রীঅদ্বৈত-প্রকটিত-তনু বা নন্দীশ্বর-প্রকটিত-তনু। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভুপাদ কৃত 'মনঃশিক্ষা'য় শ্রীগৌরসুন্দরকে 'নন্দীশ্বর-পতি-সুত' রূপে স্মরণ করিবার উপদেশের ইঙ্গিত দ্রষ্টব্য। 'অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাৎ'—অর্থাৎ যিনি গোবর্দ্ধনেশ্বর হরিদেবের সহিত অথবা স্বয়ংরূপ শ্রীহরির সহিত অভিন্ন, সেই শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু—ঈশাবতার হইয়াও ভক্তাবতার। তিনি চক্রেশ্বর শিবরূপে গোবর্দ্ধনের নিকট মানসী-গঙ্গাকে ধারণ করিয়া আছেন। এই চক্রেশ্বর বা নন্দীশ্বর তমোগুণাধিষ্ঠাতা ধ্বংস-দেবতা রুদ্র নহেন।

রুদ্রের অংশী সদাশিবের স্থান—বৈকুণ্ঠে। তাঁহার অংশী ভূতেশ্বর শিব থাকেন দ্বারকা ও মথুরায়। আবার তাঁহারও অংশী বৃন্দাবনে শ্রীগোপীশ্বর, গোবর্দ্ধনে শ্রীচক্রেশ্বর ও নন্দগ্রামে শ্রীনন্দীশ্বর। গোবর্দ্ধনে শ্রীহরিদেবের নিকট ব্রহ্মকুণ্ড, উদ্ধবকুণ্ড, নারদকুণ্ড প্রভৃতি বহু কুণ্ড আছে। শ্রীব্রহ্মা, শ্রীনারদ ও শ্রীউদ্ধব নিত্যকাল সেই সকল কুণ্ডে অবস্থান করিয়া, শ্রীরাধা গোবিন্দের লীলা দর্শন ও আস্বাদন করিতে করিতে উন্মত্ত। শ্রীবাস পণ্ডিত—শ্রীনারদের অবতার। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ অনাদি-ভগবদ্‌বহির্মুখ দুঃখী জীবকুলকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করাইয়া নিত্যসুখে সুখী করেন। শ্রীদাউজী (শ্রীবলদেব) সম্বন্ধানুগা রতি প্রদান করেন।

মধুর রতি ব্যতীত অন্য চারিটি রতি শ্রীদাউজীর কৃপাবলেই পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের (প্রীতির পাত্রের) কোন দুঃখ না হয়, তজ্জন্য গোপ-গোপীগণ শিবের কাছে বর চাহেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক রাগের মধ্যেও আবার বর্ণাশ্রম-নিষ্ঠা দেখা যায়। ত্রিবিক্রমের তিনটি আধার—গোবর্দ্ধন, নন্দীশ্বর ও বর্ষাণ। এই তিনস্থানে বা আধারে প্রবেশলাভই সাধ্যপরাকাষ্ঠা। শ্রীরাধা-মদনমোহন-মিলিততনু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর পদকমল-মধুদ্বারা, শ্রীরাধা-গোবিন্দ-মিলিততনু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর বদনকমলমধুদ্বারা ও শ্রীরাধা-গোপীনাথ-মিলিততনু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর বক্ষঃকমল-মধুদ্বারা যাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, তিনিই 'গৌড়ীয়'—তিনিই এই সাধ্য-পরাকাষ্ঠা লাভ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত এই হরিরস-মধুপানকারীকে সাধকাবস্থায় 'ভাবুক' ও সিদ্ধাবস্থায় 'রসিক' বলিয়াছেন। এই শ্রীহরিরস-মধু পান না করা পর্যন্ত তাঁহাকে 'বৈষ্ণব' বলা যাইতে পারে, 'ভাগবত' বলা যাইতে পারে, কিন্তু 'গৌড়ীয়' বলা যাইবে না। 'গৌড়ীয়' কোনও সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব নহেন। স্বয়ং ভগবানের স্বাংশের পূজকগণই সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। স্বাংশ-তদেকাত্ম্য-পুরুষাবতার-গুণাবতার স্বয়ংরূপ নহেন। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ দাশরথি রামাদি সকল স্বাংশের রূপই গ্রহণ করিতে পারেন—যেমন, শ্রীজীর অনুরোধে কুমুদবনে চতুর্ভুজ গরুড়-গোবিন্দরূপ প্রকটিত হইয়াছিল, তখন শ্রীদাম গরুড়, আর শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ নারায়ণরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরাম, নারায়ণাদি যাবতীয় স্বাংশ ভগবদ্‌বিগ্রহগণ কখনও শ্রীকৃষ্ণরূপ ধারণ করিতে পারেন না। আবার কাশীনাথ শিবজীও

আত্মারামগণের পূজ্য হইতে পারেন, কিন্তু আত্মারামগণকে আকর্ষণ করিতে পারেন না। শ্রীভগবানের অনুকূলে, তাঁহার ইচ্ছানুসারেই তিনি মুক্তিদান করিতে পারেন, স্বতন্ত্রভাবে পারেন না। হতারিগতিদায়কত্ব, অবিচিন্ত্য মহাশক্তিত্ব, কোটি ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহত্ব, অবতারাবলী-বীজত্ব ও আত্মারামাকর্ষিত্ব—এই চারিটি গুণ কাশীনাথ শিবজীতে নাই। আবার তেমনই শ্রীনারায়ণ আত্মারামগণকে আকর্ষণ করিতে পারেন, কিন্তু ব্রজবাসিগণকে আকর্ষণ করিতে পারেন না। বেণুমাধুর্য, রূপমাধুর্য, লীলামাধুর্য ও প্রেম-ভক্ত-মাধুর্য শ্রীকৃষ্ণে ও তৎনিত্যসিদ্ধ পরিকরগণে অসমোর্দ্ধরূপে অবস্থিত।

শ্রীগদাধর শ্রীবার্ষভানবীর দ্বিতীয় মূর্তি। শ্রীগৌরসুন্দরে যে শ্রীবার্ষভানবীর মহাভাব বিদ্যমান, তাহারই আর একটি রূপ—শ্রীগদাধর। তিনিই মধুর রতি দান করেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবজীকে একাদশ স্কন্ধ উপদেশ করিয়া তাঁহাকে বৈরাগীর বেশ গ্রহণ-পূর্বক বদরিকাশ্রমে যাইতে আদেশ করেন। ইহার তাৎপর্য শ্রীলচক্রবর্তী ঠাকুর জানাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পরাকাষ্ঠা-স্বরূপের যে রূপ-গুণ-লীলার অসমোর্ধ্ব মাধুর্য, তাহা শ্রীনর-নারায়ণকে জানাইতে চাহিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিবার জন্য তাঁহার অংশ ভগবদবতারগণেরও প্রচুর আকাঙ্ক্ষা থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ নিজে যাইয়া মহাকাল পুরুষকে দর্শন দান করিয়াছিলেন ; সুতরাং নর-নারায়ণ আর কেন বাকী থাকেন ? শ্রীউদ্ধবজী রূপ, বয়স, বেশ প্রভৃতি বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণেরই অনুরূপ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দর্শন না দিলেও শ্রীউদ্ধবকে দর্শন করিলেই

শ্রীনরনারায়ণের ইচ্ছাপূর্তি (বাঞ্ছিত অভীষ্টসিদ্ধি) হইবে জানিয়াই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবজীকে বদরিকাশ্রমে পাঠাইলেন। আবার ভাবীকালের মঙ্গলের জন্য শ্রীশুকমুখে আবির্ভূত হইয়া, পরম্পরাক্রমে এই সকল কথা পরম সৌভাগ্যবন্ত জীবগণের নিঃশ্রেয়স্ লাভের পরমোপায়স্বরূপে প্রপঞ্চে চলিতে থাকুক— এই ইচ্ছা করিয়া, নিজাভিন্ন শ্রীমদ্ভাগবতের অবতারণ করাইলেন। পাণিনি-সূত্রমতে 'তস্যেদম্' 'উপজ্ঞাতে' ও 'কৃতে গ্রন্থে' এই তিনটি সূত্র-অনুসারে 'শ্রীমদ্ভাগবত' শব্দের প্রত্যয় নিষ্পন্ন হয়। 'কৃতে গ্রন্থে' সূত্রানুসারে 'শ্রীমতা ভগবতা কৃতম্'—আবির্ভাবিতং শাস্ত্রমিদম্—'শ্রীমদ্ভাগবতম্' এই ভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতও 'উপক্রমে' বলিয়াছেন—'মহামুনিকৃতে'। সর্বমহ-ন্মহনীয়-পদ পঙ্কজ যিনি, অর্থাৎ মুনি বলিতে সমাধি-প্রাপ্ত সিদ্ধমহাত্মা অর্থাৎ প্রেমিক বা রসিক, অথবা শ্রীনরনারায়ণ, তাঁহাদেরও 'মহনীয়' অর্থাৎ পূজনীয় পদকমল যাঁহার, তিনিই শবল-সমাশ্লিষ্ট শ্যাম, তিনিই এই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রণেতা। 'মুনি' শব্দের অর্থ—মননের চরম পরাকাষ্ঠা যে পরমাবিষ্টতা বা সমাধি, সেই সমাধিযুক্ত; মুনিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ধব অথবা মুক্ত প্রগ্রহবৃত্তিতে শ্যাম-সুখ-বিধানে সমাধিযুক্তা বা পরমাবিষ্টা শ্রীগান্ধর্বা প্রমুখা গোপীগণ, তাঁহাদেরও পূজনীয় অর্থাৎ ভজনীয় যিনি, তিনিই মহামুনি শ্রীকৃষ্ণ। 'তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি-কবয়ে'—এস্থলে 'ব্রহ্ম' বলিতে পূর্বরীতি-অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবতকেই বুঝিতে হইবে। 'তস্যেদম্'—এই সূত্র-অনুসারে 'শ্রীমদ্ভাগবত' এই শব্দ নিষ্পন্ন করিতে হইলে 'ইদম্' শব্দে 'প্রেষ্ঠং কলত্ররূপং

ইদম্'—শ্রীমদ্ভাগবতম্। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবার্ষভানবীর নাম নাই; কেননা 'শ্রীমদ্ভাগবত' শব্দটি বলাতেই তাঁহার নাম বলা হইয়াছে; কাজেই পৃথক্ করিয়া বলিবার প্রয়োজন হয় নাই। 'ইদম্'—বশীকারকপাত্রম্। শ্রীভাগবতে দ্বিতীয় শ্লোকে তিনবার 'অত্র' শব্দের প্রয়োগ করিয়া পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ অর্থাৎ বশীভূত করিয়াছেন যিনি, সেই শ্রীবার্ষভানবীর কৃপাকে অভিনন্দন করিয়াছেন। ঐ দ্বিতীয় শ্লোকটিতে পরম প্রয়োজন, আর সেই পরম প্রয়োজনলাভের উপায় নিরূপিত হইয়াছে শ্রীবার্ষভানবীরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে। সেই শ্রীমদ্ভাগবতে নিরূপিত বা অনুশীলিত বাস্তব-বস্তুটিও নিরূপিত হইয়াছেন। 'বাস্তব' অর্থাৎ বস্তুর স্বয়ং প্রকাশ-শক্তির দ্বারা পরিচিত। সেই বস্তুটি কেবল 'বাস্তব' নহেন, পরন্তু 'বেদ্য'—অনুভবযোগ্য অর্থাৎ সাক্ষাৎকারের পাত্র (শ্রুতি-কথিত 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ') এই শব্দটি অর্থাৎ ভালবাসার জিনিষ 'প্রিয়জন'—তিনি কেবল জ্ঞেয় মাত্র হইলে তিনি ব্রহ্ম-নামেও বর্ণিত হইতে পারিতেন। আদি-শ্লোকে যে 'পরং' শব্দের উল্লেখ আছে, সেই 'পর' শব্দে পূর্ণ ভগবৎস্বরূপকেই বুঝায়। সেই পূর্ণ ভগবদ্-রূপটি বেদন-ধর্ম-দ্বারাই নিরূপিত হন, অর্থাৎ কেবল অন্তর্যামী, পুরুষ, ঈশ্বর বা নারায়ণরূপ ব্যতীত আরও একটি রূপ আছে,—সেটি শ্রীভগবদ্রূপ—তিনিই নিরুপাধি প্রীতির পাত্র। তিনি কেবল নিয়ামক অন্তর্যামী পরমাত্মা নহেন, বা কেবল বৈকুণ্ঠধামে অবস্থিত নহেন, তিনি ভালবাসার পাত্রের বশীভূত হন, এইজন্য তিনি 'বেদ্য'। তিনি আর কি? 'শিবদ' অর্থাৎ প্রেমসুখদ। মুখ্যভাবে প্রেমসুখস্বরূপ আত্মপর্যন্ত দান

করেন, আর আনুষঙ্গিক ভাবে তাপত্রয়ের উন্মূলন অর্থাৎ মুক্তি দান করেন। এই সম্বন্ধি, অভিধেয় ও প্রয়োজন 'অত্র'—অর্থাৎ এই শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থাৎ শ্রীরাধার কৃপায় লভ্য হয়। সুতরাং অপরৈঃ কিম্ বা? অন্য শাস্ত্রের বা অন্যান্য আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যের আর প্রয়োজন কি?

'ঈশ্বর' শব্দের অর্থ—কর্তুমকর্তুমন্যথা কর্তুং সমর্থঃ।

তিনি জাতি-গুণ-নির্বিশেষে সকলকে প্রেমদান করিতে পারেন। ব্রহ্মা শ্রীহরিদাস ঠাকুররূপে নীচকুলে আবির্ভূত হইলেন। শ্রীরূপ-সনাতন ম্লেচ্ছ রাজদরবারে মন্ত্রিত্ব করিতেন বলিয়া দৈন্যভরে নিজদিগকে 'ম্লেচ্ছ-সংসর্গী' 'নীচজাতি' বলিয়া অভিমান করিতেন। শ্রীরায় রামানন্দ শূদ্রকুলে আবির্ভূত হইয়া বিষয়ী গৃহস্থের লীলা করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীল হরিদাস ও শ্রীল রূপ-সনাতন প্রভুগণের দ্বারাই শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনাম-মহিমার বিস্তার, মথুরা প্রদেশে ভক্তিসদাচার-প্রবর্তন ও প্রচার, শ্রীমূর্তি-প্রতিষ্ঠা ও পূজা-প্রবর্তন, লুপ্ততীর্থোদ্ধার, ভক্তিগ্রন্থ-প্রণয়ন ইত্যাদি নিজাভীষ্ট ক্রিয়ার প্রবর্তন; আবার শূদ্রকুলোদ্ভূত শ্রীরামরায়ের নিকট হইতে কৃষ্ণলীলা-প্রেমরসতত্ত্ব স্বয়ং শ্রবণ করিবার এবং প্রদ্যুম্নমিশ্রাদি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবকেও শ্রবণ করাইবার লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। এইগুলি শ্রীগৌরসুন্দরের অচিন্ত্য গূঢ় ঐশ্বর্য। 'ঈশ্বর' শব্দের আর একটি অর্থ—'হীনার্থাধিক সাধক।' শ্রীরূপ শ্রীগৌরসুন্দরকে 'মহাবদান্য' বলিয়াছেন, আর শ্রীসনাতন বলিয়াছেন 'হীনার্থাধিক সাধক'; উভয় শব্দেরই তাৎপর্য একই। যাহার কোন যোগ্যতা নাই, তাহাকেও পরিপূর্ণ যোগ্যতা দিয়া

দেন ; সেই ঈশ্বর সদ্যই হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়া যান ; কেবল দর্শন-মাত্র দান করিয়াই নিরস্ত হন না। কখন ?—তৎক্ষণাৎ অর্থাৎ যেই মুহূর্তে শ্রীমদ্ভাগবতের শুশ্রূষারূপ আনুকূল্যময় অনুশীলন হইতে থাকে। 'ভাগবত' বলিতে ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থ-ভাগবতকে বুঝায়। গ্রন্থ-ভাগবতটি—নবম পদার্থ মুক্তির আশ্রয়, দশম পদার্থ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-কর্মকে অধিকার করিয়া, পূর্ণতমরূপে বর্ণনকারী গ্রন্থ ; আবার ভক্ত-ভাগবতও নিখিল ভাগবত-শিরোমণি সেই কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীজীই। সেই পরমেশ্বর কাঁহাদের দ্বারা অবরুদ্ধ হন ? 'কৃতিভিঃ'—সৌভাগ্যবন্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা অথবা তাদাত্ম্যাপন্ন ইন্দ্রিয়গণ-দ্বারা এবং 'শুশ্রূষুভিঃ'—যাঁহারা সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতির সহিত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে চাহেন, অথবা সিদ্ধ কিংবা সাধকভক্ত—ভাগবতের পরিচর্যা যাঁহারা করেন, সদ্য সদ্য তাঁহাদের দ্বারাই সেই পরমেশ্বর বশীভূত হন।

প্রোজ্‌ঝিতকৈতব ভাগবতধর্মের অনুশীলন যিনি করেন, অথবা নিরুপাধি প্রীতির পাত্রের সেবা-পরিচর্যা যিনি করেন, তাঁহার সেবা করিলে তাঁহার প্রেমবাধ্য ঈশ্বরও সদ্যই ঐ পরিচর্যাকারী সেবকের হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়া যান।

অন্যান্য পুরাণের যেমন নাম—যথা, বিষ্ণুপুরাণ, গরুড়-পুরাণ ইত্যাদি, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিপাদক হওয়া সত্ত্বেও শ্রীমদ্ভাগবতকে শ্রীব্যাসদেব 'শ্রীকৃষ্ণ-পুরাণ' নাম দেন নাই ; কেননা, প্রথমতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রসঙ্গক্রমে ব্রহ্ম, পরমাত্মার কথাও আলোচিত হইয়াছে ; দ্বিতীয়তঃ 'শ্রীকৃষ্ণ-পুরাণ' নাম

দিলে 'শ্রীমদ্ভাগবত' গ্রন্থটি আংশিক শক্তি-প্রকটনকারী আবেশাবতার মাত্র শ্রীবেদব্যাস-প্রণীত অন্যান্য পুরাণেরই সমপর্যায়ভুক্ত হইতেন; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত কোন আবেশাবতারের রচিত নহেন; স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই ইঁহার প্রণেতা। আবার 'ভগবৎ-পুরাণ' এই নামও দেন নাই, পরন্তু 'শ্রীমদ্ভাগবত' এই নামই দিলেন। ভগবৎসম্বন্ধি-ভাগবতের মধ্যে ভগবান্‌ও আছেন। আবার পুংলিঙ্গ 'ভাগবত' বলিতে ভক্তের কথা, বিশেষভাবে শ্রীবার্ষভানবী প্রমুখা গোপীগণের মাহাত্ম্যের কথাই বলা হয়—যাহা দর্শন করিয়া শ্রীউদ্ধবজী বলিয়াছেন "বন্দে নন্দব্রজ-স্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ। যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥" 'ভুবনত্রয়'—শব্দে এখানে ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্—ব্যাহৃতিত্রয় মাত্র বুঝিতে হইবে না; দ্বারকা মথুরা ও বৃন্দাবনই বুঝিতে হইবে। বর্ষাণেশ্বর শ্রীব্রহ্মার অবতার শ্রীনামাচার্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কৃপা-প্রভাবেই, শ্রীনামের একমাত্র ঐকান্তিক অনুশীলনাত্মক আশ্রয়েই, শ্রীনামনিষ্ঠ সাধকের বর্ষাণে গোপীগৃহে জন্মলাভ হয়। এই গোপীগৃহে জন্মলাভ না হওয়া পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-ভজন হইবে না। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—"কবে বৃষভানুপুরে, আহিরী গোপের ঘরে, তনয়া হইয়া জনমিব।" আবার নিখিল উপাদানকারণ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর কৃপায় ভাগবতী-তনু বা গোপীদেহ লাভ হয়। কীর্তনকারী শ্রীউদ্ধবজী যদি কৃপা করেন, তাহা হইলে শ্রীগৌরসুন্দরের মহাসংকীর্তনরাস-দর্শনের সৌভাগ্য-পরাকাষ্ঠা লাভ হয়। এই রাসের কথাই শ্রুতি কোথাও

ব্যক্তভাবে, আবার কোথাও গুপ্তভাবে কীর্তন করিয়াছেন। অপ্রাকৃত নবীনমদন ও অপ্রাকৃত নবীনা রতি পরস্পর লীলা-বিলাসে নিরত-সংরত-সুরত। নানাধর্মবিলাসবত্তা স্বভাবটি একমাত্র শ্রীর সহিত সমাশ্লিষ্ট শ্যামেই রহিয়াছে। শ্রীজী নিজে আস্বাদন করেন, আবার বহু কায়ব্যূহ বিস্তার করিয়া শ্যামরস আস্বাদন করাইয়া স্বয়ং সুখলাভ করেন। এই 'বহু' জড় জগতের বহু নহে। 'উপজ্ঞাতে' সূত্রে 'উপ' অর্থাৎ অধিক বা সমগ্রভাবে 'জ্ঞাত' অর্থাৎ অনুভূত বা সাক্ষাৎকৃত (দৃষ্ট) বা লব্ধপ্রেম হন বা হইয়াছেন যিনি, তিনিই 'শ্রীমদ্ভাগবতম্'।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্

৬ই কার্তিক, সোমবার,
বঙ্গাব্দ ১৩৫১।

"বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর এই কলিযুগে ভাগবত-মূর্তিধৃক্; তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রীশ্রীলরূপ-সনাতন শ্রীমদ্ভাগবতরূপী শ্রীরাধা-মাধব-মিলিত তনুর অব্যভিচারী

উপাসক। যদিও শ্রীগৌরাবির্ভাবের পূর্বে শ্রীমধ্বাচার্য, শ্রীশ্রীধর স্বামিপাদ প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তথাপি শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের সন্তোষার্থ শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের বিশেষ চিদ্বিলাসের ব্যাখ্যা-রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীগোপালভট্ট প্রভুপাদের সেই ব্যাখ্যা কোথাও 'ক্রান্ত' (ক্রমবদ্ধ), কোথাও 'খণ্ডিত' অর্থাৎ অসম্পূর্ণ ও কতক পরিমাণে 'ব্যুৎক্রান্ত' অথবা অসংলগ্নভাবে লিপিবদ্ধ থাকায় শ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ সেই চিদ্বিলাসপর ভাগবত-ব্যাখ্যার ক্রমিকভাবে শৃঙ্গার-সৌন্দর্য রচনা করেন, অর্থাৎ বর্তমান সুসংবদ্ধ আকারে প্রকাশ করেন।

প্রথম সন্দর্ভের নাম—তত্ত্বসন্দর্ভ; উহাতে চতুর্বিধ দোষ নির্মুক্ত (ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সাই দোষ) শব্দপ্রমাণের মূল প্রমাণত্ব ও প্রধানরূপে প্রমাণ-চক্রবর্তি-চূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী-শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। পরতত্ত্ব—শ্রৌত শব্দ প্রমাণেরই প্রমেয়। তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত 'অধোক্ষজ' 'প্রত্যক্-প্রত্যক্ষ' অথবা 'প্রত্যগক্ষজ' বলা যায়। যদিও তিনি অশ্রৌত প্রমাণের অপ্রমেয় ও বহির্মুখ পরাক্ ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তথাপি তিনি অপ্রাকৃত শব্দাবতারের দ্বারা প্রমেয় হন। তাদাত্ম্যাপন্ন অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সেই অপ্রমেয় বস্তু হৃষীকেশকে মাপিয়া লইতে অর্থাৎ বেদনধর্ম-অনুভবের বিষয় করিতে অর্থাৎ ভালবাসিতে পারা যায়, ইহাই তাঁহার অসাধারণ গুণ, ধর্ম বা স্বভাব।

শক্তিবর্গলক্ষণ—তদ্ধর্মাতিরিক্ত কেবল জ্ঞানটি, 'প্রতিপাদ্য' ও

'প্রতিপাদক রূপ' 'বাচ্য' ও 'বাচক' সম্বন্ধ-রহিত। পরতত্ত্ব ও পরতত্ত্বের কথা বলেন যে বেদ, ইহাদের মধ্যে 'প্রতিপাদ্য' ও 'প্রতিপাদক' বা 'বাচ্য-বাচক'-রূপ সম্বন্ধ বর্তমান। এই সম্বন্ধযুক্ত তত্ত্বকেই 'সম্বন্ধি' বলা যায়। সম্বন্ধি-পরতত্ত্বের তিনটি আবির্ভাব —'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্'। তত্ত্বসন্দর্ভে ব্রহ্মের তত্ত্ব নিরূপণ করা হইয়াছে। পরমাত্মসন্দর্ভে অন্তর্যামিত্বময়, মায়াশক্তি প্রচুর ও চিচ্ছক্ত্যংশ-বিশিষ্ট এবং জীবমায়া ও গুণমায়া—উভয়ের নিয়ামক পরমাত্মার তত্ত্ববিচার করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ভগবত্তার আবির্ভাব-পরাকাষ্ঠা স্বরূপশক্ত্যানন্দী স্বয়ংরূপ যুগল-বিহারীর কথা বলিয়া সম্বন্ধি-তত্ত্ববিচারের সমাপ্তি করিয়াছেন। তটস্থ-শক্তিপ্রসূত জীব—পরমাত্মার বৈভব। স্বরূপতঃ চিদেকরস অর্থাৎ সুখ ও জ্ঞানস্বরূপ হইলেও অর্থাৎ চেতনের প্রতি স্বভাবতঃ প্রীতিমান থাকিলেও অনাদি-পরতত্ত্ব জ্ঞানের প্রাগ্‌ভাব জাতীয় বৈমুখ্যহেতু মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ জ্ঞান আবৃত হইয়াছে। গুণমায়া-দ্বারা স্বরূপের অস্ফূর্তি অর্থাৎ লয়, অস্মৃতি বা বিস্মৃতি (তমোগুণ) ও জীবমায়ার দ্বারা জড়বিশ্বে, জড়দেহে বা প্রধানে আত্মবোধরূপ বিবর্ত বা বিক্ষেপ বা বিপর্যয় (রজোগুণ) হইতেই জীবের অনাদি সংসার-দুঃখ আরম্ভ হইয়াছে। এই বহির্মুখ মায়াবদ্ধ জীবের উদ্ধারের জন্যই পরমকারুণিক শাস্ত্রের অবতার। দুই প্রকার সৌভাগ্যবান্ জীব অর্থাৎ জন্মান্তর-প্রাপ্ত প্রীতি-সংস্কার-যুক্ত ও মহতের অতি কৃপাদৃষ্টিপ্রাপ্ত যাঁহারা, তাঁহারাই শাস্ত্রের উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া, পরতত্ত্বের সাম্মুখ্যরূপ অভিধেয় ও অনুভবরূপ প্রয়োজন লাভ করেন।

বিষয়ী অবজ্ঞাকারী, অরুচিবিশিষ্ট ও বিদ্বেষী—এই চারি-প্রকার অস্বচ্ছহৃদয় ও বিভিন্ন প্রকারের উত্তরোত্তর ঘনীভূত প্রলেপযুক্ত ব্যক্তির কালাদি বা কামাদি-দোষে শাস্ত্রে ও সদ্‌গুরুতে রুচি হয় না। সম্বন্ধিতত্ত্বের উপদেশই জীবের বিমুখতারূপ ব্যাধি-দূরীকরণের উপায় হইলেও উহার অন্তর্গতরূপে অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের উপদেশ লাভেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে জীবের কৃত্য কি ? (অভিধেয়) এবং তাহা দ্বারা ফলতঃ কি লাভ হইবে ? (প্রয়োজন)—এই দুইটি বিষয়ের জিজ্ঞাসা ও সম্বন্ধিপরতত্ত্ববিষয়ক উপদেশের সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত হয়। অনাদিপরতত্ত্ব-জ্ঞানাভাবরূপ বৈমুখ্যের নিদান-চিকিৎসা হইতেছে—পরতত্ত্বের প্রতি উন্মুখতা বা সাম্মুখ্য। এই সাম্মুখ্য গৌণ ও সাক্ষাদ্‌ভেদে দুই প্রকার। গৌণ সাম্মুখ্যকে 'কর্মার্পণ' বলা যায়। ইহা পরতত্ত্বের বিপরীত মায়ার দিক্ হইতে সম্মুখের দিকে ঘাড় ফিরান মাত্র। ইহা জ্ঞান ও ভক্তিরূপ সাক্ষাৎ সাম্মুখ্যের দ্বার (আভাস)—স্বরূপ, সাক্ষাৎ সাম্মুখ্য নহে। আর সাক্ষাৎ সাম্মুখ্য বা উপাসনাই জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি-পথ।

পরতত্ত্ব—মায়াধীশ ; পরতত্ত্ব বিমুখ ব্যক্তির অস্মৃতি ও বিপর্যয় ঈশ মায়ারই কার্য। দ্বিতীয় বস্তুতে অর্থাৎ জড়প্রধানে আত্মবোধ হইলে তাহাতে অভিনিবেশ আসে। এই দ্বিতীয়াভি-নিবেশ হইতেই ভয় হয়। এই ভয়ই সমস্ত বহির্মুখতার আকর। এই ভীতি বা হিংসা বা মাৎসর্যই রসের বা প্রীতির বিপরীত অবস্থা। শ্রীগুরুদেবে ঈশ্বর (কর্তুমকর্তুমন্যথা কর্তুং সমর্থঃ) ও প্রেষ্ঠ দৃষ্টিযুক্ত হইয়া মায়াধীশের যে অব্যভিচারী

অপ্রতিহত ভজন, তাহার আভাসেই মায়া হইতে উদ্ধার লাভ করা যায়। মায়ার আশ্রয়-দ্বারা কোন দিন মঙ্গল অর্থাৎ দুঃখ-মোহ হইতে মুক্তিলাভ হইবে না। লৌকিক ভোজ-বাজীর উদাহরণেও মায়াবীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেই তৎসৃষ্টা মায়ার মোহ হইতে মুক্তিলাভ ঘটে, এরূপ দেখা যায়।

সেই সম্বন্ধি-বস্তুর প্রাপ্তির উপায় বা তদ্‌বিষয়ে কৃত্যই সাক্ষাৎ অভিধেয়। কর্মযোগ বা কর্মার্পণ—গৌণ উপায়। মুখ্য উপায়—জ্ঞান, ভক্তিবিশেষ অর্থাৎ যোগ ও সাক্ষাদ্‌ভক্তি। জ্ঞান ও যোগকে মস্তিষ্কের পথ অর্থাৎ 'বিচার-প্রধান'-পথ ও ভক্তিকে হৃদয়ের ধর্ম 'রুচিপ্রধান' পথ বলা যায়। অতন্নিরসনই জ্ঞান-মার্গের প্রধান বা একমাত্র কৃত্য। এই জ্ঞান-মার্গটি ক্ষুরের ধারের উপর দিয়া চলার মত অত্যন্ত বিপজ্জনক ও ক্লেশ-বহুল। মস্তিষ্কের আর একটি পথ হইতেছে 'যোগ'। ইন্দ্রিয়া-ধিষ্ঠাতা পরমাত্মার প্রতি বিমুখ ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিষয় হইতে প্রত্যাহারপূর্বক একমুখী করিবার জন্যই যোগমার্গে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ও ধারণা প্রভৃতি চেষ্টা। এই অষ্টাঙ্গযোগের শেষ দুইটি অঙ্গ অর্থাৎ ধ্যান ও সমাধি ভক্তি-মূলক হওয়ায়, ভক্তিসন্দর্ভে এই যোগপন্থাকে 'ভক্তিবিশেষ' বলিয়াছেন,—যদিও এই ধ্যান ও সমাধি শুদ্ধভক্তির অন্যতম ভক্ত্যঙ্গ 'স্মরণের' অন্তর্গত ধ্যান ও সমাধি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। যোগিগণ নিজ হৃৎকমলেই পরমাত্মার বা নারায়ণের ভাবনা করিয়া থাকেন, বৈকুণ্ঠে বা পরতত্ত্বের স্বধামে তাঁহাকে ধ্যান করেন না। ভক্তগণ কিন্তু স্বীয় ইষ্টদেবকে তাঁহার নিজধামে

বিহারশীলরূপেই ধ্যান করেন ; যথা—"দীব্যদ্ বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ" অথবা 'স্মরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে'—ইত্যাদি। এই যে যম, নিয়মাদি নিজ-চেষ্টা-দ্বারা ইন্দ্রিয়কে পরমাত্মার দিকে একমুখী করিবার চেষ্টা, ইহা নিতান্তই কৃত্রিম। মস্তিষ্কের কার্যরূপ এই কৃত্রিমপথে যদি কিছুটা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা না হয় অর্থাৎ হৃৎকমলে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ পুরুষের চিন্তা না হয় অর্থাৎ পরমাত্মার উপাসনাটি ভক্তির আকার-রূপ ধ্যান ও সমাধির অধীন যদি না হয়, তাহা হইলে উহা সফলা বা কার্যকরী অর্থাৎ তাহাতে পরমাত্মপ্রাপ্তি বা সিদ্ধি-লাভ হয় না। যোগমার্গের প্রয়োজন—ক্রমমুক্তি অর্থাৎ পরমাত্মার সাযুজ্যাদি-প্রাপ্তি। এই ঈশ্বর-সাযুজ্য ব্রহ্ম-সাযুজ্য অপেক্ষাও ঘৃণিত; কেননা ইহাতে সাধনের প্রাথমিক অবস্থায় ভগবদ্‌বিগ্রহের স্বীকার ও তাঁহার আনুগত্যের অর্থাৎ ধ্যানরূপা ভক্তির আশ্রয়ের ভান আছে। পরমাত্মাই অধিদৈবত পুরুষোত্তমরূপে সমষ্টি জীব হিরণ্যগর্ভের অন্তর্যামী—গর্ভোদশায়ী এবং অধিযজ্ঞ পুরুষোত্তমরূপে ব্যষ্টি (প্রত্যেক জীবের) অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ীবিষ্ণু।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, পথ দুই প্রকার—বিচার-প্রধান ও রুচি-প্রধান। বিচারপ্রধানমার্গে মস্তিষ্কই একমাত্র উপকরণ বা সম্বল। চতুর্মুখ ব্রহ্মাও বিচারপ্রধানমার্গ অবলম্বন করিতে গিয়া মোহগ্রস্ত হইয়া যান। কর্মফলানুসারে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অবস্থা হয়, অর্থাৎ কখনও সুস্থ থাকিতে পারে, আবার কখনও ব্যাধি প্রভৃতিতে বিকৃতও হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু হৃদয়টি (হৃৎপিণ্ড নহে) কর্মফলের অধীন নহে, তাহা নিত্যসিদ্ধ স্বভাব,

প্রীতি বা রুচির আধার। মস্তিষ্কের দ্বারা বিচার করিয়া কোনদিনই শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। Subjective Method or Synthesis বা মিলনের সন্দেশই সংহিতা বা বেদের মত। হিতের সহিত যাহা বর্তমানা, তাহাই 'সংহিতা'। সংহিতা একমুখী বা মিলিত করায়। ইহাকেই 'যোগ' বলে। বিয়োগ বা বিভাগই অহিত; তাহাকে Analytical Objective, Empiric, Speculative, Inductive, Rational or Scientific Method বলে। প্রত্যক্‌-নারায়ণের দিকে গতিতে যোগ হয়, উহাই মিলন বা Synthesis. কিন্তু Analytical মতবাদের দ্বারাই সমস্ত মাংসদৃক্‌ জগৎ পরিচালিত। এই মতবাদের মূলে আছে জাতিতে জাতিতে ভেদ, উদরভেদ, দেশ-গ্রাম-ভেদ। কামুকতা বা মৈথুনধর্মাশ্রিত পুণ্য-পাপ-বিচাররূপ দ্বৈতজ্ঞান এবং তজ্জনিত স্থূল রক্ত-মাংস-দর্শনই ইহার ভিত্তি। Analysis দ্বারা অপরের উপর প্রভুত্ব-কামনা প্রবল হয়, আর Synthesis দ্বারা সেবাবৃত্তির জাগরণ হয়। প্রতি বস্তুতে অন্তর্যামী দর্শন যত কম হইবে, উদরভেদ ততই প্রবল হইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ অর্থাৎ প্রলয় ভয়ঙ্করী রৌদ্র-লীলা চলিতে থাকিবে। উদরভেদকারী প্রকৃতিকে 'তুলা পেঁজা' করিতে চায়।

যাহারা ইতিহাস ও ভূগোলের বিভাগ-প্রণালীকে বাস্তব সত্য মনে করে, তাহাদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে ইতিহাস ও ভূগোলের বঞ্চনাময় রূপ দেখানো হইয়াছে। প্রকৃতির মধ্যে যে আড়াল, গোপনীয়, তাহাকে নগ্ন করিবার চেষ্টাই প্রকৃত বেয়াদবি; ইহা প্রকৃতির পুত্র বা দাস হইয়া, পূজ্যা প্রকৃতিকে

উলঙ্গ করিয়া দেখা ও মাপিবার জন্য দৌরাত্ম্যমূলক অপচেষ্টা। পুত্র হইয়া প্রভুত্বকামী, ভোক্তৃ, পতি বা রুদ্র অভিমান, মা'কে বামা করিবার চেষ্টা দেখিয়া প্রকৃতি লজ্জায় জিভ কাটেন। ইহার ফলে প্রকৃতির পুত্রগণের অর্থাৎ প্রভুত্বকামিগণের মহাকালীর উদরে প্রবেশ ও নির্গমনের নিবৃত্তি হয় না। এখানে 'প্রকৃতির' প্রকৃতি-বিপর্যয় অর্থাৎ প্রকৃতির দ্বারা শিবত্ব পদদলিত হয়। শিবত্ব বা মঙ্গলময়ত্ব-দর্শনে, ভোক্তৃ-অভিমান ছাড়িয়া দিয়া দৃশ্য বা ভোগ্য-অভিমানে রুদ্রান্তর্যামী সঙ্কর্ষণের আকর্ষণে স্বরূপ-শক্ত্যানন্দী-বিগ্রহ পরতত্ত্ববস্তুর সুখানুসন্ধানাবেশের দ্বারা সংহিত বা যোগযুক্ত হইয়া স্বরাজ-প্রাপ্তি অর্থাৎ বেদার্থ-তাৎপর্য-জ্ঞান লাভ হয়।

সাম্মুখ্যমাত্রেরই নিদান সাধুসঙ্গ। শাস্ত্রমূর্তি সাধু বা মহৎই হ্লাদিনী শক্তির দূত। সর্বশ্রেষ্ঠ সাধু বা মহৎই শ্রীগুরুদেব। তিনি পরব্রহ্মে 'উপশমাশ্রয়' অর্থাৎ 'উপ'—অধিকরূপে 'শম'—নিষ্ঠা আশ্রয় করিয়াছেন যিনি, তিনিই শ্রীগুরুদেব। তিনি নৈষ্ঠিকীভক্তি অর্থাৎ ধ্রুবানুস্মৃতি-হেতু শ্রীভগবানে পরমাবিষ্টতা-প্রাপ্ত। শ্রীমদ্ভাগবতরূপী শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় এই ভক্তভাগবতবর শ্রীগুরুদেব বা মহতের সন্ধান পাওয়া যায়। অজাতরুচির পক্ষে বিচারপ্রধান-মার্গ ও জাতরুচির পক্ষে রুচিপ্রধান-মার্গ। বিচার-প্রধানমার্গ মস্তিষ্ক বা মনীষার পথ। স্বীয় অযোগ্যতার তীব্র অনুভূতি হইতে রুচির উদয় হয়।

প্রীতির আধার হৃদয়ই এই রুচির জন্মস্থান। এই বিচার ও রুচিপথের প্রত্যেকেরই পূর্বাঙ্গ ও পরাঙ্গ-ভেদ আছে। যে

সকল অভিধেয়ের বা সাধনের কথা বলা হইল, তাহার মধ্যে ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয় ; কেননা, অন্যান্য সাধনের যাহা ফল, তৎসমস্তই সবলা ভক্তি নিরপেক্ষভাবে, তাহাদের কোনরূপ অপেক্ষা না করিয়াই, অনায়াসে দান করিতে পারেন, কিন্তু ভক্তির যে ফল, তাহার আভাসও অন্যান্য দুর্বল সাধনের দ্বারা পাওয়া যাইবে না। ভক্তির দুইটি লক্ষণ—নবধা ভক্তির আকার থাকিবে ও নৈরন্তর্য থাকিবে। নৈরন্তর্যটি অসাধারণ বা তটস্থ বা নিজস্ব লক্ষণ। আদৌ অর্পিতা হইয়া যদি এই ভক্তি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে উহা শীঘ্রই সাধ্য-ভক্তি,—প্রীতিতে পর্যবসিত হইবে। এই যে 'অর্পণ' অর্থাৎ 'ধারণা' বা ভগবৎসুখানুসন্ধান-চিন্তা, ইহার মধ্যে হ্লাদিনীর বৃত্তি অবতীর্ণ হয়। ভগবৎসুখানুসন্ধানযুক্ত, নিরবচ্ছিন্ন অমৃতধারাবৎ স্মৃতিসংযুক্ত যে নববিধ ভক্ত্যঙ্গ, ইহাই কেবলা, অকিঞ্চনা বা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি। বর্ণাশ্রম-পালন ও তাহার অর্পণের দ্বারা যে বিষ্ণু-তোষণ, তাহা ভক্ত্যাভাস বা ঈশ্বর-প্রীণনাভাস-মাত্র, তাহার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় ; পরে আরও উন্নতিক্রমে আত্মার প্রসন্নতা বা মুক্তিলাভ পর্যন্ত হইতে পারে, কিন্তু আত্মারও আত্মা পরমাত্মা শ্রীভগবানের সুপ্রসন্নতা বা বিমুক্তি বা প্রীতিলাভ হইবে না। নিরন্তর আবেশময়ী, অকিঞ্চনা ভক্তিদ্বারাই বিমুক্তি বা বিজ্ঞান অর্থাৎ ভিতরে বাহিরে অভীষ্ট ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হয়, অর্থাৎ তাঁহার মাধুর্যানুভব বা লীলারসের আস্বাদন হয়। 'ভক্তি' ও 'ভক্তিযোগ'—এই দুইটি শব্দের বৈশিষ্ট্য আছে। 'ভক্তি'—অনুষ্ঠানময়ী ; ইহা ক্রিয়ারূপে ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত, আর 'ভক্তিযোগ'—ক্রিয়া ও তৎসহিত

ইষ্টবস্তুর নিরন্তর সুখানুসন্ধানময় চিন্তন বা আবেশ। ভক্তিযোগের এই দুইটি লক্ষণ—(১) শ্রবণ-কীর্তনাদি ক্রিয়া লক্ষণমাত্রত্ব; ইহা স্বরূপলক্ষণ। (২) আবেশ বা যোগরূপ নৈরন্তর্য্য; ইহাই অসাধারণ লক্ষণ। প্রিয়ত্বধর্মই সম্বন্ধি-পরতত্ত্ব শ্রীভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। তিনি আনন্দময় হইয়াও নবনবায়মানভাবে আনন্দী হন। 'দেহলী-প্রদীপ'-ন্যায়ানুসারে পূর্ণতম আনন্দময়ের স্বরূপশক্তি নিজ প্রেমাস্পদ ও কায়ব্যূহসমন্বিত আপনাকে নন্দিত করেন। এই প্রিয়ত্বধর্মটি পূর্ণভাবে মাদনদশাপ্রাপ্তা শ্রীরাধার বশীভূত শ্রীকৃষ্ণেই প্রকাশিত। তিনি শ্রীচরণ-মধুর দ্বারা মদন-মোহনরূপে, শ্রীমুখকমলমধু-দ্বারা শ্রীগোবিন্দরূপে এবং শ্রীবক্ষঃ-কমল-মধু-দ্বারা শ্রীগোপীনাথরূপে যে গৌড়ীয়গণকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাঁহাদের সেবা-পরিপাটিতে লুব্ধ রাগানুগা ভক্তি-যাজী ভক্তগণের ভক্তিযোগই শ্রীরাধার বশীভূত শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার একমাত্র উপায়। এই রাগানুগা-ভক্তিযোগীর লক্ষণ—তৃণাদপি সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব, মানদত্ব। শ্রীদ্বারকা, শ্রীমথুরা ও শ্রীবৃন্দাবনবাসিগণের পদধূলিরূপে অভিমানই দৈন্যরূপা 'তৃণাদপি সুনীচত্ব'। 'সহিষ্ণুতা' বলিতে দয়া (ক্ষমা) বা অহিংসা এবং নিরপেক্ষতাকে বুঝায়। ইষ্টদেবের সহিত মিলন করাইবার ইচ্ছাই 'দয়া'। সর্বপ্রকার দৌরাত্ম্য ক্ষমা করিয়া দৌরাত্ম্যকারীর সর্বোত্তম প্রতিশোধ অর্থাৎ কষায়রূপ মূলবীজ উৎপাটন কারয়া তাহাকে সুখী অর্থাৎ ইষ্টদেবের সহিত সেবা-সংযুক্ত করা,—ইহাই 'দয়া'। 'অমানিত্ব'—সর্বপ্রতিষ্ঠার মূল আকর যে স্বরূপশক্তি ও তাহার বৈভবগণ,—ইহা জানিয়া সম্পূর্ণ

প্রতিষ্ঠাশারাহিত্য ও নিজের প্রতিষ্ঠাভাস-লাভেও লজ্জানুভব বা নিরহঙ্কার বা বিনয়। 'মানদত্ব'—সর্বভূতে, সর্ব বস্তুতে ইষ্টদেবের সহিত সম্পর্কযুক্ত চেতনদর্শনই সর্ব বস্তুতে মানদান অর্থাৎ সর্বত্র ভগবদ্—বৈভব-দর্শন, ভগবদ্রূপ, গুণ, লীলা ও ধামের উদ্দীপন ;—ইহাই অন্ত্য পারমহংস্য ধর্ম। ভূতানুকম্পা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক জীবে ইষ্টদেব ও ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানকারিণী হ্লাদিনীর স্ফূর্তি ও নিজসুখকর ইন্দ্রিয়চেষ্টা-ত্যাগ,—ইহাই হইল অহিংসার বা দয়াবৃত্তির ও উপরতির ক্রমবিকাশ-বিজ্ঞান।

অভীষ্ট ভগবৎ-সাক্ষাৎকার বা ভগবৎ-মাধুর্যানুভব বা প্রীতিই প্রয়োজনপরাকাষ্ঠা। প্রীতিতে ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধান, যে ভাবে প্রিয়জন সুখী হন, সেই ভাবে তাঁহাকে পাইবার ইচ্ছা ও নিজ-সুখেচ্ছা বা প্রতিকূল ইচ্ছাবিসর্জন এবং প্রিয়জন সুখী হইয়াছেন দেখিয়া সুখানুভব,—বিরহ ও মিলন, এই উভয় অবস্থাতেই এই তিনটি লক্ষণ থাকে। প্রীতি চিত্তকে উল্লসিত করায়, মমতাযুক্ত করায়, বিশ্বসিত করায়, প্রিয়ত্বা-তিশয়ের দ্বারা অভিমান-বিশিষ্ট বা কৌটিল্যযুক্ত করায়, বিগলিত করায়, বিষয়ালম্বনের প্রতি অত্যন্ত আসক্তিযুক্ত করায়, প্রতিক্ষণ নবনবায়মানভাবে স্ববিষয়কে অনুভব করায়, অসমোর্দ্ধ চমৎকারিতা-দ্বারা উন্মাদিত করে অর্থাৎ পরমানন্দ-প্লাবন আনয়ন করায়। শান্ত-রতিতে উল্লাস আছে, কিন্তু মমতাবোধ, সেবা-বোধ বা সমঝ্দারিতা নাই। ব্রহ্মানন্দ হইতে শান্তরতি বড় হইলেও উহা মমতাহীন। সম্বন্ধ-স্ফূর্তি

ব্যতীত মমতা হয় না। ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানে যদি তন্ময়তা থাকে, তাহা হইলেই সহজে প্রীতি লাভ করা যায়। বৈধী ভক্তিতে যে তন্ময়তা, তাহাকে 'ধ্রুবানুস্মৃতি' এবং রাগানুগা ভক্তিতে যে তন্ময়তা, তাহাকে প্রচুর রুচিময় 'আবেশ' বলা যায়। রাগানুগা ভক্তির গতি বিদ্যুতের মত। বর্ণাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রবিধি-অনুসারে ঐকান্তিকভজনই—বৈধী সাধনভক্তি; ইহাকে 'অনন্যাভক্তি' বলা যায়। আর অভিরুচি-সহকারে রাগাত্মিক-সিদ্ধ ভগবল্লীলা-পরিকরগণের সেবা-পরিপাটি-শ্রবণে লোভযুক্ত হইয়া তদনুসরণে আবেশ-তন্ময়তা ও অভিমানযুক্ত ভজনই রাগানুগাভক্তি। ইহার অপর নাম 'অবহিতা' বা 'অনন্যভাবা ভক্তি'। সাধনভক্তি তরলা,—তাহার দুইটি লক্ষণ—ক্লেশঘ্নী ও শুভদা। ভাব-ভক্তিটি সাধনভক্তি অপেক্ষা গাঢ়; তাহা মোক্ষলঘুতাকৃৎ ও সুদুর্লভা; তৎসঙ্গে সাধনভক্তির পূর্বোক্ত দুইটি লক্ষণও আছে। প্রেমভক্তি অত্যন্ত গাঢ়াবস্থা-প্রাপ্ত; উহা সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী সাধন ও ভাব-ভক্তির পূর্বোক্ত চারিটি লক্ষণও এই প্রেমভক্তিতে আছে। ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি ক্ষীর ও খোয়ার ন্যায় গাঢ়তার তারতম্যযুক্ত। সাধক অবস্থার 'অভিরুচিই' সিদ্ধাবস্থায় 'স্নেহে' পর্যবসিত হয়।

কাব্যশাস্ত্রে 'সামাজিক' বা 'সহৃদয়' বলিয়া একটি কথা আছে। 'সামাজিক' শব্দের অর্থ—কাব্যরস-আস্বাদক। এই 'সামাজিক' যদি 'সহৃদয়' অর্থাৎ সমঝ্‌দার না হন, তাহা হইলে সম্যক্‌ভাবে কাব্যরস-আস্বাদন তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয়না।

মস্তিষ্কের দ্বারা আস্বাদন বা রসগ্রাহিতা হয় না—ভালবাসা যায় না। মস্তিষ্কের দ্বারা পাপ-পুণ্যের বিচার বা নির্বাণলাভ পর্যন্ত হইতে পারে, কিন্তু প্রিয়জনের বৈশিষ্ট্যানুভব হয় না। আবেশের আধার হৃদয় এবং নিরবচ্ছিন্না অভিরুচি বা আবিষ্টতাই হৃদয়-গতি। স্মরণ ও ধারণা—সাধন-ভক্তির পূর্বাঙ্গ; অবিচ্ছিন্ন-মনোগতি হইতেই সাধনভক্তির পরাঙ্গ আরম্ভ হয়। অভিরুচির সহিত যে সম্যক্ কীর্তন, তাহাই সংকীর্তন। বহু মিলিত হইয়া একপ্রাণে, একতানে অদ্বয়জ্ঞানের সুখানুসন্ধানরূপ চেষ্টায় আবিষ্ট অর্থাৎ সেই জ্ঞান, সেই ধ্যান, সেই জপ, সেই তপ,—এইরূপ নিষ্ঠা লইয়া যে শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তন,—তাহাতে চমৎকার-বিশেষের পোষণ-হেতু শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সংকীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয়।

"হর্ষে প্রভু কহেন—শুন, স্বরূপ-রামরায়!
নাম-সংকীর্তন কলৌ পরম উপায়॥" শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যেরও
"ভক্তি সাধনশ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন।
প্রভু উপদেশ কৈলা 'নাম-সংকীর্তন'॥"
শ্রীরাধার বশীভূত কৃষ্ণের সুষ্ঠু কীর্তনই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন।

"ধ্যায়ন্ কৃতে............সংকীর্ত্য কেশবম্"—বাক্যে যে কীর্তনের কথা আছে, তাহা অভিরুচির সহিত কীর্তন নহে; শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন অর্থাৎ অভিরুচি বা আবেশের সহিত সংকীর্তন মূল গুরুপাদপদ্ম শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর নিজস্ব-ভজন। এই নিজস্ব-ভজনের চাবি কাঠি শ্রীস্বরূপ-রাম-রায়ের নিকট হইতে শ্রীগৌর-দাসশ্রেষ্ঠ শ্রীরূপ-সনাতন প্রমুখ অষ্টগোস্বামী প্রাপ্ত

হইয়াছেন। শ্রীস্বরূপ-দামোদরই গান্ধর্বা-বেদ-বিদ্যার আদি গুরু। তিনি গান্ধর্বা-বেদ-বিদ্যা-রূপিণী শ্রীমতীর অত্যন্ত মর্মী দ্বিতীয় দেহ শ্রীললিতা বা শ্রীবিশাখা; তাঁহার নিকট হইতেই শ্রীগান্ধর্বা-বেদ-বিদ্যার রহস্য প্রকটিত হইয়াছে। "যেবা কেহ অন্য জানে, সেহ তাঁহা হৈতে॥" শ্রীস্বরূপের অভিন্ন হৃদয়বন্ধু শ্রীরাম-রায়। প্রেম-সরোবরে যে প্রেম বৈচিত্ত্য প্রকটিত হইয়াছে, সেই প্রেম-বৈচিত্ত্যের কথা শ্রীমতীর স্বাধীনভর্তৃকা-ভাবমূর্তি শ্রীবিশাখা (শ্রীরাম-রায়) সর্বপ্রথম ইঙ্গিতে প্রকাশ করিলেন—'রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ।' শ্যাম-গোপ-রূপের সর্বাঙ্গ কাঞ্চন-পঞ্চালিকার হেম-গৌর-কান্তিতে আবৃত। প্রেম-বৈচিত্ত্যরূপ আবেশ বা সঙ্গফলে বিষয়-বিগ্রহটি আশ্রয়-বিগ্রহের ভাব ও কান্তিতে বিভাবিত। এই রহস্য শ্রীরাম-রায়ই প্রথম সমাধিতে উপলব্ধি করিলেন। শ্রীরাধা-মাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরই নন্দীশ্বর অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈত-দ্বারা প্রকটিত তনু।

নন্দী বা বর্ণাশ্রমধর্মরূপী বৃষ যাঁহার বাহন, তিনিই নন্দীশ্বর শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকল্পতরু বা মহাযোগপীঠের অবতার। নন্দীশ্বরের নিকট ডোমন-বন, তথায় ভগবতী শ্রীপৌর্ণমাসী পৌত্রী নান্দীমুখীর (মধুমঙ্গলের ভগ্নী) সহিত বাস করেন। পৌর্ণমাসী যোগমায়ারূপে সমস্ত লীলা সমাধান করেন। শ্রীপ্রেমসরোবরই শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীগৌরকুণ্ড। শ্রীকৃষ্ণের মহাবদান্যতা 'জয়তাং সুরতৌ' (দয়ালু) ইত্যাদি শ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীগৌর-লীলায় তদপেক্ষা অধিক মহাবদান্যতা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শ্রীগৌর-কৃষ্ণের উপাসনার কথাই শ্রীমদ্ভাগবত-উপক্রমে বলিয়াছেন—'সত্যং পরং ধীমহি' অর্থাৎ নিখিল বেদাকর-গান্ধর্বা-বেদ-বিদ্যা-প্রতিপাদ্যং বেদ্যং শ্রবণ-কীর্তনানুশীলনময় নিরন্তরাবেশময় ধ্যানেন বয়ম্ অনুশীলয়ামঃ ধায়েমঃ ইত্যর্থঃ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্

১৮ই আষাঢ়, সোমবার,
বঙ্গাব্দ ১৩৫২।

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥"

'তস্যেদম্' 'কৃতে গ্রন্থে' ও 'উপজ্ঞাতে'—পাণিনিকৃত এই তিন সূত্র-অনুসারে 'শ্রীমদ্ভাগবত' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়।

'তস্য শ্রীমতো ভগবতঃ ইদং প্রেষ্ঠং কলত্ররূপং'—ইহাই 'তস্যেদম্' সূত্রের বিবৃতি। 'কৃতে গ্রন্থে' এই সূত্র-অনুসারে 'শ্রীমদ্ভাগবত' শব্দের অর্থ—শ্রীমতো ভগবতা কৃতং আবির্ভাবিতম্—শ্রীমদ্ভাগবতম্। মহামুনি শ্রীভগবান্, যিনি

সর্বমহন্মহনীয়চরণপঙ্কজ, সেই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই এই শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব করাইয়াছেন। আর 'উপজ্ঞাতে' সূত্র-অনুসারে 'উপ'—আধিক্যেণ প্রাচুর্যেন জ্ঞাত, অনুভূত, আস্বাদিত, এইরূপ অর্থ হইবে। শ্রেষ্ঠ কলত্ররূপী শ্রীমদ্ভাগবতের রস আস্বাদন করিবার জন্য স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতপ্রণেতা শ্রীকৃষ্ণের লোভ হওয়ায়, তিনি সেই শ্রেষ্ঠ কলত্রের ভাব ও কান্তি গ্রহণ করিয়া, অর্থাৎ তাহাতে পরমাবেশ বা সমাধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রচুরভাবে সেই রস আস্বাদন করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে (ভাঃ ১২।১৩।১১—"আদি-মধ্যাবসানেষু……-সৎসুরম্") সর্বত্রই বিভিন্নভাবে যুগলবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ও যুগলমিলিতরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-রূপ-গুণ-চরিতাদি কথাই কীর্তন করিয়াছেন। একাদশস্কন্ধের শেষে শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব-সংবাদ-বর্ণন-সমাপন-মুখে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—

"ততস্তমন্তর্হৃদি সন্নিবেশ্য, গতো মহাভাগবতো বিশালাম্।
যথোপদিষ্টাং জগদেকবন্ধুনা, ততঃ সমাস্থায় হরেরগাদ্‌গতিম্॥"
(ভাঃ ১১।২৯।৪৭)

নিজ ইষ্টদেবের পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া মহাভাগবত শ্রীউদ্ধব বিশালা অর্থাৎ বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। বৈশালীর অপর নাম—বিশালা বা বদরিকাশ্রম। বৈশালী, শ্রাবস্তি, প্রতিষ্ঠানপুর, বিদর্ভ, সাকেত প্রভৃতি অতি প্রাচীন স্থান। যদিও শ্রীউদ্ধব বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন, কিন্তু তথায় গিয়া জগদেকবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই যে গতির (সাক্ষাৎকারের) কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, সেই গতি অর্থাৎ অপ্রকট প্রকাশে

দ্বারকাধামে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবত বর্তমান আকারে যিনি প্রকট করিয়াছেন, তিনি যখন এই অংশ প্রণয়ন করেন, তখন পুরুষোত্তমধামের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। সেইজন্যই জগদেকবন্ধু বা জগন্নাথ শ্রীপুরুষোত্তমের নামটি উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পরবর্তি-শ্লোকে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—

"য এতদানন্দসমুদ্র-সম্ভৃতং, জ্ঞানামৃতং ভাগবতায় ভাষিতম্। কৃষ্ণেন যোগেশ্বরসেবিতাঙ্ঘ্রিণা, সচ্ছ্রদ্ধয়াসেব্য জগদ্‌বিমুচ্যতে ॥"

আনন্দ-সমুদ্র—ভক্তিযোগ; সম্ভৃত—মিলিত, একীকৃত। আনন্দ-সমুদ্র-স্বরূপ ভক্তিযোগ হইতে উত্থিত যে জ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞান, অনুভব বা প্রীতি, উহা অমৃততুল্য এবং সেই অমৃত এই সমুদ্রের সহিত অভিন্ন। আধার ও আধেয় এখানে একই পদার্থ। 'ভাগবতায়'—মহাভাগবত শ্রীউদ্ধবের নিকট—'ভাষিতং'—কথিত, অথবা 'ভাসিতং' এইরূপ পাঠ হইলে উহার অর্থ—প্রকাশিত বা আবির্ভাবিত; কে আবির্ভাব করাইয়াছেন? 'কৃষ্ণেন যোগেশ্বরসেবিতাঙ্ঘ্রিণা'—'যোগেশ্বর' শব্দের অর্থ—'যোগ অর্থাৎ প্রেমভক্তি-যোগ'-প্রভাবে ইষ্টদেবের সাক্ষাৎকার যাঁহারা অন্তরে বাহিরে লাভ করিয়াছেন, সেই যোগেশ্বর অর্থাৎ সিদ্ধমহাভাগবতগণ-কর্তৃক সেবিত পাদপদ্ম শ্রীকৃষ্ণই ইহা প্রকট করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-মধুই অমৃত। আবার সেই অমৃত—আনন্দ-সমুদ্র প্রেমভক্তিযোগের সহিত অভিন্ন। যিনি সচ্ছ্রদ্ধা অর্থাৎ সতী শ্রদ্ধা, অব্যভিচারিণী নিষ্ঠার সহিত এই জ্ঞানামৃতের সম্যক্ সেবন করেন, তাঁহার সঙ্গ-প্রভাবে সমগ্র জগৎ পর্যন্ত প্রেমভক্তি (বিমুক্তি) লাভ করেন। এই

অমৃতের কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেবের হৃদয়ে শ্রীগৌরসুন্দর স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি তাঁহাকে এইভাবে স্তব করিলেন,—

"ভবভয়মপহন্তুং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং,নিগমকৃদুপজহ্রে
ভৃঙ্গবদ্বেদসারম্।
অমৃতমুদধিতশ্চাপায়য়দ্ভৃত্যবর্গান্, পুরুষমৃষভমাদ্যং
কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি॥"
(ভাঃ ১১।২৯।৪৯)

পরতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান তিনপ্রকার,—ব্রহ্মজ্ঞান, পরমাত্মজ্ঞান ও ভগবজ্‌জ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান অপেক্ষা পরমাত্মজ্ঞান, আবার তদপেক্ষা ভগবজ্‌জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। ভগবজ্‌জ্ঞানের মধ্যে আবার যুগলরূপ ও যুগলমিলিত-তনু অর্থাৎ রসরাজ ও মহাভাব এবং রসরাজ-মহাভাবমিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপজ্ঞানই জ্ঞানের সার বা পরাকাষ্ঠা। 'বিজ্ঞান' শব্দের অর্থ অনুভব, সাক্ষাৎকার বা প্রেম। রতি হইতে মহাভাব পর্যন্ত প্রেমের যে ক্রমোন্নত বৈচিত্র্য, উহাই 'বিজ্ঞান'। মহাভাবই এই বিজ্ঞানের সার বা পরাকাষ্ঠা। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান-সার, তথা সমগ্র বেদের সার অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতকে যিনি 'উপজহ্রে'—অর্থাৎ সমাহরণ করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম করি। কে সমাহরণ করিয়াছেন ?—বেদের সার-নির্যাস সমাহরণ করিবার সামর্থ্য সম্বন্ধে যদি কাহারও সন্দেহ হয়, এইজন্য সেই আশঙ্কা-নিরসনের জন্য বলিলেন,—'নিগমকৃৎ'। যিনি বেদকর্তা, তিনিই এই সার সংগ্রহ করিয়াছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন,—

"বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্‌বেদবিদেব চাহম্।"

আমিই বেদের প্রতিপাদ্য বস্তু, আমিই বেদের কর্তা, আবার আমিই বেদের নিগূঢ় তত্ত্বের একমাত্র জ্ঞাতা।

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন॥
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে ত্বহম্।
এতাবান্ সর্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
ময়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি॥ (ভাঃ ১১।২১।৪২-৪৩)

"এই বেদ-বাণী-বিধিবাক্যে কি বিধান করিয়াছেন? মন্ত্র-বাক্যে কি প্রকাশ করিয়াছেন, কি নিরসন করিয়া কি স্থাপন করিয়াছেন, ইহা আমি ব্যতীত আর কেহই জানে না। এই শ্রুতি আমাকে বিধান করেন……ইত্যাদি।" সুতরাং তিনিই 'নিগমকৃৎ' বলিয়া নিগমের সারসংগ্রহ তিনিই করিতে পারেন। সেই 'পুরুষং ঋষভং' অর্থাৎ পুরুষোত্তমকে প্রণাম করি। তিনিই আবার 'কৃষ্ণসংজ্ঞং'ও বটেন,—কৃষ্ণবিষয়ক সংজ্ঞা—সম্যক্‌জ্ঞান অর্থাৎ চৈতন্য অর্থাৎ বিজ্ঞান (অনুভব, প্রেম বা অন্তরে বাহিরে সাক্ষাৎকার স্ফূর্তি) যিনি দান করেন, তিনিই 'কৃষ্ণসংজ্ঞ' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। কৃষ্ণবিষয়ক বিজ্ঞান (চৈতন্য) কৃষ্ণই দান করিতে পারেন, অপর কাহারও ক্ষমতা নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"শেষ লীলায় ধরে নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥"

এখানে 'জানাইয়া' শব্দের অর্থ—'অনুভব বা সাক্ষাৎকার করাইয়া'। শ্রীমদ্ভাগবতের কোথাও 'জ্ঞ' ধাতুটি সাধারণ প্রচলিত

অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। সর্বত্রই 'জ্ঞান' শব্দটিকে 'অনুভব' বা 'সাক্ষাৎকার' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তবে সমগ্র বেদশাস্ত্র বিশেষতঃ তাহার মধ্যে আবার শ্রীমদ্ভাগবত পরোক্ষবাদ-অবলম্বনে রচিত বলিয়া সর্বত্র দ্বয়র্থ-(দ্ব্যর্থ)-ব্যঞ্জক শব্দ বা পদ ব্যবহার করিয়াছেন। পরোক্ষবাদ স্বয়ং ভগবানেরই প্রিয়। যাহা বলিতে বসিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্য, বহির্মুখ জীব-সমাজের নিকট অপ্রকাশ্য বলিয়াই শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ শব্দ-সমূহের পরিবর্ত্তে জ্ঞান ও যোগের পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের গাম্ভীর্যও বাড়িয়াছে। এখানেও 'কৃষ্ণসংজ্ঞং' এই শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন—'কৃষ্ণাখ্যং' বলেন নাই। সেই 'কৃষ্ণসংজ্ঞ পুরুষঋষভ' অর্থাৎ লীলা-পুরুষোত্তম, আদ্য মহাপুরুষ কারণার্ণবশায়ীর অংশী দ্বিতীয় চতু-র্ব্যূহের দ্বিতীয় ব্যূহ—শ্রীসঙ্কর্ষণ। এই চতুর্ব্যূহ-সমন্বিত মহা-নারায়ণেরও অংশী বা আদি কারণ—শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ পুরাণপুরুষ ; অথবা যাঁহার নামে আদিতে 'কৃষ্ণ' এই শব্দ বা নাম আছে, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে নমস্কার করি। এখন তাঁহার একটি বিশেষ লীলার কথা বলিতেছেন—'উদধিতঃ' অর্থাৎ সমুদ্র হইতে অমৃত আহরণ করিয়া তিনি নিজ-ভৃত্যবর্গকে পান করাইয়াছেন। অমৃত-আহরণ সম্বন্ধে শ্রীবিষ্ণুর তিনটি অবতারের সম্বন্ধ আছে। (১) কূর্মদেব ; সমুদ্র-মন্থনকালে কূর্মদেব নিজ পৃষ্ঠদেশে মন্দর-পর্বত ধারণ করিয়াছিলেন। কূর্মদেবের কৃপা না হইলে সমুদ্র-মন্থন কখনও সম্ভবপর হইত না। (২) ধন্বন্তরি ও (৩) মোহিনী। মন্থনকালে ধন্বন্তরি অমৃত-কলস হস্তে লইয়া সমুদ্র হইতে উত্থিত

হন। কূর্মদেব ও মোহিনী—ইঁহারা বিষ্ণুর অংশাবতার, বিষ্ণু-কোটির অন্তর্ভুক্ত। শ্রীবিষ্ণু যেরূপ মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া অসুরগণকে মোহনপূর্বক দেবগণকে অমৃত পান করাইয়াছিলেন, শ্রীগৌরসুন্দরও তদ্রূপ লীলা করিয়াছেন,—

অসদবিষয়মঙ্ঘ্রিং ভাবগম্যং প্রপন্নান্
অমৃতমমরবর্যানাশয়ৎ সিন্ধুমথ্যম্।
কপটযুবতিবেশো মোহয়ন্ যঃ সুরারীং-
স্তমহমুপসৃতানাং কামপূরং নতোঽস্মি ॥ (ভা ৮।১২।৪৭)

'যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম অসদ্গণের অবিষয় অর্থাৎ অগম্য, যিনি কেবলমাত্র ভজন-দ্বারাই প্রাপ্য, যিনি কপটযুবতিবেশ ধারণ করিয়া অসুরগণকে মোহিত করতঃ শরণাগত দেবগণকে সিন্ধুমথনোত্থিত অমৃত ভোজন করাইয়াছেন, সেই ভক্তগণের অভীষ্টপূরণকারীকে প্রণাম করি।' যে যাহা নহে, সে যদি সেই বেশ বা আচরণ গ্রহণ করে, তাহা হইলেই তাহার 'কপটতা' হয়। বিষ্ণু নিজে পুরুষ হইয়াও স্ত্রীলোকের বেশ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার কপটতা। কপট যুবতিবেশ—বিষ্ণুপক্ষে শ্রীবিষ্ণু-কর্তৃক স্বভক্ত দেবগণকে অমৃতবণ্টনকারিণী মোহিনীবেশ-ধারণ। শ্রীগৌরপক্ষে—শ্রীবিশ্বম্ভরগৌর-কর্তৃক মোহিনী মহালক্ষ্মী-কাচে নৃত্য-দ্বারা ও নৃত্যান্তে ভক্তগণকে স্তন্য পান করানো; এই কপটের আশ্রয়েই ভগবান্ কর্মফল-আত্মসাৎকারী রজস্তমোগুণাক্রান্ত অসুরগণকে বঞ্চনা করিয়া, সত্ত্বগুণসম্পন্ন কর্মফল-অর্পণকারী ও ঈশ্বরের সন্তোষ-চিন্তনকারী দেবগণকে অমৃত প্রদান করিয়াছেন। রতি হইতে আরম্ভ

করিয়া মহাভাব পর্যন্ত অনন্ত বিচিত্র তরঙ্গায়িত যে প্রেমসমুদ্র, তাহা প্রেমের পরিপাক বা পরাকাষ্ঠাস্বরূপ। মহাভাবই সেই প্রেমসমুদ্র হইতে উত্থিত অমৃতস্বরূপ। এই ভাবামৃত শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার ভৃত্যবর্গকে পান করাইয়াছেন। 'ভৃত্য' বলিতে পাল্য, অনুগত জনকে বুঝায়। এই ভৃত্য দুই প্রকার—নিবৃত্ত বা বিবিক্তানন্দী এবং প্রবৃত্ত বা গোষ্ঠ্যানন্দী। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, শ্রীশিবানন্দ সেন, কবিকর্ণপূর, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত, শ্রীশ্রীনাথ পণ্ডিত (চক্রবর্তী), কুলীন-গ্রামনিবাসী শ্রীসত্যরাজ খাঁ বা বসুরামানন্দ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমাধব ও শ্রীবাসুঘোষ, শ্রীগদাধরদাস, শ্রীবংশীবদন ইত্যাদি,—ইঁহারা গোষ্ঠ্যানন্দী। ইঁহাদের মধ্যে সকলেই পুত্র বা শিষ্য-পরম্পরাক্রমে বংশ বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীরায়রামানন্দ, শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীহরিদাসঠাকুর, ষড়্‌গোস্বামী, শ্রীলোকনাথ, শ্রীকবিরাজ কৃষ্ণদাস, শ্রীযাদবাচার্য প্রভৃতি শ্রীরূপানুগ-গণ—ইঁহারা বিবিক্তানন্দীর লীলা করিয়াছেন। গোষ্ঠ্যানন্দীদিগের শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সহিত সখীভাব ও বিবিক্তানন্দীদিগের দাসীভাব থাকে। যদিও শ্রীবার্ষভানবী সকলকেই সখী জ্ঞান করেন, তথাপি সখী, নিত্যসখী, প্রিয়সখী, প্রাণসখী ও পরমপ্রেষ্ঠ সখীদিগের মধ্যে আবার সর্বাধিক অন্তরঙ্গ—প্রিয়নর্মসখীগণ নিজদিগকে দাসী বলিয়া অভিহিত করিতেই ভালবাসেন। সখীগণও নিজদিগকে সখী বলেন না, তাঁহারাও দাস্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন বটে, কিন্তু প্রিয়নর্মসখীগণ ব্যতীত আর কেহ দাসীত্ব লাভ করেন না।

"সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং।
দাস্যায়তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্ ॥"

শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় ভৃত্যবর্গকে নবদ্বীপলীলায়ও মোহিনীবেশে বা লক্ষ্মীকাচে নৃত্যদ্বারা সকল ভক্তকে প্রেমামৃত এবং নৃত্যান্তে স্তন্যপানরূপ অমৃতধারা পান করাইয়াছেন ও পড়ুয়া-পাষণ্ডী প্রভৃতিকে বঞ্চনা করিয়াছেন।

৩৬০ প্রকার নায়িকার সমস্ত ভাব-বৈচিত্র্যের একত্র সমাবেশ-শাবল্য যেখানে, তাহাই মাদনাখ্য-মহাভাব। মাদনাখ্য-মহাভাব is the embodiment of sum-total of all emotional মহাভাব expressions of শ্রীরাধা।

অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণ নবীন মদন, আর শ্রীবার্ষভানবী মহাভাবস্বরূপা। তাঁহার মধ্যেই প্রেমের অনন্ত বৈচিত্র্য Consummated থাকে। মহাভাব সম্ভোগাবস্থায় 'মাদন' ও বিরহে 'মোহন'-আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই 'মাদন' ও 'মোহন'-অবস্থা-দশা একমাত্র শ্রীবার্ষভানবীরই হয়,—আর কাহারও এমন কি শ্রীললিতাদি সখীবৃন্দেরও এইভাব হয় না। "অখিল রসামৃতমূর্তিঃ প্রসৃমর-রুচি-রুদ্ধ-তারকা পালিঃ। কলিত-শ্যামা-ললিতো রাধা-প্রেয়ান্‌বিধুর্জয়তি ॥"

শ্রীগদাধর পণ্ডিতেরও এই ভাব থাকে না। এই জন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচরিতামৃতে শ্রীগৌরসুন্দর যে বিপ্রলম্ভ রসাত্মক প্রেমামৃত আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার সন্ধানদাতৃরূপে শ্রীগদাধরের উল্লেখ না করিয়া শ্রীস্বরূপ-রামরায়ের কথাই প্রধান-ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন—'যেবা অন্য কেহ জানে সেহ তাঁহা হৈতে।'

শ্রীগৌরসুন্দরই শ্রীবার্ষভানবীর এই বিপ্রলম্ভাত্মক মহাভাব অর্থাৎ 'মোহন' ভাব সুবলিত-মোহিনীমূর্তি। শ্রীকৃষ্ণই সম্ভোগ-দশায় নবীন মদনরূপে মহাভাবের মাদনাবস্থাকে উপভোগ করিয়া উন্মত্ত হন। আবার যখন বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদনের জন্য লালসান্বিত হন; তখন তিনিই বিপ্রলম্ভ-মূর্তি—নিজ-মনোমোহিনী;—শ্রীগান্ধর্বার মোহনাবস্থায় সমাধিযুক্ত হইয়া 'মোহিনীমূর্তি' ধারণ করেন, ইহাই প্রেম-বিলাস-বিবর্ত। 'অসদবিষয়মঙ্ঘ্রিং'—(ভা ৮।১২।৪৭)—এই শ্লোকের শ্রীগৌরসুন্দর-পক্ষে ব্যাখ্যা এইরূপ,—

যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম অসাধুগণের অপ্রাপ্য, অথচ ভাব অর্থাৎ নিরন্তর ধ্রুবানুস্মৃতি বা দাস্য-সখ্যাদি-অভিমানযুক্তা আবেশময়ী ভক্তিদ্বারা সহজপ্রাপ্য, যিনি প্রেমসিন্ধু হইতে উদ্ধৃত প্রেম-পরাকাষ্ঠাস্বরূপ ভাবামৃত অমরশ্রেষ্ঠগণকে ভোজন করাইয়াছেন; এখানে অমরশ্রেষ্ঠ বলিতে "হরিলীলাকথাব্রাতামৃতানন্দিত-সৎসুরম্" (ভা ১২।১৩।১১) এই বাক্যোদ্দিষ্ট হরিলীলাকথামৃতের আস্বাদন-লাভে আনন্দিত সাধুগণকেই বুঝিতে হইবে; 'উপসৃত'—'উপ' অর্থাৎ আধিক্যেন, প্রাচুর্যেন, 'সৃতং'—নিকটে গতং সমীপাগতং অর্থাৎ যাঁহারা নিরন্তর প্রচুররূপে অন্তরে বাহিরে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কাম অর্থাৎ প্রেমবাসনা (প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎপ্রথাম্) পরিপূরণকারীকে প্রণাম করি। তিনি কিরূপ বেশধারী? বিষ্ণু কপট যুবতীবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, আর ইনি কপট 'সুযতি'-বেশ ধারণ করিয়াছেন।

শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদোক্তি—'ছন্নঃ কলৌ'—(ভা ৭।৯ ৩৮) শ্রীগৌরসুন্দর স্বরূপতঃ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই। শ্রীকৃষ্ণ যতি নহেন, তিনি গৃহস্থ, গোপীজনবল্লভ, তিনি গোপ-স্ত্রী-সঙ্গী। স্ত্রীগণের অর্থাৎ গোপীগণের মধ্যে আবার শ্রীবার্ষভানবীর সঙ্গ ব্যতীত তিনি এক মুহূর্তও থাকিতে পারেন না; অথচ তিনিই আবার স্ত্রীসঙ্গের বিরোধী সন্ন্যাসি-বেশ ধারণ করিলেন, ইহাই তাঁহার 'কপটতা' বা 'ছন্নতা'। ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী উভয়েই স্ত্রীসঙ্গ-বর্জিত। শ্রীগৌরসুন্দর অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলেন এবং ব্রহ্মচারীর নাম 'চৈতন্য' গ্রহণ করিলেন। (সরস্বতী, ভারতী ও পুরী—এই কয় প্রকার সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসীর ব্রহ্মচারী অবস্থায় 'চৈতন্য' এই নাম বা উপাধি হয়)। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর স্ত্রী বা বিষয়ী দর্শনের প্রতি আন্তরিক বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—'সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ' ইত্যাদি। রাজা প্রতাপরুদ্রের সহিত মিলনের কোন প্রসঙ্গ উঠিলেই তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। স্ত্রী-কণ্ঠের গান শুনিয়া ছুটিয়া যাইবার কালে গোবিন্দ বাধা দিলে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন,—"গোবিন্দ আজি রাখিলা জীবন" ইত্যাদি। এখানে তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্মরক্ষক নারায়ণের লীলা করিয়াছেন। বর্ণাশ্রমের পালক শ্রীনারায়ণ বা শ্রীজনার্দনই বর্ণাশ্রম-ধর্মের মূল।

যেখানে জড়দ্বৈতাভিমানে দ্রষ্টৃ-দৃশ্য বিচার প্রবল, স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর দর্শনমাত্রেই চিত্তক্ষোভ হয়, ভোক্তৃবিচারে কর্মকাণ্ডের আবাহনকারী বিষয়ীর প্রসঙ্গ যেখানে আছে, সেখানে শুদ্ধ বর্ণাশ্রমই বিধি। এই বর্ণাশ্রমধর্ম-পালন-দ্বারা মোক্ষ-প্রদানের

জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই নরনারায়ণ-লীলা। বর্ণাশ্রম হইতে অর্থাৎ ভোক্তাভিমানমূলে ভোগ্য বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ-বশে ফলকামনাময় কর্মকাণ্ড হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে বিষয়ী ও স্ত্রীসঙ্গী বা স্ত্রী-সম্বন্ধে কঠোর শাসন মানিয়া চলিতে হইবে। কিন্তু আবার যখন মুক্তি-ধিক্কারী প্রেমরসের সন্ধান দিলেন, তখন প্রতাপরুদ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রের আকৃতি ও বেশভূষা দেখিয়া, সাক্ষাৎ শ্রীরাধিকার ভাবে বিভাবিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রসের উদ্দীপন-জ্ঞানে আলিঙ্গন দিয়া তাহার সর্বনাশ করিলেন; রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালককে প্রীতি দেখাইতে পশ্চাদ্‌পদ হন নাই, রাজা প্রতাপরুদ্রকে আলিঙ্গন দান করিতেও দ্বিধা বোধ করিলেন না। তখন আদিরসের আশ্রিতা, জগন্নাথের নেত্রোৎসব বিধানকারিণী কান্তা-জ্ঞানে নিজ স্কন্ধারূঢ়া বৃদ্ধাকে আদর দেখাইয়াছেন। আদিবশ্যা (বা বস্যা)—পুরাতন প্রিয়বন্ধু, An old friend or acquaintance. সেখানে বাধা দিতে গেলে বাধাদানকারীর কার্যকে অনুমোদন করিয়া কৃতজ্ঞতা দেখান নাই; সন্ন্যাস-ধর্মে সেখানে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। নিষ্কপট আবেশদশায় স্বমুখোক্তি —"কি কায সন্ন্যাসে মোর"—ইত্যাদি। এইজন্যই দামোদর পণ্ডিত অনুযোগ করিয়া বলিয়াছিলেন—প্রেমের বশীভূত তুমি, তুমি কি করিয়া কতদিন প্রেমিক ভক্তকে বিষয়ি-জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম বজায় রাখ, তাহা একবার দেখিব। এখন উপেক্ষা দেখাইতেছ বটে, আবার নিজেই তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইবে, তাহাও দেখিব—সুতরাং এই যে যতিবেশ, লম্পট-শিরোমণির ইহাই কপটতার চূড়ান্ত। বিষ্ণুর কপট নারীবেশে

রুদ্র মোহিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের লীলায় তাঁহার কপট যতিবেশে মোহিত হইয়াছেন—বারাণসীবাসী শঙ্করাভিন্ন শঙ্করমতাবলম্বী নিজকে বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন ঈশ্বরাভিমানী বা অদ্বৈতাভিমানী অদ্বৈত ব্রহ্মবাদী সম্প্রদায়ের তদানীন্তন আচার্য শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী।

প্রকাশানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরকে সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসিমাত্র জ্ঞান করিয়াছেন। তিনি নিজ সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসিগণের গুরু, এই অভিমানে শ্রীগৌরসুন্দরকে নিজ অধীন, ভোগ্যতত্ত্ব জ্ঞান করিয়া, তাঁহাকে শাসন বা নিয়মন করিতে অর্থাৎ তাঁহার উপর কর্তৃত্ব করিয়া নিজ বিচারাধীন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহা-বিদ্বান্ শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যও পূর্বে এইরূপ অদ্বৈত ব্রহ্মবাদী থাকা-কালে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সন্ন্যাসিবেশের দ্বারা মোহিত হইয়া, প্রভুর ঈশ্বরত্বে অবিশ্বাসী হইয়া তাঁহাকে শিষ্য-সাধক-জ্ঞানে উপদেশ দিতে ইচ্ছুক ও যত্নবিশিষ্ট ছিলেন !!

শ্রীনবদ্বীপলীলায়ও শ্রীবিশ্বম্ভর-কর্তৃক মোহিনী-বেশে মহালক্ষ্মীকাচে নৃত্যারম্ভের পূর্বে শিবাবতার শ্রীঅদ্বৈতের মোহপ্রাপ্তির ভীতি বা আশঙ্কা বর্ণিত আছে।

এবং সুরাসুরগণাঃ সমদেশকাল,-
হেত্বর্থকর্মমতয়োঽপি ফলে বিকল্পাঃ।
তত্রামৃতং সুরগণাঃ ফলমঞ্জসাপু,-
র্যৎপাদপঙ্কজরজঃশ্রয়ণান্ন দৈত্যাঃ॥ (ভা ৮।৯।২৮)

দেবতাগণ ও অসুরগণের দেশ, কাল, হেতু, অর্থ, কর্ম ও মত সমানই ছিল। হেতু—অমৃত পান করিয়া নিজেরা অমর হইব ও

অপরের প্রাণ সংহার করিব ; অর্থ—অমৃত ; কর্ম—সমুদ্রমন্থন ; বুদ্ধিও উভয়েরই সমান ; তাহা হইলেও ফলপ্রাপ্তির বেলায় কিন্তু বিপরীতই হইল। ভগবৎপাদপদ্মে আশ্রয় বা শরণাপত্তি ছিল বলিয়াই দেবগণ সাক্ষাদ্‌ভাবে অমৃত লাভ করিলেন ; আর অসুরগণ বঞ্চিত হইল। দৈবী প্রকৃতি-চালিত হইয়া যাঁহারা ভগবৎপাদপদ্মে শরণাগত হন, তাঁহাদেরই ভক্তিরস-সমুদ্র হইতে উত্থিত প্রেমামৃত-প্রাপ্তির সৌভাগ্য হয় ; আর যাঁহারা বিষ্ণুকে দেব-সামান্য-জ্ঞানে তাঁহার শ্রীবিগ্রহকে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার-মাত্র মনে করে, তাঁহারা কপট যতিবেশীর কপটতায় মোহিত হইয়া অমৃতের সন্ধান প্রাপ্ত হন না। বহির্দৃষ্টিতে যাহাদের কোনপ্রকার যোগ্যতা দেখা যায় না, এমন ব্যক্তিকেও শ্রীগৌর-সুন্দর প্রেমদান করিয়াছেন ; মহাপাপী জগাই-মাধাই, কুষ্ঠগ্রস্ত বাসুদেব বিপ্র ও বেশ্যা প্রভৃতিকেও স্বয়ং বা ভক্তদ্বারা প্রেমদান করিয়াছেন ; অথচ নবদ্বীপের পড়ুয়া, পাষণ্ডী ও কাশীর মায়াবাদী —ইহাদিগকে অনুগ্রহ করেন নাই। কত নীতিপরায়ণ, ধার্মিক, তপস্বী, যথা—পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারী প্রভৃতি, যাহারা জাগতিক বহুপ্রকার যোগ্যতাসম্পন্ন, তাহারাও শরণাগত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার প্রসাদ লাভ করে নাই !

অমৃত-উদ্ধরণ-ব্যাপারের সহিত ধন্বন্তরিও জড়িত আছেন। ধন্বন্তরি—বৈদ্যশ্রেষ্ঠ। তিনি মৃতসঞ্জীবনী-সুধা বা অমৃতের ভাণ্ডারী। কবিরাজ শব্দের দুইটি অর্থ—(১) মৃতসঞ্জিবনী-সুধা-দ্বারা যাঁহারা মৃতকল্প ব্যক্তিকে পুনর্জীবন দান করেন। (২) কাব্য-রসাস্বাদী। 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং'—অর্থাৎ রসাত্মক বাক্য-

বিন্যাস যাহাতে আছে, তাহাই কাব্য। কাব্যরস যে আস্বাদন করে, তাহাকেই 'কবি' বলা যায়। কবিগণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই কবিরাজ ; আবার ভূমিজ লতা, স্বর্ণ-রস (পারদ) ও তৈল প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত ঔষধি প্রয়োগ করিয়া, অর্থাৎ আয়ুর্বেদিক মতে যাঁহারা চিকিৎসা করেন, তাঁহারাও কবিরাজ। ইঁহাদিগকে কবিরাজ বলার একটি কারণ আছে। কবিগণের মধ্যে শুক্রাচার্য শ্রেষ্ঠ,—'কবিনামুশনাঃ কবিঃ।' এই শুক্রাচার্য আবার মৃতসঞ্জীবনী-বিদ্যার সন্ধান জানিতেন। তিনি এই মৃতসঞ্জীবনী-বিদ্যাদ্বারা দেবাসুর-যুদ্ধে নিহত দৈত্যগণকে পুনরায় জীবিত করিয়া তুলিতেন। শুক্রাচার্য একে কবিশ্রেষ্ঠ বা কবিরাজ, আবার আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাও করিতেন। কাজেই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকমাত্রেই কবিরাজ, কবিশেখর, কবিরত্ন প্রভৃতি উপাধি লাভ করেন। মৃতসঞ্জীবনীর মূল ভাণ্ডারী—ধন্বন্তরি। সেইজন্য এখন পর্যন্ত অভিজ্ঞ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসককে ধন্বন্তরিকল্প বলা হয়। এ জগতে চিকিৎসক, কবিরাজ ও কাব্যরসামোদী কবিরাজে পার্থক্য আছে। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় যিনি মৃতসঞ্জীবনী-সুধাদ্বারা ভবভয় অর্থাৎ কৃষ্ণবিস্মৃতি বা কৃষ্ণবিষয়ক অজ্ঞানরূপ মৃত্যুভয় দূর করেন, তিনিই আবার রসাস্বাদীও হন। ধন্বন্তরি—উপাসক কোটির অন্তর্ভুক্ত; তিনি ভগবদবতার হইলেও বিষয়বিগ্রহ ভগবান্ নহেন। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় ধন্বন্তরিরূপে প্রকটিত হইলেন—শ্রীগৌরসুন্দরেরই দ্বিতীয় বিগ্রহ, আশ্রয়-ভগবান্ শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীরায়-রামানন্দ, শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীরঘুনাথ-ভট্টদ্বয়-শ্রীজীব-শ্রীলোকনাথ-শ্রীকবিরাজ-শ্রীবিশ্বনাথ প্রভৃতি।

ইঁহারাই কীর্তনকারী প্রচারকরূপে প্রেমামৃতের কলস লইয়া বিতরণ করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই ধন্বন্তরিকল্প কবিরাজ। ইঁহারা প্রেমামৃত বিতরণ করিয়া ভবভয়ে মৃতপ্রায় জীবকুলকে অভয় করিয়াছেন, আবার ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক অপ্রাকৃত কাব্যরসের চতুর আস্বাদক, পরম রসিক বা সমঝদার সামাজিক।

ইঁহারা কিরূপভাবে অমৃত বিতরণ করিয়াছেন?—ইঁহারা সকলেই ভাগবতরসামৃতের সন্ধানদাতা। শ্রীসনাতন প্রভু শ্রীবৃহদ্-ভাগবতামৃত, শ্রীরূপপ্রভু সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত, শ্রীউপদেশামৃত, শ্রীভক্তিরসামৃত, শ্রীশ্রীজীবপ্রভু শ্রীহরিনামামৃত, শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতের টীকা, শ্রীচক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত রচনা করিয়া ভাগবতরসামৃত পরিবেশন করিয়াছেন। 'অমৃত' শব্দের প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়। 'অমৃত' না বলিয়া 'কাদম্বিনী', 'চন্দ্রিকা' বা 'দীপিকা' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতে পারিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বহুস্থলেই শ্রীচৈতন্য-লীলার সহিত মেঘের উপমা আছে; সুতরাং কাদম্বিনী শব্দটি প্রয়োগ করিলে তাহা অসঙ্গত হইত না, কিন্তু ইঁহারা সকলেই কপটযতি-বেশী মোহিনীমূর্তি শ্রীগৌরসুন্দরের অমৃত-বণ্টন-লীলার সহায়ক।

শ্রীমদ্ভাগবতের আদি, মধ্য ও অন্তে 'অমৃত' শব্দটির বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য যুগলবিহারী শ্রীকৃষ্ণের অথবা যুগলমিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর ও ধাম—সমস্তই অমৃতস্বরূপ। তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতম্ (ক্লীবলিঙ্গ); শুধু ভাগবতঃ (ভক্ত)

নহে ; পরন্তু শ্রীমদ্ভাগবতঃ, শ্রীমান্ (মহালক্ষ্মীর ভাব-কান্তিযুক্ত) ভাগবতঃ (পুংলিঙ্গ)—ভাগবতরূপী শ্রীমদ্ভগবান্ = শ্রীজীর প্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ বা ছন্ন কৃষ্ণ শ্রীগৌরসুন্দর ; তাঁহারই নাম, রূপ, গুণ, চরিতাদিকে অধিকার করিয়া আবির্ভূত এই শাস্ত্র—শ্রীমদ্ভাগবতম্ (ক্লীবলিঙ্গ)।

দ্বাদশ অধ্যায়েও শ্রীমার্কণ্ডেয় যে সকল স্তব করিয়াছেন, উহাকে দৃষ্ট-শ্রুতার্থভাবে নারায়ণের মহিমার সূচক বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃত-পক্ষে শ্রীকৃষ্ণই এই সকল স্তবের উদ্দিষ্ট বিষয়।

যদ্দর্শনং নিগম আত্মরহঃপ্রকাশং
মুহ্যন্তি যত্র কবয়োঽজপরা যতন্তঃ।
তং সর্ববাদ-বিষয়-প্রতিরূপ-শীলং
বন্দে মহাপুরুষমাত্মনিগূঢ়-বোধম্ ॥ (ভা ১২।৮।৪৯)

নিগমে অর্থাৎ বেদে যাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। বেদদ্বারেণেব নিজ-স্বরূপতত্ত্বং প্রেমতত্ত্বং চ জ্ঞাপয়তি, প্রকাশয়তি, সাক্ষাৎ-কারয়তি, আস্বাদয়তি। ভগবৎ-স্বরূপের যে রহস্য, তাঁহার প্রকাশই তাঁহার স্বরূপ-সাক্ষাৎকার অর্থাৎ অন্তরে বাহিরে ভগবৎস্বরূপের মাধুর্যের অনুভব বা স্ফূর্তিকেই 'সাক্ষাৎকার' বলা যায়। ভগবৎ-কৃপা-ব্যতীত তাঁহার মাধুর্যানুভব হয় না। ব্রহ্মা প্রমুখ দেবগণ ভগবৎ-স্বরূপ-সাক্ষাৎকারের জন্য যত্ন করিয়াও সফলকাম হইতে না পারিয়া মোহগ্রস্ত হন। ভগবৎ-স্বরূপতত্ত্ব-সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যে সকল বাদের উদ্ভব হইয়াছে, যথা—নির্বিশেষাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ইত্যাদি। এই সমস্ত বাদই ভগবৎ-

স্বরূপের আংশিক জ্ঞানমাত্র প্রদান করে। এই সকল বাদ অবলম্বন করিয়া, পূর্ণ ভগবত্তার অনুভব বা উপলব্ধি হয় না। তথাপি এই সকল বাদের সার্থকতা এই যে, ইহারা পরতত্ত্বের যে পরিমাণ অংশ অনুভব করিতে সমর্থ হয়, তাহা সত্যই; অর্থাৎ এই সকল বাদাবলম্বিগণের পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে পূর্ণ, সম্যক্ ধারণা হয় না; আংশিক ধারণা-মাত্র হয়; কিন্তু আংশিক হইলেও উহা সত্য। উহাতে ছল, বিতণ্ডা, জল্প বা হেত্বাভাস নাই। একদেশদর্শীর হস্তিদর্শনের ন্যায় তাঁহাদের ধারণা অসম্পূর্ণ, তবে মিথ্যা নহে। এই সকল বাদাশ্রিতগণ পরতত্ত্বের যেটুকু ধারণা করিতে সমর্থ হন, তিনিও তাহাদের নিকট তদনুরূপভাবেই নিজেকে প্রকাশ করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি পরিপূর্ণ-স্বরূপ। তিনি মহাপুরুষ, অর্থাৎ পুরুষাবতার-কারণার্ণবশায়ীরও মহনীয় অর্থাৎ পূজনীয় যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম, সেই কৃষ্ণই এখানে 'মহাপুরুষ' শব্দে উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। তিনি আত্মনিগূঢ়বোধ অর্থাৎ নরতনু ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া সাধারণ জনগণ তাঁহার স্বরূপোপলব্ধি করিতে পারে না; তাঁহার সচ্চিদানন্দবিগ্রহকে প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকারমাত্র মনে করে। অন্যত্র আবার বলিয়াছেন,—

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনিধ্রুগ্,-
রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য।
গোবিন্দ গোপবনিতা-ব্রজভৃত্যগীত,-
তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গল পাহি ভৃত্যান্॥ (ভা ১২।১১।২৫)

কৃষ্ণসখ—অর্জুনের সখা। বৃষ্ণ্যৃষভ—'বৃষ্ণি' শব্দে সাত্বত

বা যাদবগণকে বুঝায়, তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ যাদব-শ্রেষ্ঠ; অবনিধ্রুগ্ রাজন্যবংশ-দহন—পৃথিবীর দ্রোহকারী ভারস্বরূপ দুষ্ট রাজবংশের নিধনকারী; অনপবর্গবীর্য—অক্ষীণ বীর্যশালী উরুক্রম। এই পর্যন্ত ঐশ্বর্যপ্রকাশক বিশেষণ বা নামের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য দেখিয়া শ্রীসূত গোস্বামী চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া ঐশ্বর্যময়ী লীলার উল্লেখপূর্বক স্তব করিয়াছেন; কিন্তু সেই ঐশ্বর্যে তৃপ্ত না হইয়া মাধুর্যময় স্বরূপ ও মাধুর্যময়ী লীলার কথাই স্মরণ করিয়া বলিতেছেন—তুমি গোবিন্দ অর্থাৎ নন্দ-নন্দন, গোষ্ঠযুবরাজ। গোপবনিতা-ব্রজভৃত্যগীত-তীর্থশ্রবঃ —মধুররসের আশ্রয়বিগ্রহ গোপবনিতাসমূহ ও অন্যান্য দাস্য-ভাবাশ্রিতভক্তগণ—(শ্রীনারদ প্রভৃতি) যঁাহার 'তীর্থগীত' অর্থাৎ মঙ্গলময় কীর্তিসমূহ গান করিয়া থাকেন; অথবা গোপবনিতাগণ ও ব্রজের অন্যান্য সেবকগণ অর্থাৎ বৎসল, সখ্য ও দাস্য-রসাশ্রিত সেবকগণ যঁাহার পবিত্র কীর্তি গান করেন। পারকীয় মধুররসের আশ্রয়বিগ্রহগণ সর্বশ্রেষ্ঠ সেবিকা বলিয়া 'গোপবনিতা'-শব্দদ্বারা তাঁহাদের কথা বিশেষভাবে নামোল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন। হে শ্রবণ-মঙ্গল! তোমার নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরের কথা শ্রবণমাত্রেই মঙ্গললাভ হয়। তুমি দাসাভিমানী আমাদের ন্যায় ভৃত্যবর্গকে পালন কর।

একাদশ স্কন্ধের শেষে শ্রীশুকদেব স্বীয় অভীষ্টদেব, শবল-সমাশ্লিষ্ট শ্যামসুন্দর ও শবল-শ্যাম মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া শ্রীপরীক্ষিৎকে বলিলেন,—"আমি

তোমাকে যে সকল বিষয় উপদেশ করিলাম,—ইহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া অতঃপর তুমি মরণভয় পরিত্যাগ কর।" রাজাও তাঁহার নিকট বিবিধ স্তুতিবাক্যে শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশপূর্বক প্রাণপরিত্যাগের জন্য আজ্ঞা গ্রহণ করিলে শ্রীশুকদেব বিদায় গ্রহণ করিলেন। তখন শ্রীসূত গোস্বামিপ্রভুও তাঁহার গুরুদেব শ্রীশুকদেবের পদাঙ্কানুসরণে স্বীয় অভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণকে, তাহারপর নিজ-গুরুপাদপদ্ম শ্রীশুকদেবকে বন্দনা করিতেছেন ঃ—

উপচিত-নবশক্তিভিঃ স্ব আত্ম,-ন্যুপরচিত-স্থির-জঙ্গমালয়ায়।
ভগবত উপলব্ধিমাত্র-ধাম্নে, সুর-ঋষভায় নমঃ সনাতনায়॥
(ভা ১২।১২।৬৮)

সুর=ভূসুর; সুর-ঋষভ=শ্রীগৌরসুন্দর, দ্বিজবর অথবা সর্বদেবদেব অথবা সুরঋষভায় পাঠে—যাদবশ্রেষ্ঠ; 'যাদব' শব্দে ব্রজগোপগণই উদ্দিষ্ট; কেননা তাঁহারাও শূরবংশজাত।

উপচিত-নবশক্তিভিঃ—শ্রীবার্ষভানবী ও তাঁহার প্রধানা অষ্ট-সখীর সহিত অথবা অষ্টমঞ্জরীর সহিত মিলিত হইয়া 'স্ব' অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ 'আত্মনি' নিজস্বরূপেই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক শ্রীব্রজধাম প্রকট করিয়া, শ্রীব্রজনাথরূপে নিত্যই লীলাবিহার করিতেছেন। স্থাবর—ব্রজধামস্থ সেবোপকরণসমূহ; জঙ্গম—বিভিন্ন রসের সেবক-সেবিকাগণ। 'আত্মনি' নিজস্বরূপশক্তি; শক্তিমান্ ও স্বরূপশক্তি-প্রকটিত স্বরূপ-বৈভবসমূহ—সমস্তই পরস্পর অভিন্ন। উপলব্ধিমাত্রধাম্নে—'উপলব্ধি' শব্দের অর্থ—বিজ্ঞান বা প্রেম; প্রেমই যাঁহার ধাম অর্থাৎ স্বরূপ, অর্থাৎ যিনি রসময় বিগ্রহ, সেই দেবশ্রেষ্ঠ সনাতন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

শ্রীশুকদেবকে প্রণাম করিতেছেন—

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি॥

(ভা ১২।১২।৬৯)

যিনি আত্মানন্দ-পরিপূর্ণচিত্ত ও তদ্ভাব-নিবন্ধন অন্যভাব-রহিত হইলেও শ্রীহরির রুচির লীলাসমূহ-দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, জীবে দয়া-বশতঃ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের তত্ত্বপ্রকাশক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যের সন্ধানদাতা এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ পুরাণপ্রদীপ বিস্তৃত করিয়াছেন, সেই নিখিল পাপনাশন ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবকে প্রণাম করি

শ্রীশুকদেবের কথা স্মৃতিপটে উদিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশুকদেবের অভীষ্ট আরাধ্যদেবতা শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি—

"যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র-রুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈঃ"—শ্লোকে উদ্দীপিত এবং তৎসঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দরের স্মৃতি শ্রীসূত গোস্বামীর চিত্তারূঢ় হইল।

শ্রীশুকদেব মোহিনী মূর্তিতে অমৃত-বন্টনকারী শ্রীগৌরসুন্দরের স্তব করিয়াছেন,—

পৃষ্ঠে ভ্রাম্যদমন্দ-মন্দরগিরিগ্রাবাগ্রকণ্ডূয়না-
ন্নিদ্রালোঃ কমঠাকৃতের্ভগবতঃ শ্বাসানিলাঃ পান্তু বঃ।
যৎসংস্কার-কলানুবর্তনবশাদ্বেলানিভেনাম্ভসাং
যাতায়াতমতন্দ্রিতং জলনিধের্নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি॥

(ভা ১২।১৩।২)

পৃষ্ঠে ভ্রমণশীল গুরুতর মন্দরগিরির প্রস্তরাগ্র-ঘর্ষণজনিত সুখহেতু নিদ্রাবেশপ্রাপ্ত কমঠাকৃতি ভগবানের শ্বাসবায়ুসমূহ তোমাদিগকে রক্ষা করুক্। এই শ্বাসবায়ুর সংস্কার-লেশের অনুসরণ করিয়া বেলা-ক্ষোভচ্ছলে সমুদ্র-জলরাশির যাতায়াত অদ্যাবধি নিরন্তর প্রবর্তমান রহিয়াছে, কখনও নিবৃত্ত হইতেছে না। অতন্দ্রিত—স্বাধীন, নিরন্তর বা অবাধ। আজ পর্যন্ত সমুদ্রের তরঙ্গসমূহ একবার অগ্রসর হইয়া বেলাভূমি প্লাবিত করিতেছে, আবার ফিরিয়া যাইতেছে। এই যে Receding and Proceeding of the waves—অদ্যাপি ইহার বিরাম হইতেছে না।

"অস্য বা মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্‌বেদম্" ইত্যাদি। (এই মহা অদ্ভুত বা বিস্ময়দ্যোতক মহাভূত শব্দে—অদ্ভুত রসের অধিদৈবত শ্রীকূর্মদেবই উদ্দিষ্ট) শ্রীকূর্মদেবের শ্বাসবায়ুই বেদ। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ—ইঁহারা সকলেই বেদযোনি অর্থাৎ বেদ প্রকটকারী। সেই বেদ তোমাদিগকে রক্ষা করুন অর্থাৎ বেদানুগত হও, আস্তিক হও, বেদাশ্রিত হইয়া পরতত্ত্বের প্রতি উন্মুখ হও। বেদের অন্ত ও সারই শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবতের উপসংহারে সকলকে সেই বেদসার শ্রীমদ্ভাগবতেরই আশ্রিত হইবার জন্য উপদেশ করিতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের উপসংহারে শ্রীসূতগোস্বামী স্বীয় অভীষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণের কথা না বলিয়া কূর্মদেবের কথা কেন বলিলেন ? মৎস্য, বরাহ, বামন, নৃসিংহ, পরশুরাম, দাশরথি রাম প্রমুখ অন্যান্য অবতারের কথাই বা বলিলেন না কেন ? প্রকৃতপক্ষে এখানে

শ্রীসূতগোস্বামী পুরুষের অংশাবতার শ্রীকূর্মদেবের কথা বলেন নাই। নিখিল অবতারের অংশী কমঠাকৃতি শ্রীগৌরসুন্দরের কথাই বলিয়াছেন।

কূর্ম-অবতারে মন্দর-পর্বত—এই শ্রীগৌরলীলায় নীলাচল বা নীলপর্বত-সদৃশ। মন্দরপর্বত শ্রীকূর্মদেবের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত ছিল, কিন্তু এখানে নীলাচলের পৃষ্ঠদেশে শ্রীগৌরসুন্দর রহিয়াছেন। কিরূপ আকৃতি প্রকট করিয়াছেন ? কমঠাকৃতি অর্থাৎ কমঠের ন্যায় আকৃতি প্রকট করিয়াছেন। পৃষ্ঠদেশ উচ্চ হইয়াছে, গ্রীবা দীর্ঘ ও হস্ত-পদ সঙ্কুচিত হইয়া দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। অথবা 'কমঠাকৃতি' শব্দের অর্থ—যাঁহার 'কৃতি' অর্থাৎ হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা ইন্দ্রিয়গুলি কমঠের হস্তপদের সদৃশাবস্থা ('আ'-সম্যক্‌রূপে) লাভ করিয়াছে। মূলশ্লোকে 'কমঠাকৃতি' শব্দটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। যদি কূর্মদেবই এই শ্লোকের উদ্দিষ্ট বিষয় হইতেন, তাহা হইলে 'কূর্ম ভগবান্' এইরূপ শব্দই প্রয়োগ করিতেন।

মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে শ্রীবার্ষভানবী শ্রীকৃষ্ণের ভাবে বিভাবিত হইয়া মহাবিপ্রলম্ভ-বশে মোহনাবস্থায় এইরূপ কমঠাকৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাই দিব্যোন্মাদ। আবার শ্রীকৃষ্ণ নিজেই শ্রীমতীর ভাব-কান্তি গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণবিরহের উন্মাদনায় নীলাচলে কমঠাকৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ব্রজে শ্রীবার্ষভানবী স্ত্রীমূর্তি ; আর এখানে শ্রীবার্ষভানবীর ভাব-কান্তি-সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর পুরুষমূর্তি। ইহাই প্রেম-বিলাস-বিবর্ত। এক বস্তুর স্থানে অন্য বস্তুর প্রতীতি হওয়াকেই 'বিবর্ত' বলে।

শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নিজের বিরহে দিব্যোন্মাদগ্রস্ত হইয়া কমঠ-রূপ প্রকাশ করিয়াছেন। আবার শ্রীকূর্মদেব—অদ্ভুত-রসের বিষয়বিগ্রহ। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটি মুখ্য রস এবং হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়ানক—এই দ্বাদশ অপ্রাকৃত রসের সর্বত্রই অদ্ভুত-রসটি বিদ্যমান থাকিয়া উহার চমৎকারিতা প্রকাশ করে। শ্রীগৌর-লীলায় আবার এই অদ্ভুত-রসের পরম চমৎকারিতা-পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে। কূর্মলীলায় কূর্মদেব—আধার এবং মন্দর-পর্বত আধেয়। শ্রীগৌরলীলায় 'তেজো বারি মৃদাং যথা বিনিময়ো'—এই সূত্র-অনুসারে আধার-আধেয়ের বিপর্যয় দেখা যায়। গৌরলীলায় সর্বত্রই এইরূপ বিপর্যয় বা বিনিময়। এই বিনিময়ই অদ্ভুত-রসের মহা-চমৎকারিতা প্রকাশ করিয়াছে। কূর্মদেবের পৃষ্ঠে মন্দর-পর্বতের ঘর্ষণ হইয়াছিল। এখানে শ্রীগৌরসুন্দর নিজেই গম্ভীরায় গৃহভিত্তিতে মুখ, চিবুক, নাসিকা, কপাল ঘর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার নিদ্রালুতা এখানে পরমানন্দ-মহাভাব-সমাধিকেই বুঝিতে হইবে। এই শ্রীগৌরসুন্দরের শ্বাসবায়ু অর্থাৎ বিপ্রলম্ভ-রসাত্মক মোহনদশায় প্রেমামৃত-বায়ু তোমাদিগকে—আশ্রিতবর্গকে পালন করুন। সেই নিঃশ্বাস ঠিক সমুদ্রের তরঙ্গের মত, একবার অগ্রসর হইয়া বেলাভূমিকে প্লাবিত করে, আবার সংহত হয়। ইহার তাৎপর্য এই যে, শ্রীগৌরসুন্দর কখনও পাত্রাপাত্র-বিচার না করিয়া প্রেমদান করেন, আবার কখনও 'আস্তেবমঙ্গ ভজতাং মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্'—

ইত্যাদি বাক্যানুসারে প্রেমদান করেন না। যাহারা ধর্মার্থ-কামমোক্ষের অভিলাষী হইয়া ভজন করে, প্রেমলাভ-বিষয়ে যাহাদের শিথিলতা দেখা যায়, যাহারা মহতের প্রসঙ্গ ও পরিচর্যারূপ সঙ্গফলে মহতের প্রসন্নতা-লাভে ভগবৎসুখানু-সন্ধান-চেষ্টায় ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধিযুক্ত নহে, তাহাদিগকে প্রেমদান করেন না। আবার যাহারা মহতের কৃপাসঙ্গ লাভ করিয়াছে, তাহাদের পূর্ব-অপরাধ সমস্ত ক্ষমা করিয়া প্রেমদান করেন। এই প্রেম সমুদ্র-স্বরূপ। প্রেমই সমুদ্র, আবার প্রেমই সমুদ্র-মথনোত্থিত অমৃত। এই সমুদ্র বিশাল—ইহার গাম্ভীর্য অত্যন্ত বেশী। ক্ষুদ্র জীব সমুদ্রের সংস্পর্শে আসিলে তাহার গৌরব ও বিশালত্ব-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া মস্তক অবনত করে। সমগ্র নীলাচল এই মহাভাবের প্লাবনে প্লাবিত হইয়াছে। "স্ত্রীপুত্রাদি-কথাং……নৈবান্য আসীদ্রসঃ ॥" 'নীলাচল' বলিতে এখানে নীলাচলবাসীকেই বুঝিতে হইবে। নীলাচল-বাসিগণ এই দিব্যোন্মাদ দর্শনে বিভ্রান্ত হইয়া গিয়াছেন।

"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যাত কিং করোম্যহম্ ॥"

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের হৃদয়ের এই বিভ্রান্ত-অবস্থা তখন সমস্ত স্নিগ্ধ-প্রেমোন্মাদগ্রস্ত নীলাচল-বাসিগণের লাভ হইয়াছিল। উপসংহারে পুনরায় পরসত্যের ধ্যানের কথা বলিতেছেন ঃ—

কস্মৈ যেন বিভাসিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা
তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা।
যোগীন্দ্রায় তদাত্মনাথ ভগবদ্রাতায় কারুণ্যত-
স্তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি॥
(ভা ১২।১৩।১৯)

শ্রীকৃষ্ণ 'কস্মৈ' অর্থাৎ ব্রহ্মার নিকট প্রথমে এই অতুলনীয় শ্রীমদ্ভাগবতরূপী জ্ঞান-প্রদীপ উপদেশ করিয়াছিলেন। ('কস্মৈ' —সর্বনাম-হেতু আর্ষ-প্রয়োগ ; 'কায়'-প্রয়োগই ব্যাকরণ-সম্মত)। এই ব্রহ্মা বরষাণীশ্বর। ইনি চতুর্মুখ ব্রহ্মা তথা সমস্ত ব্রহ্মাগণের আকর অংশীতত্ত্ব। সৃষ্টিকর্তা চতুর্মুখ ব্রহ্মা ইঁহার অংশ। ব্রহ্মা—আদি কবি। আদি কবি অর্থাৎ কবিগণের মধ্যে আদি বা প্রথম—এই কথাদ্বারা বুঝা যায় যে, ব্রহ্মার শিষ্য-পরম্পরায় ক্রমশঃ আরও বহু কবি বা কবিরাজের (অপ্রাকৃত কাব্যরসামোদী ও প্রেমামৃত-বিতরণকারী) আবির্ভাব হইবে। 'আদি কবি' শব্দদ্বারা গুরু-পরম্পরার সনাতনত্ব উদ্দিষ্ট হইয়াছে। অঘাসুর মোক্ষণ-লীলা দেখিয়া, ব্রহ্মা স্বীয় মেধাসাহায্যে উহার মীমাংসা করিতে না পারিয়া মোহিত হইয়াছিলেন—'মুহ্যন্তি যত্র কবয়োঽজপরা যতন্তঃ।' মনীষার দ্বারা যত্ন করিয়া ব্রহ্মা ভগবল্লীলার তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। হ্লাদিনী শক্তির প্রভাব অসমোর্দ্ধ ; ইহার ইয়ত্তা কেহই করিতে পারেন না। 'মুহ্যন্তি যৎ সুরয়ঃ' কেবলমাত্র হ্লাদিনী শক্তির প্রভাব-বিষয়ে যিনি একমাত্র 'অভিজ্ঞ',—সেই শ্রীকৃষ্ণই হ্লাদিনীশক্তির বিক্রম অবগত আছেন।

বিচার-প্রধান-মার্গে মনীষাদ্বারা বিচার করিয়া ভগবৎস্বরূপজ্ঞান-লাভে অসমর্থ হইয়া, ব্রহ্মা যখন বিচার-প্রধান-পথ পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্-পাদপদ্মে শরণাগত হ'ন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে স্বীয় তত্ত্বপ্রকাশক নিগম বা ব্রহ্ম (বেদ) উপদেশ করেন।

বরষাণীশ্বরই শ্রীগৌরলীলায় শ্রীহরিদাসঠাকুর। ব্রহ্মা প্রজাপতিগণেরও পিতা। প্রজাপতিগণ সৃষ্টি করেন। বরষাণীশ্বর ব্রহ্মা ও অন্বয় বা প্রজাসম্প্রদায়ে শ্রীকৃষ্ণকথিত ভাগবত-রহস্য বিস্তার করিয়া থাকেন। এই ব্রহ্মা শিবের সহিত অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ নিজে ব্রহ্মাকে উপদেশ দান করেন; আবার শ্রীব্রহ্মারূপে শ্রীনারদকে, শ্রীনারদরূপে শ্রীব্যাসদেবকে, শ্রীব্যাসদেবরূপে যোগীন্দ্র অর্থাৎ ভগবৎসুখানুসন্ধানাবেশে সমাধিপ্রাপ্ত শ্রীশুকদেবকে উপদেশ দান করেন। শ্রীসূত গোস্বামী শ্রীব্রহ্মা, শ্রীনারদ ও শ্রীব্যাসদেবকে শ্রীকৃষ্ণরূপী 'তদ্রূপেণ' বা 'তদ্রূপিণা' বলিয়াছেন; কিন্তু নিজ-গুরুদেব শ্রীশুকদেবকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই জ্ঞান করিয়া বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ 'তদাত্মনা' অর্থাৎ নিজ-স্বরূপেই বিষ্ণুরাত শ্রীকৃষ্ণ-রক্ষিত শ্রীপরীক্ষিৎকে উপদেশ দান করিয়াছেন। অথবা 'তদাত্মনাথ' এইরূপ শব্দ হইলে তাহার অর্থ হইবে—শ্রীকৃষ্ণই যাঁহার নাথ, এমন যে ভগবদ্ বিষ্ণুরাত—শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ, তাঁহাকে সেই শ্রীশুকদেব কৃপাপূর্বক উপদেশ করিয়াছেন। সেই উপদেষ্টৃ তত্ত্বটি শুদ্ধ অর্থাৎ কেবলস্বরূপ, বিমল—কৈতবশূন্য; বিশোক—আনন্দময়, পরসত্যবস্তু এবং সর্বশেষে বলিলেন—'অমৃত'। সত্যং জ্ঞানং আনন্দং—পরতত্ত্বের এই তিনটি

লক্ষণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ সেই অমৃতস্বরূপ যে পরমানন্দ-বৈচিত্র্য, সেই পরমানন্দবৈচিত্র্যশালী শ্রীকৃষ্ণকে ধীমহি—সুখানুসন্ধানময় আবেশের সহিত নিরন্তর স্মরণ করি বা ভালবাসি।

শ্রীমদ্ভাগবত—বাচ্য-বাচকরূপী শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, ভক্ত-ভাগবত-শ্রেষ্ঠবৃষভানুনন্দিনী ও ভক্ত-ভাগবতরূপী ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দর—একাধারে এই তিনটিই। 'তস্যেদম্' এই সূত্রটি দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে,—শ্রীমতো ভগবতঃ শ্রেষ্ঠ-কলত্ররূপম্ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতম্। 'কলত্র' শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া 'শ্রীমদ্ভাগবতম্' এইরূপ শব্দ হইল। অথবা, শ্রীমতো ভগবতঃ শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলা-ধাম-সম্বন্ধি ইদম্ ইতি শ্রীমদ্ভাগ-বতম্। ইহা 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' বা 'কিরাতার্জুনীয়ম্' প্রভৃতি শব্দের ন্যায় সিদ্ধ। এই শ্রীমদ্ভাগবতে পরমহংসগণের আশ্রয়নীয় পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক জ্ঞানের (অনুভবের বা প্রেমের) গান গীত হইতেছেন। অথবা 'পারমহংস্যম্' = পরমহংসগণের গতিরূপ; পরম = অন্তিম, অন্ত্য পরমহংসগণের গতি—সর্বোত্তম জ্ঞান, অনুভব অর্থাৎ প্রেমের বিষয় শ্রীকৃষ্ণই গীত হইতেছেন। অভিধেয় বা কীর্তনাখ্যা ভক্তির মধ্যে আবার 'গান'ই সর্বোত্তম অভিধেয়। (শ্রীল শ্রীজীবপাদ-কৃত শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥

(ভা ১২।১৩।১৮)

এই জ্ঞান ব্রহ্ম-পরমাত্ম-বিষয়ক নহে। ব্রহ্মজ্ঞানের গান কে করিবে? পরমাত্মজ্ঞানেরও গান হয় না,—কারণ 'গান' জিনিষটি পরমানন্দেরই অভিব্যক্তি। সুতরাং ভগবৎস্বরূপের, তাহার মধ্যে আবার যুগলিতস্বরূপ ভগবজ্‌জ্ঞানের গানই ইঁহাতে আছে। ইঁহাতে জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিত নৈষ্কর্ম্যের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে।

ফলাকাঙ্ক্ষামূলে দ্বৈত-অভিমানে যে ক্রিয়া-কলাপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই 'কর্ম'। যখন ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না, ইষ্টদেবের সঙ্গে সম্পূর্ণ dovetailed হওয়ায় ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানাবেশের মধ্যে নিজ-সুখানুসন্ধান বা স্বার্থপরতা যখন বিলীন হইয়া যায়, প্রেম-একান্ত তন্ময়তা যখন আবির্ভূত হয়, তখনই তাহাকে 'নৈষ্কর্ম্য' বলা যায়। এই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ, কীর্তন ও আবেশের সহিত স্মরণপরায়ণ হইয়া, নববিধা ভক্তির অনুষ্ঠান করিলে প্রেম বা বিমুক্তি-লাভ হয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম-মাধুর্য, রূপ-মাধুর্য, লীলা-মাধুর্য, পরিকর-মাধুর্য ও গুণ-মাধুর্যের অনুভব হয়। সেই মাধুর্য কেমন?

প্রত্যাক্রষ্টুং নয়নমবলা যত্র লগ্নং ন শেকুঃ
কর্ণাবিষ্টং ন সরতি ততো যৎ সতামাত্মলগ্নম্।
যচ্ছ্রীর্বাচাং জনয়তি রতিং কিং নু মানং কবীনাং
দৃষ্ট্বা জিষ্ণোর্যুধি রথগতং যচ্চ তৎসাম্যমীয়ুঃ॥

(ভা ১১।৩০।৩)

অবলাঃ—আবিষ্টা নারী দুর্বলা; শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের মাধুর্যের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় দুর্বলা। এ' জগতের সাধারণ রীতি এই

যে নারীর প্রলোভনে আক্রান্ত হইয়া পুরুষই দুর্বল হইয়া পড়ে ; কিন্তু এখানে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের মাধুর্যদ্বারা আক্রান্ত হইয়া নারীগণই দুর্বল হইয়া পড়ায় তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে বদ্ধদৃষ্টি তথা হইতে অপসারিত করিতে পারেন না। কর্ণরন্ধ্র-দ্বারা সেইরূপের কথা একবার সিদ্ধ মহাভাগবত-সাধুগণের হৃদয়-পথগত হইলে আর বহির্গত হয় না। তাঁহার রূপের শোভার কথা তাদাত্ম্যাপন্ন জিহ্বা-দ্বারা কীর্তন করিতে করিতে কবিগণের তাঁহার প্রতি রাগ জন্মিয়া যায়। সুতরাং তাঁহাদেরও যে কৃষ্ণভক্ত বলিয়া খ্যাতি হইবে, ইহা আর আশ্চর্যের কথা কি ?

"কীর্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্তি ?
'কৃষ্ণভক্ত' বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি ॥"

অর্জুনের রথে সারথিরূপে আসীন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া যুদ্ধে নিহত রাজগণ সকলেই সারূপ্যমুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে গীতের মর্ম, সেই গীত গান করাই জীবের শ্রেষ্ঠধর্ম ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলার স্মরণই প্রধান স্মরণ ; শ্রীরাধাকৃষ্ণের পদাম্বুজই প্রধান ধ্যেয়, কর্ণরসায়ন শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই শ্রেষ্ঠ শ্রবণ। এইজন্যই শ্রীধর স্বামিপাদ অদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও সম্প্রদায়ের শুদ্ধির নিমিত্ত সবিশেষ ভগবদ্রূপের ধ্যানকেই চরম অভিধেয়রূপে স্থাপন করিয়াছেন। তিনি প্রথমে বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্য রচনা করিয়া, অবশেষে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা করিলেন। সেই টীকায় শ্রীমদ্ভাগবতের আদি শ্লোকে কথিত ধ্যানের উদ্দিষ্ট বিষয় যে পরসত্য, সেই পরসত্য বলিতে 'ভক্তজন-

মানস-নিবাস' শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ লীলাপুরুষোত্তম হইলেও তাঁহাকে অনধিকারিগণের নিকট নিগূঢ় রাখিবার উদ্দেশ্যে পরোক্ষবাদাশ্রয়ে 'সত্যং পরং' এইরূপ জ্ঞানমার্গ বা যোগমার্গের প্রতিপাদক সেই সেই শাস্ত্রীয় শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে। অথবা পুরুষরূপী রসরাজ ও নারীরূপিণী মহাভাবমিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরই এই 'সত্যং পরং' শব্দের দ্বারা বাচ্য বলিয়া ব্যাকরণ-শাস্ত্র-বিধিমতে ক্লীবলিঙ্গ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে শ্রীগৌরসুন্দরই কীর্তিত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম শ্রীবৃন্দাবনধাম।
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তী।
ঠাকুরের শ্রীহরিকথামৃত— ১২ই চৈত্র, ১৩৬২ সন।

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥"

অদ্য অমন্দোদয়া দয়ানিধি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পরমশুভদা আবির্ভাব-তিথি।

জয় মিশ্র জগন্নাথসুত গৌর-গুণধাম।
জয় শচীমাতার দুলালিয়া গৌর-গুণধাম ॥
জয় লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণেশ্বর গৌর-গুণধাম।
জয় নদীয়াবিহারী শচীসুত গৌর-গুণধাম ॥

পরম পূজ্যপাদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু অমৃতনিঃস্যন্দিনী ভাষায় গাহিয়াছেন ঃ—

"কৃষ্ণলীলামৃত সার, তা'র শত শত ধার,
দশদিকে বহে যাঁহা হৈতে।
সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চরাহ তাহাতে ॥"
"কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তগণ, যা'তে প্রফুল্ল পদ্মবন,
তা'র মধু কর আস্বাদন।
প্রেমরস-কুমুদবনে, প্রফুল্লিত রাত্রি-দিনে,
তা'তে চরাও মনোভৃঙ্গগণ ॥
নানাভাবের ভক্ত-জন, হংস-চক্রবাকগণ,
যা'তে সবে করেন বিহার।
কৃষ্ণকেলি সুমৃণাল, যাহা পাই সর্বকাল,
ভক্তহংস করয়ে আহার ॥
সেই সরোবরে গিয়া, হংস-চক্রবাক হঞা,
সদা তাঁহা করহ বিলাস।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ, পাইবে পরম সুখ,
অনায়াসে হবে প্রেমোল্লাস ॥"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পরম চমৎকারিণী লীলারূপ অক্ষয় রস-সরোবর হইতেই কৃষ্ণলীলামৃতের শত শত ধারা দশ দিকে প্রবাহিত হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পরম রসঘনবিগ্রহ ; তাঁহার আদি, মধ্য ও অন্ত্য,—সমস্ত লীলাই অভূতপূর্বা রসময়ী।

গৌর-নারায়ণ-লীলা ও যতিরাজ শিরোমণি লীলা,—অর্থাৎ নদীয়ালীলা ও নীলাচল-লীলা,—সর্বপ্রকার লীলাতে চমৎকার রসেরই প্রাধান্য। রসিক ভক্তগণ নবদ্বীপলীলা অপেক্ষা নীলাচল-লীলার শেষ দ্বাদশ বর্ষের লীলাকে লীলারসের পরাকাষ্ঠা বলিয়া অনুভব করেন।

দ্বাপরের শ্যামাকান্ত রসরাজ শ্যামই বর্তমান কলিযুগে শ্যামার ভাব ও কান্তি চুরি করিয়া অর্থাৎ শ্যাম-বিরহিণী শ্যামার মাদনাখ্য-মহাভাবে বিভাবিত হইয়া এবং তদীয় প্রতপ্ত কাঞ্চন-কান্তি-শ্রীঅঙ্গে ধারণ করিয়া 'শ্যামাভাবী' গৌরহরি সাজিয়া আসিয়াছেন। শ্যামের অভাবগ্রস্তা অর্থাৎ শ্যামবিরহিণী শ্রীমতীকে 'শ্যামাভাবী' বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু নীলাচল-লীলার শেষভাগে সর্বক্ষণ শ্রীমতী বার্ষভানবীর মাদনাখ্য-মহাভাবের আচরণকারী, মাধুর্যাস্বাদনকারী ও বিতরণকারীর লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অদ্য আমরা (১) ভক্তিসিদ্ধান্ত-রস-আচরণ, (২) ভক্তি-সিদ্ধান্তরসবিচারণ, (৩) ভক্তিসিদ্ধান্ত-রস-রচন ও (৪) ভক্তি-সিদ্ধান্ত-রস-ভজন—এই চারিটি বিষয়-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরই ভক্তি-রস-আচরণকারী। তাঁহার যাবতীয় আচরণকে রসিক সম্প্রদায় এক কথায় 'রসাচরণ' বলিয়া থাকেন।

"আপনি আচরি' ধর্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়॥"

শ্রীগৌরহরি স্বয়ংরূপ অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন হইয়াও বর্তমান কলিতে শ্রীমদ্ভাগবতমূর্তিধৃক্; তিনি আরাধিকাশিরোমণি,—ভক্তকুলের শিরোভূষামণি শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর ভাব-মূর্তিধারী; তিনিই আবার গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদ্য প্রেম-ভক্তিধর্মের অদ্বিতীয় সুষ্ঠু আচরণকর্তা।

"কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥"

(ভা ১।৩।৪৩)

শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করিবার পর অর্থাৎ প্রকটলীলা-সংগোপনের পরে স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবত-সূর্যরূপে পুনরায় প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীগৌরহরি একাধারে অপ্রাকৃত সূর্য-চন্দ্র-সদৃশ। সেই শ্রীভাগবতার্ক-কিরণে অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ-ভাস্করের কৃপাকিরণে শ্রীচৈতন্য-লীলা-রস-সরোবরে প্রেমভক্তিরস-সিদ্ধান্তরূপ মৃণাল-দণ্ডের আশ্রয়ে শ্রীরূপ-কমল ও ভানুকুল-চন্দ্রমা শ্রীরাধার ভাব-কান্তিধারী শ্রীগৌরশশধরের অমল-ধবল করুণা-চন্দ্রিকা-সম্পাতে প্রীতি-রস-সুশীতল রতি বা ভানুমতী-কুমুদ বিকশিত হইয়াছেন। শ্রীরূপ-কমল ও শ্রীরতি-কুমুদের আশ্রয়—শ্রীসনাতন ভক্তিসিদ্ধান্ত-মৃণাল। শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের আশ্রয়ে শ্রীগৌরলীলার অক্ষয় রস-সরোবরে এই কমল-কুমুদ নিত্যকাল পূর্ণরূপে

বিকশিত থাকিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সুখবিধান করিয়া থাকেন। ভক্তরূপ হংস-চক্রবাকগণ মৃণাল ভোজন করিয়াই জীবিত থাকেন অর্থাৎ শ্রীল সনাতন পাদের ভক্তিরস-সিদ্ধান্তই তাঁহাদের একমাত্র জীবাতু বা উপজীব্য। শ্রীরূপ-কমল ও শ্রীরতি-কুমুদের অনবদ্য সৌন্দর্য-মাধুর্য-রস আস্বাদন বা অনুভব করিতে করিতে ভক্ত-হংস-চক্রবাকগণ এই অক্ষয় রস-সরোবরে নিত্যকাল নিমজ্জিত-উন্মজ্জিত হইয়া পরানন্দে বিচরণ করেন। গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের মনোভৃঙ্গনিকর এই প্রেমরস-পূর্ণ কমল-কুমুদ-কাননে সতত পরমানন্দ-সহকারে বিচরণ করিতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত-রস-আচরণকারী শ্রীগৌরহরির অভিন্নতনু—শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুপাদ। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, প্রেমভক্তি-সিদ্ধান্ত-রসের বিচারণপর বা সিদ্ধান্তরস-আশ্রয়কারী। নিখিল সনাতন-ভক্তি-শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন-পূর্বক তিনি শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃত, উহার দিগদর্শিনী-টীকা, শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী প্রভৃতি অভূতপূর্ব অমৃতভাণ্ড গৌড়ীয় জগতে দান করিয়াছেন। এই বিচারণ বা আশ্রয়ণ—অর্থাৎ শ্রীল সনাতন পাদের সিদ্ধান্তবিচার-গ্রহণই কমল-কুমুদের আশ্রয়-দণ্ড। সেজন্যই ইহাকে মৃণালের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। প্রেম-ভক্তি-রস-আচরণকারী শ্রীগৌরসুন্দরেরই দ্বিতীয় রূপ—শ্রীল রূপ-গোস্বামিপ্রভু; ইনি শ্রীগৌরের অতুলনীয় রসশিক্ষায় শিক্ষিত;—গৌড়ীয় রসিকসম্প্রদায়ের মূলমহাজন।

এই শ্রীল রূপপাদ ভক্তি-রস-রচনকারী, প্রচারণকারী ও রসের সমঝদারিতা বা উপলব্ধিদানকারী। ইনি শ্রীচৈতন্যের

রূপ,—শ্রীরূপ-কমল। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীবিদগ্ধমাধব, শ্রীললিতমাধব প্রভৃতি অপ্রাকৃত রস-সাহিত্য বিরচন করিয়া শ্রীল রূপপাদ ভূলোকে গোলোকের প্রেমতত্ত্ব বিতরণ করিয়াছেন। রস-বিরচন বা রস-প্রচারণ শ্রীরূপ-কমলেরই একচেটিয়া মহাধন। 'বিরচন' ও 'প্রচারণ'—এই দুইটি শব্দ এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়। যিনি রস-রচনকারী, তাঁহার পক্ষেই রসের কথা প্রচার বা কীর্তন বা বিতরণ সম্ভবপর, অপরের নহে। রস-বিরচন ও রস-প্রচারণ—একই তাৎপর্যপর।

তারপর রস-ভজনের কথা। রস-ভজনটি—ভক্তিসিদ্ধান্তরস-বিচারণ বা আশ্রয়েই অবস্থিত। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভু যে বিপ্রলম্ভরসযুক্ত ঐকান্তিক ভজনাদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই।

শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি, প্রার্থনাশ্রয়-চতুর্দশকম্, শ্রীরাধিকার অষ্টোত্তরশত-নামাবলী—প্রভৃতি অপ্রাকৃত প্রীতিরসসিক্ত স্তবাবলীর ভাব ও ভাষা একান্ত নীরস প্রাণেও ভজন-লালসা জাগ্রত করেন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু, শ্রীরূপেরই অনুগত। তিনি শ্রীরূপের রতি-কুমুদ। তাঁহার অপর নাম শ্রীভানুমতী। এই ভানুমতীকুমুদ শ্রীভানুকুল-চন্দ্রমার চিরস্নিগ্ধ অমল চন্দ্রিকায় বিকশিত হইয়াছেন। শ্রীল রূপপাদের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীরূপমঞ্জরীর সঙ্গে নিত্যকালই এই রতিকুমুদ বা শ্রীরতিমঞ্জরী শ্রীমতী রাধাসুন্দরীর সেবানন্দে বৃন্দারণ্যে বিচরণ করেন। ইনিই প্রকৃত শ্রবণকারী। ভজন বা শ্রবণ বা শৃণ্বন্ একই অর্থবাচক শব্দ। শ্রীল দাস গোস্বামিপ্রভু শ্রীলরূপপাদের প্রকৃত

শিষ্য ; সেইজন্য তিনি রস-ভজনের আদর্শস্বরূপ। শ্রবণ সুষ্ঠুরূপে হইলেই ভজনটি নিখুঁত, সুন্দর, অনবদ্য ও অতুলনীয় হইবে।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ—শ্রীরূপ-রঘুনাথের শ্রীগুরুদেব ; নিখিল গৌড়ীয় ভক্তেরই শ্রীগুরুদেব ইনি। ইঁহারই সিদ্ধান্ত-মৃণাল-অবলম্বনে শ্রীরূপকমল ও শ্রীরতিকুমুদ প্রস্ফুটিত হইয়া সৌন্দর্য-মাধুর্য-মকরন্দ-সৌরভে নিখিল রসিক গৌড়ীয়গণের হৃদয়ে গোকুলানন্দ দান করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগৌরলীলামৃতের অক্ষয়-সরোবরে গৌড়ীয় হংস-চক্রবাককুল নিত্যকাল প্রেমানন্দে বিহার করিতেছেন।

আমাদের মানসভৃঙ্গ-নিকর যেন গৌড়ীয়গণের অনুসরণে, নিত্যকাল শ্রীগৌরলীলার অক্ষয়-রস-সরোবরে বিরাজিত কমল-কুমুদবনে বিচরণ করিতে পারে, একবিন্দু প্রীতি-মকরন্দ-সেবনে যেন কৃতকৃতার্থ হইতে পারে, অদ্য মহামহাবদান্য-শিরোমণি শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণারবিন্দে এই সকাকু প্রার্থনা।

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহ্বদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

শ্রীশ্রীহরিকথামৃত

শ্রীবৃন্দাবনধাম।
দমনকারোপণোৎসব।
ইং ২২।৪.৫৬ রবিবার

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বশেষভাগে শৃণ্বন্, সুপঠন ও বিচারণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥"
(ভা ১২।১৩।১৮)

(১) শৃণ্বন্—শ্রবণ, অর্থাৎ রস-শ্রবণ। সিদ্ধান্ত-রস-শ্রবণকারী শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু; তিনি শিষ্যের লীলা-আচরণকারী অর্থাৎ ভজনকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রীল সনাতন-রূপের শিক্ষানুগত্যেই শ্রীরঘুনাথ দাস-গোস্বামিপ্রভু বিপ্রলম্ভরসময় ভজন গৌড়ীয় বিশ্বে আদর্শস্বরূপ রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামি-পাদদ্বয় শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীকে 'নিজ তৃতীয় ভাই করি'—নিকটে রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল—'অনুপম'। তিনি শ্রীরঘুনাথের উপাসক ছিলেন; শ্রীমদ্দাসগোস্বামী প্রভুর নামও ছিল শ্রীরঘুনাথ দাস। শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুকে তাঁহারা তৃতীয় সহোদর বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। এস্থলে 'উদর' কে? উদর—শ্রীশ্রীগৌরলীলা-মৃতের অক্ষয়-সরোবর। শ্রীমদ্‌গৌরসুন্দরই উদর। সেই উদরেই মৃণাল-দণ্ডের উপর **'কমল'-'কুমুদ'** জন্মে। ভক্তি-রস-সিদ্ধান্ত-বিচারণরূপ মৃণালের উপরই সুপঠনকারী বা ভক্তি-রস-সাহিত্য-বিরচনকারি-রূপ কমল ও শৃণ্বন্ বা ভজনকারী রতি-কুমুদের বিকাশ হয়; শ্রবণ বা ভজন একই কথা।

(২) সুপঠন্—কীর্তন, প্রচারণ, বিরচন, দান, বিতরণ, রচন—এই সমুদয়ই সুপঠনের নামান্তর। শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুই সুপঠনকারী; তিনি পরমদাতা—পররস-বিতরণকারী। তিনিই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি প্রভৃতি অপ্রাকৃত রস-সাহিত্যের রচয়িতা।

শ্রীরূপপাদ একাধারে ভক্তিরস-রচয়িতা, ভক্তিরস-কীর্তনকারী, ভক্তিরস-প্রদাতা। তিনি শ্রীরঘুনাথের শিক্ষাগুরু।

(৩) বিচারণপর—শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু; শ্রীমৎ শ্রীরূপের গুরুদেব তিনি। নিখিল ভক্তিসিদ্ধান্ত বিচার করিয়া তিনি শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃত, শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী ইত্যাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। এই ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিচারকেই মৃণাল-দণ্ড বলা হয়। ইহাকে আশ্রয় করিয়াই শৃণ্বন্ ও সুপঠন্,—অর্থাৎ

শ্রবণ-কীর্তনের প্রতিষ্ঠা বা অবস্থিতি। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীল সনাতন পাদের আনুগত্যে, তাঁহারই আশ্রয়ে ভজন ও কীর্তন করিয়াছেন।

(৪) 'বিমুচ্যেন্নরঃ'—রাগানুগ-ভক্তিযাজিগণ ভক্তিরস-সিদ্ধান্তের শৃণ্বন্, (শ্রবণ), সুপঠন্ (কীর্তন) ও বিচারণ বা আশ্রয়ে বিশেষরূপে বিমোচন বা বিমুক্তি অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম-মধু আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হ'ন। ভক্ত-হংসগণ শ্রীল সনাতনপাদের আশ্রয়ে নিত্যকাল শ্রবণ-কীর্তন-রস আস্বাদন করেন।

বিরচন (কীর্তন) ও ভজন (শ্রবণ)-বিচারণেরই আশ্রিত। শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু অপ্রাকৃত রস-বিশ্লেষণ-দ্বারা এ' প্রপঞ্চে অদ্বিতীয় অমৃত-বিতরণকারী।

বিচারণ—ভক্তি-সিদ্ধান্তাশ্রয়; অর্থাৎ শ্রীল সনাতনপাদের আশ্রয়-গ্রহণ। বিচারণ—স্মরণ; আবেশময় স্মরণ; ইহাই শ্রীরূপানুগ-গণের জীবন। ইহাকে শ্রীরূপানুগ-পন্থা বলা হয়। শ্রীল রূপপাদের শ্রীগুরুদেব—শ্রীল সনাতন প্রভু।

শৃণ্বন্—শ্রবণ, সুপঠন—কীর্তন, বিচারণ—স্মরণ। বিমুক্তি—বিশেষ মুক্তি, অর্থাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীচরণারবিন্দে প্রেমোৎসব-লাভ; তাঁহাদের প্রেম-সেবা-লাভের নামই বিমুক্তি; শুধু চতুর্বিধা মুক্তি নহে,—বিশেষ মুক্তি।

'বিমুচ্যেন্নরঃ'—অর্থাৎ এই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ-কীর্তন ও স্মরণের ফলে মানব শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীচরণকমলে প্রেমলাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের এই চরম শ্লোকেও শ্রীশ্রীগৌরলীলাকেই উদ্দেশ করিয়াছেন।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের

শ্রীবদন-বিগলিত 'অমৃত-কণিকা'

শ্রীবৃন্দাবন-ধাম।
ইং ৬।৩।৫৭

হরিই গোবিন্দ। যত স্থানে 'হরি'-শব্দ-প্রয়োগ হয়েছে,—শ্রীগোবিন্দকেই বুঝিতে হইবে।

'হরিঃ পুরট-সুন্দর'—শ্রীগৌর-গোবিন্দ।

'শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।' শচীমাতার গর্ভসিন্ধুতে হরীন্দু প্রকটিত হইলেন।

হরি = শ্রীগোবিন্দ। রাম = গোপীনাথ, গোপীজনবল্লভ। শ্রীরাধারমণই শ্রীগোপীনাথ। শ্রীরাধারমণ-ঘেরার পরেই শ্রীগোপীনাথ-ঘেরা আরম্ভ হইয়াছে। কৃষ্ণ = মদনমোহন।

মহামন্ত্রে—হরি, রাম ও কৃষ্ণ—এই তিনটি নাম। তিনেই এক, আবার একেই তিন।

হরা হরি = রাধাগোবিন্দ। হরা কৃষ্ণ = রাধা-মদনমোহন। হরা রাম = রাধা গোপীনাথ।

শ্রীসনাতনাত্মা শব্দে মদনমোহনকে বুঝাইতেছে। শ্রীসনাতনই যাঁহার আত্মা, তিনিই 'সনাতনাত্মা'। আবার সনাতনের আত্মা (ষষ্ঠী তৎপুরুষ-সমাস)—এই স্থলেও শ্রীমদনমোহনদেবকেই বুঝাইতেছে। শ্রীসনাতনের ইষ্টদেবই শ্রীমদনমোহন। 'কৃষ্ণেরই সনাতন।' আবার 'সনাতনেরই কৃষ্ণ।' কৃষ্ণ = মদনমোহন;

কৃষ্ণের আত্মা শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ। আবার শ্রীসনাতনের আত্মা মদনমোহন।

লক্ষ্য করিতে হইবে,—

"শ্রীকৃষ্ণের সনাতন, 'শ্রীচৈতন্যের রূপ' ও 'শ্রীস্বরূপের রঘু,' 'শ্রীরামানন্দের প্রত্যুম্নমিশ্র'।

'অমৃত-কণিকা'

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী
২৯শে মাঘ, মঙ্গলবার
বাংলা ১৩৬৬ সন।

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই'—শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরহরি। তিনি একাধারে আস্বাদ্য ও আস্বাদক। স্বয়ং পরমানন্দ-স্বরূপ, পরম জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও শ্রীরাধিকার ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক আনন্দ ও জ্ঞান আস্বাদন বা অনুভব করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপা শ্রীরাধা। ইনি নিজে শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করেন এবং অপরকেও আস্বাদন করান। শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকা দেবী নিজে কৃষ্ণ-বিষয়ক আনন্দরস আস্বাদন করিয়া কৃপাবশে ভাগ্যবান্ অন্যান্য জনের হৃদয়েও এই আনন্দরসের আস্বাদনযোগ্যতা প্রদান করেন।

শ্রীরাধা-ভাবাবিষ্ট ও শ্রীরাধিকার বর্ণধারী কৃষ্ণই—শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। তিনি নিজে পরম চৈতন্যস্বরূপ ও পরম-আনন্দ-রসময় বিগ্রহ হইয়াও আবার শ্রীমতীর প্রেম-রস-বৈচিত্রী বা প্রেমানন্দ-মাধুরী-আস্বাদনের জন্য সতত লোভযুক্ত।

শ্রীরাধার ভাব-বৈচিত্রী শ্রীগৌরসুন্দরের মধ্যে পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপ হইয়াও ইনি শ্রীমতীর ভাব-মাধুর্য-দ্বারা পরিপূর্ণতমরূপে বিমণ্ডিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের রূপই—শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুপাদ। শ্রীচৈতন্যরূপা শ্রীমতী রাধারাণীর তিনি প্রিয়নর্ম সখী বা প্রিয়নর্ম কিঙ্করী,—শ্রীরূপ মঞ্জরী।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদই—'স্বরূপের রঘু'। ইনি শ্রীগৌরসুন্দর-কর্তৃক শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুপাদের শ্রীকর-কমলে সমর্পিত হইয়াছিলেন বলিয়া নাম হইয়াছে—'স্বরূপের রঘু'।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুপাদ শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতের প্রথম শ্লোকে কীর্তন করিয়াছেন,—

"জয়তি নিজ-পদাব্জ-প্রেমদানাবতীর্ণো
বিবিধমধুরিমাব্ধিঃ কোঽপি কৈশোর-গন্ধিঃ।
গতপরমদশান্তং যস্য চৈতন্যরূপা-
দনুভবপদমাপ্তং প্রেম গোপীষু নিত্যম্ ॥"

যিনি নিজ-পাদপদ্ম-যুগলে প্রেমবিতরণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি বিবিধ মধুরিমার সাগর, যাঁহার প্রেম পরমদশার চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়াও গোপীবৃন্দে নিত্য বিরাজমান এবং যাঁহার শ্রীচৈতন্যাখ্যস্বরূপ হইতে সেই চরম সীমান্ত গোপীপ্রেম সকলের অনুভবের বিষয় হইয়াছে, সেই নিত্য কৈশোর-ভূষিত কোন এক অনির্বচনীয় পুরুষ সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতের 'দিগ্‌দর্শিনী-টীকার প্রারম্ভেই শ্রীল সনাতন প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

"নমশ্চৈতন্যচন্দ্রায় স্বনামামৃত-সেবিনে।
যদ্রূপাশ্রয়ণাদ্ যস্য ভেজে ভক্তিময়ং জনঃ ॥"

অর্থাৎ যাঁহার (শ্রীরূপের) আশ্রয় করিলে মাদৃশ জনও তদীয় ভক্তি প্রাপ্ত হয়, সেই নিজ নামামৃতসেবী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে নমস্কার করিতেছি। এইস্থলে শ্রীল সনাতনপাদ শ্রীচৈতন্যের রূপ— শ্রীল রূপপাদের কথাই বলিয়াছেন। শ্রীল রূপপাদের রস-রচনাই গৌড়ীয়গণের জীবনধারণের উপায়স্বরূপ।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২২	১	অবার	আবার
২৩	৬	সাধ্য	সাধ্যে
২৪	১	ন কালেন	কালেন
২৫	১০	উল্লাস	উল্লাসে
২৫	১৫	হইতেছে, ততই	হইতেছে, তাহার ততই
২৬	৩	পাগল ও দিব্যোন্মাদ	পাগল অর্থাৎ দিব্যোন্মত্ত
২৬	৮	করিলেও নির্বিশেষ	করিলেও উহা নির্বিশেষ
২৯	৯	তিনিই তন্নিষ্ঠং।	(কিছু থাকিবে না)
২৯	১০	বর্ত্তমান, তিনি।	বর্ত্তমান,—তিনিই তন্নিষ্ঠং
২৯	২০	নয়। তবে	নয়,—তবে
২৯	২০	বিরোধী তোমার	বিরোধী কোন
৩১	৯	গোপীজনবল্লভ	শ্রীগোপীজনবল্লভ
৩১	১০	সর্ব্বসাধক —গুরু	সর্ব্বসাধক-জন-গুরু
৩৩	১৮	আভাষ	আভাস
৩৫	২১	ভক্তবাৎসল্য	ভক্তবাৎসল্যও
৩৬	৬	বিধিকে	‘বৈধীকে’
৩৭	২৪	শাস্ত্রশাসনানুগ	শাস্ত্রশাসনানুগা
৩৮	২১	(প্রয়োজন)	(‘প্রয়োজনের’)
৩৯	৪	ব্যোম	ব্যোম,—
৩৯	২১	সুনীচতা দৈন্যাত্মকা	সুনীচতা, – দৈন্যাত্মক।
৪১	২	ভালগুণ	ভালগুণ,—
৪১	১৪	বর্ণন করিয়াছেন	বর্ণিত হইয়াছেন
৪১	১৬	মুখ্য	মুখ্যা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪১	১৭	স্বাধীন	স্বাধীনা
৪১	১৯	সর্ব্বশ্রেষ্ঠ	সর্ব্বশ্রেষ্ঠা
৪২	১৮	তাহা	যাহা
৪২	২০	অপ্রতিহতা অর্থাৎ অন্য বস্তু ...	অপ্রতিহতা অর্থাৎ যাহা করার মত সুখ নাই ও না করার মত দুঃখ নাই, এমন অন্য বস্তু
৪২	২১	উদ্দশ্যে	উদ্দেশ্য
৪৪	৩	শ্রেষ্ঠ	প্রেষ্ঠ
৪৬	১৮	(দম্ভ)	(দম্ভ)
৫০	১৪	ভগবানের দেখা পান না।	ভগবানের দেখা পান না। ভক্তির মাহাত্ম্যকে অর্থ-বাদ মনে করিতে হইবে না।
৫২	১২	সাধক লোক ভাল	সাধক—লোক ভাল,
৫৩	১৯	হইতে	করিতে
৫৬	৫	আর্চনাঙ্গ	অর্চনাঙ্গ
৫৭	২০	দক্ষ	প্রজাপতি দক্ষ
৫৮	১৮	নির্জাণ কাল	নির্যাণ কাল
৬১	১০	অথাপি	তথাপি
৬৪	১৮	নামাভাল	নামাভাস

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৯	৫	শ্রীনামকীর্ত্তন ও	শ্রীনামকীর্ত্তন হয়, তথায় এবং
৮৩	৪	কমই—	তত ক্ষণ কমই—
৮৫	২১	নলকুবর মণিগ্রীব	নলকুবর ও মণিগ্রীব
৮৬	৩	বিষয়ী পাপী	বিষয়ী,—পাপী
৮৭	৩—৪	কষায় বিরসাস্বাদ	কষায়—রসাস্বাদ
৮৭	১৬	ব্রহ্মও	ব্রহ্ম ও
৮৭	১৯	পরতত্ত্ববস্তু এক ?	পরতত্ত্ববস্তু কি এক ?
৮৭	২৯	পরতত্ত্ব ব্রহ্ম,	পরতত্ত্ব ব্রহ্ম,—বৃহৎ, ভূমা আনন্দ-ময় অর্থাৎ আনন্দ প্রচুর কিন্তু জীব
৮৮	৮	বাসনা	বাসনাভাস
৮৮	১৩	প্রতি	প্রতি তাঁহার
৮৮	২৪	কিন্তু	কিন্তু পরমার্থজগতে
৮৯	১৩	ব্রহ্মানন্দী,	ব্রহ্মানন্দী হইয়া
৮৯	২০	শ্রাদ্ধা	শ্রদ্ধা
৯০	১৪	অভিমানে	তদ্রূপ অভিমানে
৯০	১৪	ও	(কিছু থাকিবে না)
৯০	১৫	আমিও	আর আমিও
৯১	৩	ঐশ্বর্য্য জ্ঞান নাই	ঐশ্বর্য্য জ্ঞান নাই - কেবল মাধুর্যানু-ভবেরই প্রাচুর্য্য।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯২	৯	উহাতে	কিন্তু উহাতে
৯৬	৫	রাসানুগায়	রাগানুগায়
৯৭	৫	পরিপাটি	পারিপাট্য
১০২	১০	তটস্থ শক্তির	তটস্থা শক্তির
১০৬	১১	শ্লোকে নিৰ্দ্দিষ্ট	শ্লোক নিৰ্দ্দিষ্ট
১০৭	৩	'ঘাড় ফিরানোই'	'ঘাড় ফিরানই'
১০৭	৬	সাক্ষাৎসাম্মুখ্য	সাক্ষাৎ-সাম্মুখ্য
১০৯	৭	গুণ বা	গুণ,
১০৯	৭	তিনি	তিনিই
১০৯	১৭	(পুরুষ রূপে)	(পুরুষরূপ)
১১১	২৪	তাকানোর	'তাকান'র
১১৩	১১	মুখ ফিরানো	'মুখ ফিরান'
১১৪	১৯	হৃদয়ের দ্বার	হৃদয়ের দ্বারা
১১৫	২	উপাসকের	(কিছু থাকিবে না)
১১৫	৪	হইলেই	হইলেই উপাসকের
১১৫	১১	পুংসাপিত্রা	পুংসার্পিতা
১১৫	১২	'অর্পিতা'-অর্থে	অর্পিতা—অর্থে
১১৬	১৪	অর্থাৎ	অর্থাৎ মন
১১৭	২৪	ধুশু	শুধু
১২০	৮	আঁধার	আধার
১২১	৭	ঔদার্যলীলাই	ঔদার্যলীলাই—
১২২	১৩	(কৈলাশনাথ নহেন,	(কৈলাশনাথ নহেন;—
১২২	১৩	তাঁহার অংশী সদাশিবের)	তাঁহার অংশী সদাশিবের

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২২	১৪	অভিন্ন তনু	অভিন্ন তনু—
১২৬	১০	'পারভাষা'	'পরিভাষা'
১২৮	১১	কেবল	(কিছু থাকিবে না)
১২৮	১১	ন্যায়	ন্যায় কেবল
১২৮	১১	নিজধামে	নিজধামে মাত্র
১২৮	২২	সাক্ষাৎকার ও	সাক্ষাৎকারও
১৩২	২৩	বরষাণীশ্বর	বরষাণেশ্বর
১৪৪	১০	জিজ্ঞাসাও	জিজ্ঞাসা—
১৪৪	২২	ভীতি বা	ভীতি,
১৫২	১২	অবহিতা	অবিহিতা
১৫৩	২১	সহিত সংকীর্ত্তন	সহিত সংকীর্ত্তন—
১৫৪	১৫	শ্রীগৌর সুন্দরই	শ্রীগৌর সুন্দরই—
১৫৪	১৫	নন্দীশ্বর	'নন্দীশ্বর'
১৫৫	৬	ধায়েম:	ধ্যায়েমঃ
১৫৫	১৯	শ্রীমতো	শ্রীমতা
১৫৬	৪	আধিক্যেণ	আধিক্যেন
১৫৬	৪	প্রাচুর্যেন	প্রাচুর্য্যেণ
১৫৯	৭	সর্ববেদাথার্:	সর্ববেদার্থ:
১৬১	৭	অমৃতমমরবর্যানাশয়ৎ	অমৃতমমরবর্য্যানাশয়ৎ
১৬১	২০	নৃত্য-দ্বারা	নৃত্য
১৬২	২	বিচিত্র	বিচিত্র-তরঙ্গে
১৬২	৩	মহাভাবই	ভাবই
১৬৩	৩	দাস্যায়তে	দাস্যায় তে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬৮	১১	হন না	হয়না
১৬৯	২২	আশ্রয়-ভগবান	আশ্রয়-ভগবান—
১৭২	২১	...বর্গবীর্য	...বর্গবীর্য্য
১৭৩	৪	অনপবর্গবীর্য—	অনপবর্গবীর্য্য —
১৭৮	২৩	আস্তেবমঙ্গ ভজতাং	আস্তেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং
১৮০	১০	বরষাণীশ্বর	বরষাণেশ্বর
১৮১	৬	”	”
১৮১	৮	”	”
১৮১	৮	ব্রহ্মা ও	ব্রহ্মাও
১৮৪	৪	·অঙ্গে	শ্রীঅঙ্গে
১৮৪	১৮	প্রেমলীলাই	প্রেমলীলাই—
১৯২	১২	বনিত	বর্ণিত
১৯৬	১০	১৩৬৬ সন	১৩৬৩ সন।